চিংড়ি

চিংড়ি

তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই

অনুবাদ

বোম্মানা বিশ্বনাথম

ও

নিলীনা আব্রাহাম



সাহিত্য অকাদেমি

নতুন দিল্লী

Chingri : Bengali translation by Bommana Visvanatham and Nilina Abraham of Thakazhi Sivasankara Pillai's Malayalam novel, *Chemmeen*.
Sahitya Akademi, New Delhi
Price Rs. 15·00

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৮

প্রধান কার্যালয়
সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
শাখা কার্যালয়
ব্লক ৫ বি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলিকাতা ৭০০ ০২৯
২৯, এলডামস রোড, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮
১৭২, মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪

মূল্য ১৫·০০

মুদ্রক : শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১৯, গুলুওস্তাগর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

দেশ হিসাবে কেরলের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু ভাষা হিসাবে কেরলের ভাষা মালয়ালামের বয়ঃক্রম এক হাজার বছরের বেশি হয়তো হবে না। দ্রাবিড়-ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম হল মালয়ালাম—এই গোষ্ঠীর অপর তিনটি মুখ্য ভাষা তামিল, তেলুগু ও কন্নড়। তামিলের সঙ্গেই অবশ্য মালয়ালামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হলেও, কেরল প্রদেশে সংস্কৃতের চর্চা ও অনুশীলনের একটি যে ঐতিহ্য ছিল তার বিশিষ্ট ছাপ রয়ে গেছে মালয়ালাম ভাষার চরিত্রে ও গঠনে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। মালয়ালামের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটে নি। এই শতকের পর থেকেই মালয়ালাম সাহিত্যকৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এই ভাষার মধ্যে নূতন ভাব, নূতন শিল্পশৈলী দেখা দিতে থাকে। আধুনিক যুগের তরুণ লেখকেরা এই ভাষার মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার করেছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই।

কেরল প্রদেশের আলেপ্পি শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি পল্লীগ্রাম হল তাকাষি। এই গ্রামে শিবশঙ্কর পিল্লাই-এর জন্ম ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে। দক্ষিণ ভারতের অন্য অনেক খ্যাতনামা লেখক, কবি ও সাংগীতিকের মতো গ্রামের পরিচয়েই শিবশঙ্কর পিল্লাই-এর নাম তাকাষি। শিবশঙ্করের বাবা ছিলেন সম্পন্ন জোতদার। সত্যিকারের ভদ্রলোক ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলে এঁর খ্যাতি ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন কেরল-এর প্রখ্যাত নৃত্যনাট্য কথাকলির একজন রসবেত্তা। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ এ-যুগের কথাকলি শিল্পে যাঁর স্থান নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ সেই কুঞ্জকুরূপ হলেন শিবশঙ্করের পিতৃব্য। যে বাড়িতে শিবশঙ্করের জন্ম, সে বাড়িতে শিল্পচর্চা তথা শাস্ত্রচর্চা ছিল পুরুষানুক্রমিক। দেশজ প্রথামতো বাড়ির কর্তা প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রামায়ণ মহাভারত থেকে পাঠ করে শোনাতেন, বালক তাকাষি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত এই-সব মহাকাব্যের কাহিনী।

এই ভাবে বাড়িতেই তাকাষির লেখাপড়ায় হাতে খড়ি। তারপর কিশোর বয়সে শিবশঙ্কর ভর্তি হয় তাকাষির পাঠশালায় ও সেখানকার পাঠ সেরে আম্বালা-

পুষার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আম্বালাপুষার এই স্কুলটি ছিল সমুদ্রের উপকূলে —ঠিক জেলেপাড়ার মাঝখানে। সেই প্রথম মাছধরা জেলে ও জেলেনীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাকাষির প্রত্যক্ষ পরিচয়। পরবর্তী কালে আইনজীবীরূপে তিনি এই আম্বালাপুষাতেই তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন। তখন তাঁর মক্কেলদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল জেলে। পারীকুট্টি ও কারুতাম্মার মতো চরিত্র তিনি কেবল নভেলের নায়ক-নায়িকা কিংবা নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীর মতো করে দেখেন নি। রক্তমাংসের জীবরূপে তিনি এদের বাস্তবে দেখেছেন এবং এদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছেন।

স্কুলের পাঠ শেষ করে তাকাষি গেলেন ত্রিবান্দ্রাম—তদানীন্তন দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানীতে। সেখানে তিনি আইন কলেজে ভর্তি হলেন। সে-সময় ত্রিবান্দ্রাম ছিল জম-জমাট শহর। তখন দেশময় স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে পুরোদমে। অচিরেই তাকাষি একটি ছোটখাটো বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। নিয়মিত এঁদের বৈঠক বসত। তর্ক আলোচনার খাতিরে এই সময় তাঁকে প্রচুর পড়াশুনো করতে হয়, তাঁর জ্ঞানান্বেষণের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মার্ক্স, ফ্রয়েড তো বটেই, ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় গভীরতর হতে লাগল। এই সময় তিনি কয়েকটি ছোট গল্প লিখে উদীয়মান লেখকরূপে মালয়ালাম সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সমাজচেতনায় উজ্জ্বল এই সব গল্পে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখকের লেখনী সমুদ্যত। রাজনীতিক দিক থেকে এগুলিতে বামপন্থী সহানুভূতি প্রকট।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হল রণ্টিতাঙ্গাষি [দু কুনকে ধান]। এই একটি বইয়ের সূত্রে তাকাষি সমকালীন মালয়ালাম সাহিত্যে সর্বাগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক রূপে পরি-গণিত হলেন। সাহিত্য অকাদেমির উদ্‌যোগে এ-বই ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

অতঃপর আরও অনেক গল্প ও উপন্যাস তিনি রচনা করলেন। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হল চেম্মীন। পরের বছর এই বই সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। ভারতে সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননা হল এই পুরস্কার। এ পর্যন্ত এ-বইয়ের চোদ্দটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাকাষির অন্যান্য লেখার মতো এ-বইটিও প্রকাশিত হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যে বহু আলোচিত উপন্যাস হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে, সাহিত্যিক মজলিশে এই বই নিয়ে নানা পরস্পরবিরোধী মতামত প্রকাশিত হতে থাকে। একাধারে বহুনিন্দিত ও বহুপ্রশংসিত এরকম একটি বই সচরাচর দেখা যায় না। একটা সময় ছিল যখন কেরল প্রদেশে পাঁচ-

জন লোক একত্র হলেই তাদের আলোচ্য বিষয় হত চেম্মীন।

তাকাষি কঠোর বাস্তববাদী বলেই এতকাল সাহিত্যিক মহলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু চেম্মীন-এ বাস্তববাদের সঙ্গে একটা নূতন ধরনের রোমান্টিক ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ফলে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে চেম্মীন নূতন ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছে। এ-বইয়ে জেলেদের জীবনধারা, তাদের ধর্মবিশ্বাস ও অন্ধসংস্কার, তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা একটা গভীর তাৎপর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে।

কেরলপ্রদেশের সমুদ্রোপকূলে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে জেলেদের গ্রাম। সহজ সরল এই জেলেদের জীবনযাত্রা, এদের জীবনসূত্র সমুদ্রের সঙ্গে গাঁথা। চেম্মীন এইরকম একটি গ্রামের কাহিনী—একটি না বলে দুটি বলাই বোধ করি সংগত, কারণ এই কাহিনীর নায়িকা কারুতাম্মা জন্মেছিল এক গাঁয়ে আর তার বিবাহিত জীবন কেটেছিল প্রতিবেশী গাঁয়ে।

এইসব স্বভাবসরল জেলে ও জেলেনীদের কী পরিমাণ দুঃখভোগ ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তাদের জীবনটা বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের জীবন। অথচ দুঃখবিপদ তুচ্ছ করা এই কঠিন জীবন নিয়ে তাদের যেন গর্বের সীমা নেই। তারা এর বদলে আরামের জীবন চায় না। সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি, সেই কারালাম্মা যিনি ভালোকে রক্ষা করেন ও মন্দের বিনাশ সাধন করেন—সেই দেবীর প্রতি অটল আস্থাই হল এদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এই বিশ্বাসই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

এই সব ছোটখাটো সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্মীয় ও পরম্পরাগত বিধিনিষেধের অন্ত নেই। নানা জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত এই সম্প্রদায়। এদের মধ্যে আছে মেছো নৌকার মালিক, মাছ-ধরা জেলে, পুরবীয়া অর্থাৎ উপকূল থেকে দূরের অন্তর্বর্তী অঞ্চলের লোক—যাদের উপকূলের লোকেরা ছোটজাত বলে অবজ্ঞা করে। আর আছে মাছের বেপারী যাদের অধিকাংশ মুসলমান। এরা মাছ কেনে, কেটেকুটে সে মাছ রৌদ্রে শুকোতে দেয় ও শুঁটকি মাছ বেচে দেয় আশেপাশের শহর-বন্দর থেকে আগত পাইকার ও ব্যবসাদারদের কাছে।

গাঁয়ের মোড়লই হলেন গোষ্ঠীপতি—একাধারে তিনি ধর্মগুরু ও সর্বময় কর্তা। গোষ্ঠীর সবকিছু ব্যাপার তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত। তাঁর মরজি না হলে কেউ নৌকার মালিক হতে পারে না। বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপার নির্ভর করে তাঁর আশীর্বাদের উপর। সকল বিরোধের সালিশ-মীমাংসা করেন তিনি, বিচারে তিনি যে রায় দেন তা হল চূড়ান্ত।

পুরুষের শৌর্যবীর্য ও নারীর সতীত্ব—এই দুটো বিষয়ের উপরই এরা সর্বাধিক

গুরুত্ব আরোপ করে। এদের সতীত্বের আদর্শ হলেন অরুন্ধতী। তটদেশে নারীর সতীত্ব হল সমুদ্রবক্ষে পুরুষের নিরাপত্তার জামিন। কারালাম্মা হলেন কঠিন নিয়ন্ত্রী, সমুদ্রের গভীরে তাঁর বাস, আঁকাবাঁকা স্রোত ও ঘূর্ণি অতিক্রম করে সেখানে পৌছতে হয়। দুষ্কৃতিকারী যারা, তাদের তিনি নির্দয়ভাবে সমুদ্রের গভীরে টেনে নেন। আর তিনি যখন ক্রুদ্ধ হন তখন সমুদ্র-দানব ও সামুদ্রিক সাপেরা তটদেশে উঠে ভীতির সঞ্চার করে।

তাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতার মধ্যে হাসিখেলার অবসর সামান্যই। তবু এই নিরবচ্ছিন্ন কর্মময় জীবনে কোনো মলিনতা নেই। মাঝে মাঝে জালে যখন প্রচুর মাছ ধরা পড়ে, জেলেরা কাছেপিঠে কোনো শহরে গিয়ে হৈ হুল্লোড় করে আসে। বছরে একবার করে আসে আয়িলিয়ান উৎসব—তখন সবাই নূতন কাপড়চোপড় পরে, ভোজ ও আনন্দ অনুষ্ঠানাদি হয়। প্রেম ও প্রণয়ের লীলা যে এদের জীবনে ঘটেনা এমন নয়। কখনো সে প্রেম অস্ফুট-অব্যক্ত, কখনো সার্থক, কখনো বা ব্যর্থতার অভিশাপে অশ্রুময়। বৃহত্তর জীবনের যত ক্ষুদ্র ও সামান্য ভগ্নাংশই হোক না কেন, নীরবুন্নাথ ও ত্রিকুন্নপুষার এই জেলেরা বিরাট মানবজাতিরই অংশবিশেষ।

চেম্মীন উপন্যাসের এই হল পটভূমিকা। এই বইয়ের নায়িকা কারুতাম্মার বাবা একজন জেলে—লোকটা বেজায় লোভী আর ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য। কারুতাম্মা প্রেমে পড়েছে একজন তরুণ মুসলমান ব্যবসায়ীর—তার নাম পারীকুট্টি। কিন্তু তাদের প্রেমের পথে সহস্র বাধা। কারুতাম্মা জানে পারীকুট্টির সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না। পারীকুট্টিও বোঝে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ তাদের মিলনের অন্তরায়। কারুতাম্মা আপ্রাণ চেষ্টা করছে পারীকুট্টি থেকে তার মন ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু বসন্তসমাগমে গোলাপ কুঁড়িটির মতোই তাদের প্রেম বিকশিত হয়ে ওঠে। একদিন কিন্তু কোনো দ্বিরুক্তি না করে, বুকের ব্যথা মুখে চেপে, কারুতাম্মাকে পতিত্বে বরণ করে নিতে হল স্বজাতের এক তরুণ জেলেকে। তার অন্তর্বেদনার কথা টের পেয়েছিল কেবলমাত্র তার মা। অতঃপর যার সঙ্গে বিয়ে হল তার সাধ্বী স্ত্রী হবার জন্য, তার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার জন্য কারু-তাম্মার আপ্রাণ সাধনা চলল। তার চিত্তের এই নিদারুণ সংগ্রামের কথা উপন্যাসের যে-অংশে বর্ণিত হয়েছে, সে এক ভারি করুণ অধ্যায়। সে জায়গাগুলি পড়তে পড়তে মন বেদনায় আর্দ্র হয়ে যায়। কিন্তু সূচনা থেকেই এই বিবাহ যেন রাহুগ্রস্ত, পারীকুট্টির স্মৃতি প্রতি পদে কারুতাম্মাকে যেন অনুসরণ করে চলেছে। ফলে অবশ্যম্ভাবী একটা করুণ ট্রাজেডিতে এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

নারায়ণ মেনন

প্রথম পরিচ্ছেদ

'বলি ও ছোট মিয়া, মাছ ধরতে আমার বাবার যে নৌকো আর জাল কিনতে হবে।'

'তা তোমার ভাগ্যে থাকলে নৌকো কেনা হবে।'

এ ধরনের জবাব পেয়ে কারুতাম্মার মুখে হঠাৎ কোনো উত্তর জোগাল না। তাই একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ও বলে উঠল, 'কিন্তু টাকায় বোধহয় কিছু কম পড়বে। কিছু টাকা দাও না গো মিয়াসাহেব!'

'টাকা? আমার কাছে টাকা কোথায়?'

পারীকুট্টি হাত উল্টে দিল—অর্থাৎ নেই। ওর হাত ওল্টানোর ভঙ্গি দেখে কারুতাম্মা হেসে ফেলল।

'টাকাই যদি নেই তবে আবার মাছের কারবারী হয়েছ কিসের?'

'কারুতাম্মা তুমি আমাকে "ছোট মিয়া", "মাছের কারবারী" এসব বলে ডাক কেন?'

'কি বলে ডাকব তাহলে?'

'কেন আমার কি নাম নেই? আমাকে পারীকুট্টি বলে ডাকবে।'

কারুতাম্মা 'পারী'—টুকু বলেই হেসে ফেলল।

পারীকুট্টি বলল, 'আরে সবটাই বল না।' কিন্তু হঠাৎ হাসিটি বন্ধ করে কারুতাম্মা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'না, "পারীকুট্টি" বলে তোমায় ডাকব না।'

'আমিও তাহলে তোমায় কারুতাম্মা বলে ডাকব না।'

'কি বলে ডাকবে তাহলে?'

'জেলেনী বলে।'

পারীকুট্টির কথা শুনে কারুতাম্মা হি হি করে হেসে উঠল। ওর হাসি দেখে পারীকুট্টিও হেসে ফেলল। অনেকক্ষণ ধরেই দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে শুধু

হেসেই চলল। এ হাসির কোন অর্থ হয় না। অথচ কেন যে তারা এতক্ষণ হাসছে তা কে জানে! হাসতে হাসতে এক ফাঁকে পারীকুট্টি বলল:

'আচ্ছা শোন গো জেলেনী, নৌকো আর জাল কিনে যে মাছগুলো ধরা হবে সেগুলো আমার কাছে বিক্রী করার জন্যে বাপজানকে বলবে তো?'

'ভালো দাম দেবে তো? তা হলে বলব—। নইলে—', বলে ঘাড় নেড়েই আবার কারুতাম্মা হেসে উঠল।

এই সামান্য একটু কথার মধ্যে এত কি হাসি থাকতে পারে? অথচ দুজন দুজনের সামান্য কথাতেই হেসে উঠছে। যেন ওরা পরস্পরকে যাই বলুক তাতে না হেসে ওদের উপায় নেই।

হাসতে হাসতে কারুতাম্মার চোখ জলে ভরে এল। দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমাকে এমনিভাবে হাসিও না ছোট মিয়া।'

'বেশ তো নিজের হাসি নিজে থামাও।'

'আমাকে হাসিয়ে মারছ আর বলছ, নিজের হাসি নিজে থামাও! কি রকম লোক গো তুমি'—কথা শেষ না হতেই আবার দুজনে হেসে উঠল।

দুজনে যেন দুজনকে কথার পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। বেশিক্ষণ সুড়সুড়ি দিলে হাসি হয়ে যায় কান্না। তাই কিছুক্ষণ পরেই কারুতাম্মার মুখটা লাল হয়ে উঠল। একটু পরে ও ভুয়ো রাগ দেখিয়ে ভারী গলায় বলল, 'আমার দিকে অমন করে তাকিও না।'

কারুতাম্মার কথা শুনে পারীকুট্টির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পারীকুট্টি কি না জেনে কোন অপরাধ করে ফেলল? ও বলল, 'কারুতাম্মা তুমিই তো আমাকে হাসালে আর এখন—।'

'আহা হা হা।'

হঠাৎ কারুতাম্মা কি জানি কেন লজ্জা পেয়ে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ওর সারা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। ও একটা পাতলা মুণ্টু[১] পরে আছে।

'আঃ কি হচ্ছে ছোট মিয়া? আমার দিকে অমন করে তাকিও না।'

এমনি ভাবে দুজনে হাসাহাসি কথা কাটাকাটি করতে করতে কতটা সময় বয়ে গেছে তা কারুতাম্মার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ মায়ের ডাকে ও চমকে উঠল। ওর মা চাকী বাজার থেকে ফিরে এসেছে। মেয়েকে বাড়িতে দেখতে

১ কেরলীয় রমনীদের অধোবাস, অনেকটা লুঙ্গির মতো।

না পেয়ে হাঁকাহাঁকি করছে। মায়ের ডাক শুনে কারুতাম্মা ভয় পেয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। একটাও কথা না বলে কারুতাম্মাকে অমনিভাবে ছুটে চলে যেতে দেখে পারীকুট্টি ভাবল কারুতাম্মা সম্ভবতঃ রাগ করে চলে গেল। ভেবে পারীকুট্টির খুব খারাপ লাগল। কি এমন হতে পারে যার জন্যে কারুতাম্মা অমনিভাবে চলে গেল! আর ওদিকে কারুতাম্মাও বাড়ি গিয়ে ভাবতে লাগল, পারীকুট্টিকে অমন কড়াভাবে কথাটা বলা ঠিক হয় নি। অমন করে ওর দিকে তাকাতে বারণ করেছে। পারীকুট্টি কি মনে করল কে জানে। রোজই তো পারীকুট্টি ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনও দিনতো ও তাকে কিছু বলেনি আর আজ এমন ভাবে বলে ফেলল। নিশ্চয়ই ওর কথা শুনে পারীকুট্টি কিছু মনে করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাসির কথাটাও মনে পড়ল। পারীকুট্টির সামনে তো নয়ই আর কারুর সামনেই এমনভাবে ও কখনও হাসে নি। এমন ভাবে হাসাটা যেন একটা অভিজ্ঞতা। হাসতে হাসতে ওর মনে হচ্ছিল যেন ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে, যেন ফুসফুসের কোষগুলো ফেটে যাবে। আর সে-সময় দেহে কাপড়চোপড় কম থাকায় ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পারীকুট্টির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পারীর সামনে অত অল্প কাপড় পরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর কেবল মনে হচ্ছিল ও যেন কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই সময় ওর মনের যা অবস্থা তাতে পারীকুট্টিকে খারাপ কিছু বলা ওর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। বারবার এখন তাই ওর মনে হতে লাগল পারীকুট্টি কি ওর কথায় কিছু মনে করল।

এদিকে কারুতাম্মার বুকের পদ্মকুঁড়ি দুটি দেখে পারীকুট্টির যেন নেশা লেগে গিয়েছিল। ঐ বুকেরই আড়ালে তাকে পাওয়ার কামনা দিনের পর দিন বেড়ে উঠছে আর ঐ বুকেরই অন্তরালে এই বিচিত্র হাসির রহস্য লুকিয়ে আছে। পারীকুট্টির আবার নতুন করে মনে পড়ল কারুতাম্মার পরনে ছিল একটা মাত্র মুণ্ডু, ভেতরে সায়া বা আর কিছু ছিল না। মুণ্ডুটাও ছিল পাতলা। পাতলা অল্প কাপড়ে ঢাকা কারুতাম্মার দেহটার ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত শরীরটা গরম হয়ে উঠল। শিরায় শিরায় জেগে উঠল রক্তের জোয়ার।

হঠাৎ পারীকুট্টির মনে হল তার ওপর রাগ করেই কারুতাম্মা চলে গেছে। পারীকুট্টি কারুতাম্মার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। ওর দেহের দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। কারুতাম্মা ওর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরেছিল তাই ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আমার দিকে অমন করে তাকিও

না। যদি তাই হয়, ওর অসংযত ব্যবহারে যদি কারুতাম্মা রাগ করে থাকে, তাহলে কি কারুতাম্মা আর কোনদিন ওর সামনে আসবে না ?

যদি তাই হয় ও তাহলে কারুতাম্মার কাছে মাপ চাইবে আর কোনদিনও ও এইরকম অভদ্রতার পরিচয় দেবে না। এমনিভাবে দুজনেই দুজায়গায় বসে ভাবতে লাগল যে পরস্পরের কাছে তারা ক্ষমা চেয়ে নেবে।

কারুতাম্মার বয়স তখন চার কি পাঁচ। সমুদ্রের ধারে ও ঝিনুক কুড়ত, কাক তাড়াত আর জাল ঝাড়ার সময় কুঁচো মাছ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত তখন তাই কুড়ত। তার সঙ্গে তখন আর একজনও মাছ কুড়ত তার শৈশবের খেলার সাথী, পারীকুট্টি। পরনে পায়জামা, গায়ে হলুদ রঙের জামা, গলায় একটা সিল্কের রুমাল বেঁধে মাথায় টুপি পরে প্রথম যখন ও ওর বাবার হাত ধরে সমুদ্রের ধারে এসেছিল তখনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে কারুতাম্মার। ওদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে পারীকুট্টির বাবা ঘর বেঁধেছিল। আজও সে বাড়ি সেখানে আছে। পারীকুট্টি আজ যুবক। বড় হয়ে সে মাছের ব্যবসা শুরু করেছে।

এমনি ভাবে সমুদ্রের ধারে তারা পাশাপাশি থেকেছে, খেলা করেছে, ঝগড়া করেছে আর বড় হয়েছে। সে আজ কতদিন হয়ে গেল। বাড়িতে এসে কারুতাম্মা রান্নাঘরে ঢুকে উনুন ধরাচ্ছিল আর এই সব কথা ভাবছিল। একটার পর একটা কত কথা ওর মনে পড়ছিল। উনুনের বাইরে কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সেদিকে ওর খেয়াল নেই। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে ঢুকল ওর মা চাকী। মেয়ের রকমসকম দেখে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—কাণ্ড দেখ মেয়ের ! কাঠগুলো সমানে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আর মেয়ে চুপ করে বসে বসে স্বপ্ন দেখছে ! রাগের চোটে চাকী মেয়ের গায়ে এক ধাক্কা মারল। কারুতাম্মা চমকে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। চাকী রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল :

'বলি কার ধেয়ান করছিলি রে ছুঁড়ি ?'

কারুতাম্মা যে ভাবে বসেছিল তাতে যে কেউ ওই একই প্রশ্ন করবে। কারুতাম্মাকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আর এই লোকে নেই। কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যে ও ভেসে বেড়াচ্ছে। তার ওপর আবার ছোট বোন পঞ্চমী ফোড়ন দিল :

'জানো মা, দিদি সুমুদ্দুরের ধারে ওই নৌকোটার কাছে দাঁড়িয়ে ছোট মিয়ার সঙ্গে কি হাসাহাসিটাই করছিল।'

কারুতাম্মা চমকে ওঠল। আজ পর্যন্ত তাদের এই হাসাহাসি, মেশামেশির

কথা কেউ জানত না। পঞ্চমী আজ হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল। পঞ্চমীর মুখ তখনও বন্ধ হয়নি :

'ওঃ, কি হাসিই হাসছিল মা ওরা, তা কি বলব!' তারপর দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন, আর আমার সঙ্গে ইয়ারকি মারবি? তার ফল দেখ্ কি হয়—' বলে দিদিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুটে পালাল।

ব্যাপারটা হয়েছে যে পঞ্চমীকে বাড়ি বসিয়ে রেখে কারুতাম্মা সমুদ্রের ধারে গিয়েছিল। ওদের বাবা চেম্পনকুঞ্জের হুকুম ছিল যে বাড়িতে সবসময় একজন না একজন যেন থাকে। নৌকো আর জাল কেনার জন্য কিছু টাকা বাড়িতে ছিল তাই নিয়ে চেম্পনকুঞ্জের অস্বস্তির শেষ ছিল না। তাই কারুতাম্মা চলে গেলে পর পঞ্চমীর বাড়ি ছেড়ে যাবার উপায় ছিল না। পঞ্চমী ছেলেমানুষ, পাশের বাড়ির বাচ্চাগুলোর সঙ্গে খেলার জন্যে ওর মন ছটফট্ করছিল অথচ বাড়িতে কেউ নেই, কি করেই বা যায়। তাই মাকে দিদির নামে লাগিয়ে এমনিভাবে ওর রাগের প্রতিশোধ নিল।

পঞ্চমীর কথা শুনে চাকী হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'বলি একি শুনছি?'

কারুতাম্মা কোনও উত্তর দিল না।

'তোর যে দেখছি খুব বাড় বেড়েছে। তুই ভেবেছিস কি রে, হারামজাদী?'

এবার আর জবাব না দিলে চলবে না। কিন্তু কি বলবে? অনেক ভেবে একটা জবাব বানিয়ে নিল, 'আমি···আমি সুমুদ্দুরের ধারে গেলে পর—'

'গেলে পর?'

'ছোট মিয়া তখন নৌকোতে বসেছিল।'

'তাতে হাসাহাসির কারণটা কি হল শুনি?'

'নৌকো আর জাল কেনার টাকা কম পড়লে আমাদের কিছু টাকা ধার দিতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'পারীকুট্টির কাছে টাকার কথা জিজ্ঞেস করতে তোকে আমরা বলেছিলাম?'

'কাল তুমি আর বাবা বলাবলি করছিলে না যে ছোট মিয়ার কাছে টাকা চাইবে?'

এসব শুধু অজুহাত মাত্র আর এই অজুহাত বানানো ছাড়া কারুতাম্মার অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। চাকী কারুতাম্মার আপাদমস্তক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল।

চাকী আজ কারুতাম্মার ওই বয়সটা পার হয়ে এসেছে। নইলে চাকীর

যখন কম বয়স ছিল তখন সমুদ্রতীরে ছোট ছোট মাছের ঝাঁপগুলোতে ছোট মাছের ব্যবসাদাররাও ছিল। তীরে বাঁধা নৌকোগুলোর আড়ালে ডেকে এনে তারাও চাকীকে এমনি ভাবে হাসাতে পারত কিন্তু সেরকমটা কিছু ঘটেনি কারণ চাকী বংশপরম্পরায় তার মা-দিদিমার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছে, যে নীতি-কথা সে শুনে এসেছে তা সে কিছুমাত্র ভোলে নি। তার মা দিদিমার কাছ থেকে সে শুনেছিল এক পুণ্যবতী জেলেনীর পবিত্র জীবনকাহিনী। এই সতী জেলেনীর জীবনকাহিনী শুনেই জেলের ঘরের মেয়েরা তাদের চরিত্র ঠিক রাখতে পারে, চাকীও পেরেছে। সেই পুণ্যবতী জেলেনীর আদর্শ অনুসরণ করে শুদ্ধ মন নিয়ে স্বামীর সেবা করেছে, ওদের এই সাগরতীরকে পবিত্র রেখেছে। চাকী আজ আবার অনেকদিন পরে এই গল্প মেয়েকে শোনাল।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। একদিন এক জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে স্রোতের বিপরীত দিকে তার নৌকো চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দূর চক্রবালে যেখানে সমুদ্র গিয়ে দিগন্তের সঙ্গে মিশেছে সেই অতদূর সে চলে গিয়েছিল। তার বেরোনর সময় সেই সমুদ্রতীরেই তার জেলেনী পশ্চিমদিকে তাকিয়ে স্বামীর মঙ্গলের জন্য ব্রত করতে বসল। কিছুক্ষণ পরেই ভয়ানক ঝড়, তুফান শুরু হল। তিমি মাছ হাঁ করে সেই জেলেকে খেতে এল, হাঙরেরা লেজের ঝাপটা দিয়ে তার নৌকোকে ভেঙে চুরমার করতে চেষ্টা করল। হঠাৎ তার নৌকোটা একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেল। বাঁচার আর তার কোন আশাই ছিল না কিন্তু নিশ্চিত মরণের হাত থেকে লোকটা আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেল। শুধু তাই নয় একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরেও সে তীরে উঠেছিল। কি করে সেই ভয়ানক ঝড়-তুফান, ওই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল? তিমি মাছ কেন ওকে গিলে খায় নি? হাঙর বার বার নৌকোতে লেজের ঝাপটা মারলেও ওর নৌকোটার এতটুকু কিছু হয় নি কেন? ঘূর্ণির মধ্যে পড়েও নৌকোসুদ্ধ লোকটা বেঁচে গেল কি করে? এসব অসম্ভব সম্ভব হল কি করে? একমাত্র কারণ তার জেলেনীর সেই একান্ত তপস্যা, স্বামীর প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম—তার খাঁটি চরিত্র।

এই আশ্চর্য তপশ্চর্যার কথা সমুদ্রতীরের সমস্ত জেলেনীর জানা আছে। সেই একনিষ্ঠতা, সেই শুদ্ধতা চাকীও নিজের জীবনে মেনে এসেছে। তবে চাকীর পূর্ণ যৌবনের দিনে কি কোনও মাছের কারবারী কোন দোকানদার তার দেহটার দিকে তাকিয়ে দেখে নি? দেখেছে বৈকি! কিন্তু যাতে চাকী কুপথে

পা না-দেয় তার জন্যে চাকীর মাও চাকীকে সমুদ্রতীরের জেলেদের সেই অদ্ভুত তপস্যার কথা সেই অদ্ভুত ভাবে পবিত্র খাঁটি জীবনকাহিনীর কথা বলে ওকে সাবধান করে দিয়েছে।

আজকে পারীকুট্টির সঙ্গে এমনভাবে হাসাহাসিতে কারুতাম্মার দোষ থাকুক বা না থাকুক চাকী এই অবসরে গল্পটা বলে নিল। সব শেষে বলল, 'তুই আর খুকিটি নেই বুঝলি। তুই এখন ডাগর হয়েছিস। এখন তোকে সকলে খুকি না বলে জেলেনীই বলবে। এখন আর ছেলেমানুষের মতো হাসাহাসি করার বয়স নেই—বুঝলি ?'

মার মুখে 'জেলেনী' কথাটা শুনেই কারুতাম্মার মনে পড়ল পারীকুট্টির তাকে জেলেনী বলে ডাকা। চাকীর কথা তখনও শেষ হয়নি। ও বলল :

'দেখ খুকি, এই মস্তবড় সাগরটার বুকের ভেতর সব আছে। যা চাইবি সব। সমুদ্দুরে কত ঝক্কি মাথায় নিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে যায়—সেখানে কত কি না হতে পারে কিন্তু দেখবি তারা সব ঠিকমতো ফিরে আসে। কেন জানিস ? সমুদ্দুরে তারা যখন যায় তখন তাদের বাঁচা-মরা সব নির্ভর করে তাদের জেলে-নীদের ওপর। জেলেনীরা যদি খাঁটি থাকে তাহলে তাদের মিনসেরা ঠিকই ঘরে ফিরে আসে, নইলে দেখতিস তাদের নৌকোগুলো সব ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ডুবে যেত।

এই কথাগুলো কারুতাম্মা যে শুধু মার কাছে শুনছে তা নয়। যেই চার-পাঁচজন জেলেনী একজায়গায় জড়ো হয় তখনই তারা এই গল্প করে। অনেকবার অনেক জায়গায় ও এই একই কথা শুনেছে।

সবই ঠিক কিন্তু তা বলে ছোট মিয়ার সঙ্গে একটু হাসাহাসিতে দোষটা কোথায় ? তার তো এখনও বিয়েই হয়নি। সমুদ্রে-মাছ-ধরতে যাওয়া কোন বিশেষ জেলের মরণ-বাঁচন তো তার ওপর নির্ভর করছে না। যদি ভবিষ্যতে কোনও জেলের জীবনমরণ তার ওপর নির্ভর করে তাহলে সে-দায়িত্ব সে ঠিক মতোই রক্ষে করবে। কেমনভাবে সাবধান হতে হবে, কেমনভাবে খাঁটি থাকতে হবে তা তার খুব ভাল ভাবেই জানা আছে। কাউকে সে-বিষয়ে কিছু বলে দিতে হবে না।

মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে চাকী আবার আরম্ভ করল, 'কখনও কখনও আমাদের খারাপ কাজে সমুদ্দুর শুকিয়ে যায়। সাগর দেবীর রাগ হলে তিনি সব ছারখার করে ফেলেন, কিন্তু তিনি যদি খুশি থাকেন তাহলে আমাদের তুহাত উজাড় করে দেন। এই সাগরে সোনা আছে, খুকি, তালতাল সোনা—।'

তারপর একটু থেমে খুব বড় একটা সত্য মেয়েকে শোনায় :

'কথাটা কি জানিস, খাঁটি থাকা, নিজেকে ঠিক রাখা। জেলের সম্পত্তি হচ্ছে তার স্ত্রীর খাঁটি থাকাটা। তবে হ্যাঁ, অনেক সময় আমরা খাঁটি থাকলেও মাছের কারবারীরা আমাদের এই সমুদ্দুর খারাপ করে তোলে। চিংড়ী মাছের খোসা ছাড়াতে, শুকনো চিংড়ি নৌকোয় তুলতে পুবদিক থেকে অনেক মেয়ে আসে দিনমজুরি খাটতে। এই মেয়েগুলো আর ঐ খারাপ লোকগুলো সমুদ্দুরের ধার অশুদ্ধ করে তোলে। সমুদ্দুরের ধারটাও যে সাগর মার জায়গা, সেটাও যে পরিষ্কার রাখতে হয় তাও তারা জানে না। তারা তো আর সাগর মার ছেলেমেয়ে নয় তাই তারা যা খুশি করে, কিন্তু ফল ভোগ করতে হয় আমাদের জেলেদের।'

চাকী আরও বলে, 'দেখ, নৌকোগুলো তীরে বেঁধে রাখার সময় দেখবে তাদের মাঝে মাঝে ফাঁক রয়ে গেছে। ঐ ফাঁকগুলো আর আশেপাশে যে ঝোপ-ঝাড় আছে সেইগুলোই হচ্ছে খারাপ জায়গা।'

সবশেষে মেয়েকে চাকী ভারী গলায় সাবধান করল, 'তোর এখন বয়স বাড়ছে। মাছের কারবারীরা তোর বুকের দিকে, পাছার দিকে নজর দেবে। খুব সাবধান।'

কারুতাম্মা চমকে উঠল। ঠিকই তো, সে-দিন নৌকোর আড়ালে এই-রকমই ব্যাপার তো ঘটেছে। তাই সেদিন পারীকুট্টির ওপর ওর হঠাৎ রাগ হয়েছিল যার জন্যে ও পারীকুট্টিকে ওর দিকে তাকাতে বারণ করেছিল, সে কি তাহলে মা-দিদিমার কাছ থেকে পাওয়া সেই শুদ্ধ মনের জন্যে? মাছের কার-বারীরা তার দিকে যদি কুনজরে দেখে তাতে তার গৌরব বাড়ে না। তাই সেদিন তার ছোট মিয়ার চাউনিটাও ভালো লাগেনি। মার কথা তখনও শেষ হয়নি :

'খুকি, মনে থাকে যেন এমন কাজ তুই করবি না যাতে এই সাগর শুকিয়ে যায়। সমুদ্দুরেই যাদের রুজি-রোজগার তাদের মুখের ভাত যেন না মারা যায়।'

মার কথা শুনে কারুতাম্মা এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। চাকী আবার বলল, 'পারীকুট্টি মোছলমান। ওর চরিত্তিরে বিশ্বেস নেই।'

কারুতাম্মার মনে হল মার অজানা কিছুই নেই। মার কাছ থেকে লুকো-বারও কিছু নেই। মার-কথাগুলো শুনে ওর মনে কেমন যেন একটা ভয় আর অস্বস্তির কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। সেদিন রাতে ওর ঘুম হল না। পঞ্চমীর কথা মনে পড়ল। কিন্তু পঞ্চমী ওর গোপন কথা সব বলে দিলেও এখন আর

পঞ্চমীর ওপর কোন রাগ হচ্ছে না। পঞ্চমী যে ওর নামে অমন ভাবে মার কাছে লাগাল তাতেও ওর কিছু মনে হল না। তাহলে কি ও দোষ করেছে বলে পঞ্চমীর ওপর ওর রাগ নেই? তাই-ই হবে, নইলে অন্য সময় এতবড় একটা কথা এমনভাবে বললে পঞ্চমীর ওপর ওর রাগ কোনদিনও যেত না। হাজার হাজার বছর ধরে জেলেনীরা যে-সংস্কার মেনে আসছে, যে-বিশ্বাস পোষণ করে আসছে তার থেকে সেও তো বাদ পড়েনি। এখন সেই সংস্কারের সেই শুচিতার রূপ যেন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে।

কারুতাম্মার মন যখন এমনিভাবে শুচিতা-অশুচিতার দ্বন্দ্বে অস্থির তখন যেন তার মনের সেই দ্বন্দ্ব থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যে সমুদ্রতীর থেকে কার গানের সুর ভেসে আসতে লাগল।

কে? কে গান গাইছে? কারুতাম্মা কান খাড়া করল।

পারীকুট্টি। পারীকুট্টি গান গাইছে। পারীকুট্টি ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু আজ ও নৌকোর ছইএ বসে প্রাণ খুলে গান গাইছে। কারুতাম্মা বুঝতে পারল পারীকুট্টি যে ওখানে বসে আছে তা কারুতাম্মাকে এভাবে জানানো ছাড়া উপায় কি?

ওর এইভাবে চীৎকার করে গান গাওয়ার অর্থ আর কেউ না বুঝলেও যার বোঝার সে বুঝেছে। যার জন্যে এ গান গাওয়া সে শুনেছে। কারুতাম্মা ভয়ায়ক উসখুস করতে লাগল। পারীকুট্টির কাছে যাওয়ার জন্য মন ছটফট্ করছে। এখন যদি ও বেরিয়ে পড়ে তাহলে কেউ জানতে পারবে না⋯কিন্তু⋯ কিন্তু পারীকুট্টি যে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। যেতে হলে ওকে যেতে হবে নৌকোগুলোর আড়ালে। মা আজকেই বলেছে যে ওই জায়গা-গুলোই হচ্ছে সবচেয়ে সাংঘাতিক জায়গা, যত কিছু দুর্ঘটনা ওইখানেই ঘটে। আরও খারাপ কথা যে পারীকুট্টি জাতে মুসলমান।

পারীকুট্টির গান তখনও থামেনি। প্রেমের যে বিশেষ গানটি ওখানকার জেলেরা গায় সেই গানটির সেই বিশেষ সুরটিই পারীকুট্টির গানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারুতাম্মা মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল। যদি আর কিছুক্ষণ ও এই গান শোনে তাহলে ও আর শুয়ে থাকতে পারবে না। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়বে। কারুতাম্মা সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গেল। পারীকুট্টি এমনভাবে তার বুকের দিকে তাকায় যে তার বুক ধড়াস ধড়াস করে ওঠে কিন্তু তবু সেই চাউনীতে ও কি যেন একটা আনন্দও পায়। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাকালোই বা পারীকুট্টি ওর বুকের দিকে—বুক তো একতাল মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই

নয়। হঠাৎ ও উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে কানে আঙুল দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই গান যেন ওর বুকের ভেতর আওয়াজ তুলতে লাগল। সারা দেহমন ওর সেই গান শুনতে শুনতে অবশ হয়ে আসতে লাগল।

কারুতাম্মা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বারবার ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ওদের এই ছোট্ট ঘরের দরজা হয়তো খোলা যায়, যদি না খোলে ভাঙাও যায় কিন্তু সংস্কারের যে ভারী দেওয়ালের আড়ালে ও আজ বাঁধা পড়েছে তা ভেঙে কি করে ও বেরোবে? এর থেকে এত সহজে মুক্তি পাবার তো ওর কোন উপায়ই নেই। বেরোতে চাইলেও বেরোতে পারবে না। এ দেওয়াল জমাট বাঁধা কংক্রীটের, হাজার হাজার বছর ধরে সমুদ্রতীরের জেলেদের সংস্কারে-গড়া উঁচু কঠিন দেওয়ালের আড়ালে সে বদ্ধ। সেই দেওয়ালের কোথাও কোন ফাঁক নেই। কিন্তু ওর দেহ যা চাইছে ওর মন যা চাইছে তাকে ও অস্বীকার করবে কি করে? ওর যৌবন ওর লোভী মন যদি সেই দেওয়াল ভাঙতে চায়? ও তো জানে এমনি ভাবে কত কংক্রীটের দেওয়াল ভেঙে গেছে।

পারীকুট্টির গান তখনও সেই নির্জন সমুদ্রতীরের হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। পারীকুট্টির গানে সুর-তালের নামগন্ধ নেই, গলাও ভালো নয় কিন্তু তবু সেই গানে যেন কি একটা জাদু রয়েছে। কি যেন একটা আন্তরিকতা রয়েছে। সে যেন তার সমস্ত দরদ দিয়ে সমস্ত প্রাণমন ঢেলে গান গাইছে। পারীকুট্টি যে সমুদ্রের ধারে এখনও বসে আছে তা কি কারুতাম্মাকে জানাতে হবে না, তাই তো এমনি ভাবে সে গেয়ে চলেছে। কারুতাম্মার কাছে পারী-কুট্টির যে ক্ষমা চাইতে হবে। গাইতে গাইতে বুঝি পারীকুট্টির গলা ভেঙে এলো। আর কতক্ষণ এমনি ভাবে সে গাইবে?

কারুতাম্মা কান থেকে আঙুল সরিয়ে নিল। পাশের ঘরে মা আর বাবা কি যেন বলাবলি করছে। না, ওরা ঝগড়া করছে। কারুতাম্মা কান খাড়া করে রইল। হরি! হরি! ওর কথাই যে তারা বলছে।

শুনতে পেল বাবা বলছে, 'আরে আমি ও সব জানি—আমাকে আর তোর কিছু বলতে হবে না। আমি ঘাস খাই না। আমিও মানুষ।'

চাকী বলল, 'ওঃ, কি আমার মানুষ রে! মেয়েটার দিকে একবার নজর দিয়েছ? সে গোল্লায় যাচ্ছে কি না যাচ্ছে তার খোঁজখবর একবার নিজে নিয়েছ?'

'যাঃ যাঃ বেশি বকর বকর করিসনি। তার আগেই আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব।'

'বলি তা কি করে হবে ? পয়সা না দিলে কে আসবে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে ?'

'হবে হবে পয়সা জোগাড় হবে। আগে এই নৌকো আর জালটা হতে দে না তার পর—'

এ-সব কথা চাকী হাজার বার শুনেছে। তাই কথার মাঝখানে রেগে গিয়ে বলে উঠল, 'ঐ নৌকো আর জাল কেনার স্বপ্নই দেখ।'

চেম্পনকুঞ্জ দিব্যি করে বলল 'ও-পয়সার আমি একটা আধলাও খরচ করব না তা তুই যতই না কেন ঘ্যানর ঘ্যানর করিস।'

চাকী রেগে গিয়ে বলল, 'মেয়েকে শেষ পর্যন্ত কোনো মোছলমানে নষ্ট করুক। তাই-ই হবে শেষ পর্যন্ত।'

চেম্পনকুঞ্জ এবার কোনও কথা বলল না। কথাটার গুরুত্ব ও বুঝেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি একটা ছেলে দেখছি।'

'বিনি পয়সায় ?'

'হ্যাঁ বিনি পয়সায়ই'—চেম্পনকুঞ্জ জোর দিয়ে বলল।

'ও ! তাহলে খুব ভাল ছেলেই আসবে—হবে কোন কানা খোঁড়া।'

'যা মাগী বেশি ফঁ্যাচ্-ফঁ্যাচ্ করিসনি। তুই কি ছেলে দেখেছিস যে কানা খোঁড়া বলে দিলি ?'

কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের কথায় কান না দিয়ে চাকী বলল, 'তার চেয়ে মেয়েকে সমুদ্দুরে ভাসিয়ে দাও।'

চেম্পনকুঞ্জ চাকীকে খেঁকিয়ে উঠল।

চাকী ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল, 'কার জন্যে এই নৌকো আর জাল শুনি ?'

চেম্পনকুঞ্জ কিছু বলল না। ওর জীবনের একটা গভীর আশা জাল আর নৌকো কেনা। কার জন্যে তা তো সে কোনওদিন ভাবেনি।

চাকী স্বামীকে উপদেশ দিল, 'ঐ ভেলায়ুধনের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখনা যদি রাজী হয়।'

'আরে ছ্যাঃ, ওটা কি আবার একটা পাত্তর নাকি ?'

'কেন ? খারাপটা কি ?'

'ওটা তো একেবারে একটা দিনমজুরী-খাটা জেলে।'

'তা জেলে ছাড়া মেয়ের আর কি পাত্তর জোটাবে শুনি ?

চেম্পনকুঞ্জ কোনও উত্তর দিল না।

'মুসলমানে মেয়েটাকে নষ্ট করুক'—মার এই কথাগুলো কারুতাম্মার কানের মধ্যে ভন ভন করতে লাগল। বাবা অবশ্য এর সব মানেটা বুঝতে পারেনি। কারুতাম্মার বুকের ধকধকানি আরও বেড়ে গেল। মুসলমানের ছেলে কি ওকে এখনই নষ্ট করেনি। ওর সারা মন যে ঐ মুসলমানের ছেলের জন্যেই আকুলি-বিকুলি করছে।

পারীকুট্টির গান তখনও থামেনি। সমুদ্রের হাওয়ায় হাওয়ায় সে-গান তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন কারুতাম্মা বাড়ি থেকে বেরোল না। পারীকুট্টির দোকানে সেদিন অনেক কাজ ছিল। পুব দিক থেকে সেদিন অনেক মেয়ে-মজুর এসেছে। শুকনো চিংড়ি বস্তা বেঁধে নৌকোয় তোলা হচ্ছে, মাল নিয়ে নৌকো ছাড়ছে, সকলেই খুব ব্যস্ত।

কাজকর্ম না থাকায় কারুতাম্মা বাড়িতে চুপচাপ বসে ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ও চমকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠল। পারীকুট্টি যদি ঐ সব মেয়ে-মজুরদের বুকের দিকে পেছন দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে? দেখে কেন, নিশ্চয়ই দেখবে—দেখুক গে, ওর তাতে কি। কিন্তু এই চিন্তা ক্রমে ওকে অস্থির করে তুলল। ও যেন কিছুতেই ভাবতে পারছিল না যে পারীকুট্টি ও ছাড়া আর অন্য কোন মেয়ের দিকে তাকাবে। বেচারী বাড়িতে একা-একা বসে ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

দুপুর প্রায় শেষ হওয়ার পর মাছধরা নৌকোগুলো সব সমুদ্র থেকে ফিরে এল। চাকী ঝুড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে গেল। যাওয়ার সময় মেয়েকে আর একবার সাবধান করে গেল, 'যা বললাম সব মনে রাখিস বাছা।'

মার কথা শুনে কারুতাম্মার একটু হাসি পেল। কি যে মনে রাখতে হবে তা কারুতাম্মা ভাল করেই জানে। মাকে আর তা মনে করিয়ে দিতে হবে না।

মা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বাবা এল। কারুতাম্মা বাবাকে ভাত বেড়ে দিল। চেম্পনকুঞ্জ খেতে খেতে মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বাবা তো রোজই ওকে দেখে কিন্তু আজকে আবার চাউনীটা যেন অন্য ধরনের—যেন অনেক কিছু বলতে চায়। বাবা কি তাহলে তার সবকথা জানতে পেরেছে? কিন্তু কই বাবার চাউনী তো খুব কড়া নয়, তাতে তো রাগের চিহ্ন এতটুকুও নেই।

চেম্পনকুঞ্জ খাচ্ছিল আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল। আগের

দিন রাতে চাকী ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিল মেয়ে ডাগর হয়ে উঠেছে। অনেক-দিন ধরেই নিজের একটা নৌকো আর জাল কেনার কথা চেম্পনকুঞ্জ ভাবছে। কিন্তু জাল আর নৌকো কেনার চেয়ে এখন মেয়েকে নিয়েই ও বেশি ভাবনায় পড়েছে। সোমত্ত মেয়ে। চাকী আবার ভয় ধরিয়ে দিয়েছে কোনও মুসলমান মেয়েকে নষ্ট করে দিতে পারে। কথাটার অর্থ কিন্তু তার ভালো বোধগম্য হয়নি তাই মেয়েকে একটু ভালো করেই আজ ও লক্ষ্য করতে লাগল।

চেম্পনকুঞ্জ অন্যের নৌকোয় ভাগে কাজ করে। মাছ যা ওঠে তার ভাগ পায়। আগে সে দাঁড় বাইত এখন হাল ধরে। পরের নৌকোয় খেটে সুখ নেই। চেম্পনকুঞ্জের তাই সবচেয়ে বড় সাধ যে নিজের একটা নৌকো আর জাল কেনে। তার জন্যে যত কষ্টই হক না কেন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে রাজী আছে। একটা পয়সাও চেম্পনকুঞ্জ বাজে খরচ করে না। কিছু টাকা ওর হাতে অবশ্য জমেছে কিন্তু ঐ কটা টাকা দিয়ে নৌকো আর জাল কেনা যায় না।

মেয়ের এদিকে বয়স বাড়ছে। ডাগর মেয়ে! কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। চাকী ঠিকই বলেছে। মেয়ের মনে কি আছে না আছে তা চাকী ছাড়া আর কেই বা ভালো করে জানবে? মেয়ে ডাগরটি হলে মার মনে যে ভাবনা হয় তা মা ছাড়া আর কেই বা ভালো করে বুঝবে? চেম্পনকুঞ্জ সত্যিই খুব ভাবনায় পড়ল। কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। নৌকো আর জাল কিনবে না মেয়ের বিয়ে দেবে। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে চেম্পনকুঞ্জ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেয়েকে বলল:

'মা, নিজের দিকে একটু নজর রাখিস। যা দিনকাল পড়েছে। কাউকেই বিশ্বেস নেই।'

কারুতাম্মা চমকে উঠল। বাবা, বাবাও তাহলে এই কথা বলছে। কাল রাতে ও আড়ি পেতে যা শুনেছিল মা কি তার চেয়ে বেশি কিছু বলেছে? ও কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইল। চেম্পনকুঞ্জ মেয়ের কাছ থেকে কোনও জবাব আশাও করেনি। মেয়েকে সাবধান করে দেওয়ায় জন্যেই কথাগুলো ও বলেছে।

সেদিন বিকেলের দিকে মজুরদের বিদেয় করে পারীকুট্টি নৌকোর ওপর বসেছিল আর বারবার চেম্পনকুঞ্জের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছিল যদি কারুতাম্মা একবার এদিকে আসে এই প্রতীক্ষায়। ঠিক এই সময় চেম্পনকুঞ্জ ওর নৌকোর দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পেল।

কারুতাম্মা সকাল থেকে বাড়িতে বসে ছিল। বিকেলের দিকে সমুদ্রের

ধারে যাবে কিনা। ভাবছিল এমন সময় দেখতে পেল পারীকুট্টি আর ওর বাবা কি যেন বলাবলি করছে। ওরা কি এত কথা বলছে জানার জন্য কারুতাম্মার খুব কৌতূহল হল। ওর কেমন যেন মনে হল বাবা ঠিক পারীকুট্টির কাছে টাকা ধার চাইছে।

সেদিন রাতে বাবা বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ মার সঙ্গে ফিসফিস করে কি সব বলল। কারুতাম্মা আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করল কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না, কেননা মা-বাবা খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল।

সেই রাতেও পারীকুট্টি গান গাইছিল। কুঁড়ে ঘরে শুয়ে কারুতাম্মা সেই গান শুনছিল। আগে পারীকুট্টিকে শুধু একটা কথা বলতে চেয়েছিল—পারীকুট্টি যেন তার দিকে অমন করে না তাকায়। এখন আর একটা কথা বেড়েছে—পারীকুট্টি যেন অমনভাবে গান না গায়।

শুয়ে শুয়ে কারুতাম্মা ভাবছিল যে এই দুদিন আগেও সে একটা সুন্দর প্রজাপতির মতো মনের স্ফূর্তিতে উড়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু দুদিনের মধ্যেই তার ভেতরটায় যেন একটা মস্ত বড় ওলোট-পালট হয়ে গেছে। এখন আর তার উড়ে উড়ে বেড়ালে চলবে না। এখন সে বড় হযেছে, অনেক কিছু ভাবনা চিন্তার আছে। ও মার কাছ থেকে যা জানতে পেরেছে তা খুবই সাংঘাতিক। ওর নিজেকে নিজেই সামলাতে হবে। খুব সাবধানে একটি একটি করে পা ফেলতে হবে। সাবধান হয়ে চলতে গেলে আগের মতো অত হৈ হুল্লোড করলে চলবে না। একজন পুরুষ তার দেহের দিকে লোভীর মতো তাকিয়েছে তার মানে এখন সে পুরোপুরিই মেয়েমানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন আর ছেলে মানুষটির মতো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো চলবে বা। খুব সাবধানে ওকে থাকতে হবে।

সেদিন রাতে ও এত করে সাবধান হবার কথা ভাবল কিন্তু তার পরের রাতে কারুতাম্মা পারীকুট্টির গানের জন্য কান খাড়া করে রইল; সে রাতে কিন্তু সে কিছুই শুনতে পেল না। আগের রাতের মতো সে-রাতেও সমুদ্রের তীর, নারকেল গাছ, আশেপাশে জেলেদের ছোট ছোট ঘরগুলো চাঁদের আলোয় ভাসছিল। নারকেল পাতার মধ্য দিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় সমুদ্রের এক অজানা গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এমন রাতেই তো পারীকুট্টি বেশী করে গান গায় কিন্তু আজ কেন পারীকুট্টির গান শোনা যাচ্ছে না। পারীকুট্টির গান শোনার জন্যে কারুতাম্মা কান খাড়া করে রইল কিন্তু কই সমুদ্রের গান ছাড়া আর তো কিছুই শোনা যাচ্ছে না! পারীকুট্টি কি তাহলে আর গান গাইবে না? পারীকুট্টি কি জানে না

যে ওর গান শোনার জন্যে একটি মাত্র প্রাণী কত আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর চেম্পনকুঞ্জ যেন কোথায় বেরোল। চাকী তখনও অবধি জেগে ছিল। মাকে তখনও অবধি জেগে থাকতে দেখে কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'মা, ঘুমোবে না ?'

চাকী সে-কথার উত্তর না দিয়ে মেয়েকে শুয়ে পড়তে বলল। কারুতাম্মা মার কথামত বিছানায় গিয়ে শুল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ এক সময় কারুতাম্মার ঘুমটা ভেঙে গেল। কে যেন জিজ্ঞেস করছে, 'কারুতাম্মা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ?'

গলার সেই কাঁপা কাঁপা আওয়াজটা শুনেই কারুতাম্মা বুঝতে পারল যে গলাটা কার। পারীকুট্টি ওদের বাড়ি এসে মাকে জিজ্ঞেস করছে কারুতাম্মা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। ও শুনতে পেল মা বলছে, 'হ্যাঁ, কারুতাম্মা ঘুমোচ্ছে।'

পারীকুট্টির প্রশ্ন যে মার ভাল লাগেনি তা কারুতাম্মা বুঝতে পারল। মা কেমন যেন ব্যাজার ভাবে উত্তর দিল। পারীকুট্টিকে এমনি ভাবে ওদের বাড়ি এসে ওর কথা জিজ্ঞেস করতে শুনে কারুতাম্মা যেন ঘেমে নেয়ে উঠল। ও তাড়াতাড়ি উঠে জানলার ফুটো দিয়ে দেখতে লাগল। ওর বাবা আর পারীকুট্টি মিলে কি যেন একটা ভারী জিনিস টেনে এনে ঘরের ভেতর রাখছে। একটা দুটো নয়—গোটা ছয় সাত শুঁটকী মাছের ঝুড়ি।

কারুতাম্মার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। উঠোনে মা বাবা আর পারীকুট্টি ফিসফিস্ করে কথা বলছে।

পরের দিন কারুতাম্মা ঐ ঝুড়িগুলোর কথা মাকে জিজ্ঞেস করল। ওর মা ওর কথার সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বলল :

'ছোট মিয়া ঝুড়িগুলো এখানে এনে রেখেছে।'

কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'ছোট মিয়া ওর ঝাপে ঝুড়িগুলো রাখতে পারল না ?'

'ও যদি এখানে রাখে তাতে তোর কিরে ছুঁড়ী ?' চাকী রেগে গর গর করে বলল, 'এত সব কথায় তোর দরকার কি ? ওর জিনিস কোথায় রাখে না রাখে তাতে তোর এত মাথা ব্যথা কিসের ? যা গিয়ে নিজের চরকায় তেল দে।'

অনেক কিছুই কারুতাম্মার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল। পারীকুট্টি ওর কেউ নয় কিন্তু এতো একেবারে খোলাখুলি চুরি। এমনি ভাবে যদি ওরা

পারীকুট্টির কাছ থেকে জিনিস নেয় তাহলে তো ওরা পারীকুট্টির হাতের মুঠোয় চলে যাবে। বাবা তো ওকে ওর দিকে নজর রাখতে বলেছে কিন্তু এমনিভাবে যদি ওরা পারীকুট্টির হাতের মুঠোয় চলে যায় তাহলে যে কি হবে তা কি ওরা বুঝতে পারছে না? কিন্তু মাকে এতকথা বলতে ওর মন চাইল না। ও তাই চুপচাপ মার বকুনি হজম করল।

পরের দিন সেই শুঁটকীমাছ সব বিক্রী করা হল। সেদিন সমুদ্রে মাছও উঠেছিল প্রচুর। এক খেপ মাছ ধরে চেম্পনকুঞ্জর নৌকো আবার বেরুল। চাকী মাছ বিক্রী করতে চলল, পঞ্চমীও যেন কোথায় গিয়েছিল। বাড়িতে কারুতাম্মা একা ছিল। এমন সময় পারীকুট্টি ওদের বাড়িতে এল।

পারীকুট্টিকে দেখে কারুতাম্মা ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওকে অমনি-ভাবে ঘরের মধ্যে ছুটে চলে যেতে দেখে পারীকুট্টি একটু অবাক হয়ে উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ও বলল:

'নৌকো আর জাল কিনতে···পয়সা দিয়েছি।'

কোনও উত্তর নেই। পারীকুট্টি আবার বলল:

'এবার আমাদের কাছে মাছ বিক্রী করবে তো? ভাল দাম।'

'ভাল দাম দিলে মাছ বিক্রী করব'—এমনি একটা জবাব ও কারুতাম্মার কাছে আশা করেছিল। কেন না ঠিক এই উত্তরই কারুতাম্মা সেদিন দিয়েছিল। কিন্তু আজ কোনও উত্তর নেই।

পারীকুট্টির মনে পড়ল সেদিন যখন নৌকোর আড়ালে তারা কথা বলাবলি করছিল তখন তাদের হাসি এই নিয়েই শুরু হয়েছিল। সে-হাসির ফোয়ারা সেদিন বন্ধ করতে অনেক সময় লেগেছিল। পারীকুট্টি ভেবেছিল আজও এই কথা তুলে তারা প্রাণভরে হাসবে কিন্তু আজ আর তা হল না। আজ কারুতাম্মা নিঃশ্চুপ।

পারীকুট্টি কারুতাম্মার কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কারুতাম্মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না যে! তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?'

হঠাৎ ওর মনে হল কারুতাম্মা যেন ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। পারীকুট্টি ওর সেই অস্ফুট কান্না শুনতে পেয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। ব্যাকুল ভাবে ও জিজ্ঞেস করল, 'কারুতাম্মা, তুমি কাঁদছ?'

কোনও উত্তর নেই। পারীকুট্টি বলল, 'কারুতাম্মা, আমি এলে তোমার যদি ভাল না লাগে তাহলে আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

একথারও কোনও উত্তর না পেয়ে পারীকুট্টি মনে বেশ আঘাত পেল। ও ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমি তাহলে যাই কারুতাম্মা ?'

পারীকুট্টির এই প্রশ্ন যেন কারুতাম্মার বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধল। পারী-কুট্টি যে ওর ব্যবহারে আঘাত পেয়েছে ও তা বুঝতে পারল। ও হঠাৎ বলে উঠল :

'ছোট মিয়া, তুমি যে মুসলমান!'

পারীকুট্টি এর মানে বুঝতে পারল না। ও একটু অবাক হয়েই বলল : 'তাতে কি হয়েছে ?'

এ-প্রশ্নেরও কোন জবাব নেই। পারীকুট্টি মুসলমান তো কি হয়েছে? কারুতাম্মা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল। তারপর হঠাৎ একটা কথা ওর জিভের গোড়ায় এসে পড়ল :

'তোমার কাছে যে-সব মেয়েমজুরেরা কাজ করতে আসে তাদের দিকে তুমি হাঁ করে দেখ—বল ঠিক কি-না ?'

কথাটা শুনে পারীকুট্টির খুব খারাপ লাগল। কারুতাম্মা ওকে এতখানি খারাপ ভাবে! কারুতাম্মা কি করে ভাবল যে ও মেয়েমজুরদের দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ওদের সঙ্গে ও হয়তো ঠাট্টা ইয়ারকি মারে এই ভেবে হয়তো কারুতাম্মা তার ওপর অভিমান করে বসে আছে।

কিন্তু কি বলে ও কারুতাম্মাকে সত্যি কথাটা বোঝাবে? ওই সব মেয়ে-মজুরদের দিকে কোনও দিন ও হ্যাংলার মতো তাকায়নি। তাদের সঙ্গে হাসাহাসি করবার চেষ্টাও করেনি। ও বলল :

'আল্লার নামে বলছি আমি ওদের দিকে কোনদিনই কুনজরে দেখিনি।'

পারীকুট্টি যে ভাল লোক এটা জানতেপেরে কারুতাম্মার ভালই লাগল কিন্তু পারীকুট্টিকে কারুতাম্মা কি করে বোঝাবে যে শুধু মাত্র মেয়েদের দিকে তাকানর কথাই ও বলতে চায় না। বলতে চায় যে-কথা ও কি করে সে-কথা ওকে বোঝাবে তা ভেবে পেলনা। সে-সব কথা বলতে গেলে ওকে এখন সমুদ্রতীরের সেই হাজার হাজার বছরের সংস্কারের কথা বলতে হয়। ওর মা ওকে কেমন ভাবে থাকতে বলেছে তাও বলতে হয়। বলতে হয়, কেমন ভাবে ওর এই কাঁচা বয়েসের জন্যে বদলোকে ওর দিকে কুনজরে চাইবে, ওকে খারাপ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এত কথা বলার ক্ষমতা ওর নেই, সাহসও নেই। তাই কিছু না বলে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কেউ কাউকেই কিছু বলে না। হঠাৎ

কারুতাম্মার খেয়াল হল সময় চলে যাচ্ছে এখনও যদি কিছু না বলে তাহলে মিছিমিছি আরও সময় নষ্ট হবে। ওই তাই বলে উঠল :

'মা এক্ষুনি বাড়ি আসবে।'

'তাতে কি হয়েছে ?'

কারুতাম্মা খুব ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'না না, এমনভাবে আমাদের দেখা-শোনা কথাবার্তা বলা খারাপ···খুবই খারাপ।'

'কিন্তু তুমি তো ঘরের ভেতরে, আমি তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।'

কেন যে খারাপ তা পারীকুট্টিকে বুঝিয়ে বলতে হবে, কিন্তু কেমন করে ? বলতে গেলে তো এখন হাজারটা কথা বলতে হয়।

পারীকুট্টি তখন জিজ্ঞেস করল, 'কারুতাম্মা, আমাকে কি তোমার ভাল লাগে না ?'

ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ লাগে।'

পারীকুট্টি বিহ্বল হয়ে বলল, 'তবে তুমি কেন বাইরে বেরোচ্ছ না ?'

'বাইরে আসার দরকার নেই বলে।'

'আমি আর তোমাকে হাসাব না কারুতাম্মা, আমি একবার শুধু তোমাকে দেখেই চলে যাব।'

কারুতাম্মা ওর কথা শুনে অসহায় ভাবে বলে উঠল, 'না না, আমাকে দেখতে চেয়োনা।'

এ-কথার পর পারীকুট্টি একটুখানি অপেক্ষা করে বলল, 'তাহলে আমি যাচ্ছি।'

তার উত্তরে ঘরের ভেতর থেকে জবাব এল, 'চিরদিনই আমার তোমাকে ভাল লাগবে।' এর বেশি আর কি কথা সে দেবে। এর বেশি আর সে কি শপথ করবে ?

পারীকুট্টি চলে যেতেই কারুতাম্মার খেয়াল হল, এই যাঃ, যা বলতে চেয়েছিল তার তো কিছুই বলা হল না, আর যা বলা উচিত ছিল না তাই বলে ফেলল।

সেদিন রাতে লম্পর আলোয় বসে চেম্পনকুঞ্জ আর চাকী পয়সা গুণে গুণে রাখছিল। এখনও সব টাকা জোগাড় হয়নি তবু চেম্পনকুঞ্জের যেন কিছুটা স্বস্তি যে তাকে সুদখোরদের কাছে টাকা ধার করতে হয়নি। টাকা গুণতে গুণতে ও চাকীকে বলল, 'সুদখোরদের পাল্লায় না পড়ে এতগুলো পয়সা করা কিছু চাট্টিখানি কথা নয়, কি বলিস চাকী !'

চাকী বলল, 'তাতো ঠিকই।'

কথাটা সত্যি। ট্যাঁকে টাকা গুঁজে জেলেদের ঠকানোর জন্যে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কাছ থেকে যত ধার না-করা যায় ততই ভাল।

চেম্পনকুঞ্জ আবার বলল, 'ওদের কাছ থেকে টাকা ধার নিলে আর নৌকোও কিনতে হত না জালও কিনতে হত না। আর তার জন্যে টাকাও জমাতে হত না।'

দুদিন আগেও সুদখোর আউসেপ আর গোবিন্দ চেম্পনকুঞ্জের কাছে টাকা ধার চাই কিনা জিজ্ঞেস করেছিল। চেম্পনকুঞ্জ 'না' বলে দিয়েছিল। ওদের কাছ থেকে ধার নিলে সে-ধার আর শোধ হত না, তার ফলে নৌকো আর জাল ওদের হাতে চলে যেত। জেলেদের মধ্যে এতো হামেশাই ঘটছে।

কিন্তু জাল আর নৌকো কেনার সব টাকাটা এখনও জোগাড় হয়নি। কি উপায় করা যায়? চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'ছোট মিয়ার কাছেই কিছু ধার চাওয়া যাক্—কি বল?'

পারীকুট্টির কাছে আবার ধার নেওয়ার কথা শুনে কারুতাম্মার এই প্রথম মা-বাবার ওপর ঘৃণা জাগল। মার ওপরেও ওর ঘেন্না হল, কেন না মা বাবার কথার সায় দিল।

পরের কদিন পারীকুট্টির মাছের ঝাঁপে মাছ শুকোনো, মাছ প্যাক করা সব খুব তাড়াতাড়ি হতে লাগল। কেন যে এ-সমস্ত এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে তা বুঝতে কারুতাম্মার দেরী লাগল না। এই কদিনেই কারুতাম্মার বয়স বেড়ে গেছে। আজকাল ও সব বুঝতে শুরু করেছে।

নৌকো আর জাল কিনলে তাদের দুঃখদুর্দশা ঘুচে তাদের সুদিন আসবে সেই আনন্দে চাকী কারুতাম্মাকে বলল, 'খুকি, আমাদের জাল আর নৌকো কেনার দেরী নেই রে।'

কারুতাম্মা কোনও উত্তর দিল না। মার এই স্ফূর্তিতে ওর মনে একটুও সাড়া জাগল না।

চাকী নিজের মনে বলতে লাগল, 'এতদিনে সাগর-মা মুখ তুলে চাইলেন।'

মার কথা শুনে কারুতাম্মার ভয়ানক রাগ হল। ও বলে উঠল, 'মানুষকে এমনভাবে ঠকালে সাগর-মা রাগ করবেন না?'

চাকী মেয়ের মুখে দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাল। কারুতাম্মার তখনও বলা শেষ হয়নি। মাকে আজ সে খোলাখুলি কিছু জিজ্ঞেস করবে।

'আচ্ছা মা, ঐ সাদাসিদে লোকটাকে ঠকিয়ে নৌকো আর জাল কেনা কি উচিত? এটা কি ঠিক কাজ করছ তোমরা?'

'কি ? কি বললি ? আমরা পারীকুট্টিকে ঠকিয়েছি ?'

কারুত্তাম্মা জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠকিয়েইছ তো।'

'কে ? কে ঠকিয়েছে ?'

কারুত্তাম্মা চুপ করে রইল। ওর এই চুপচাপ থাকার মধ্যেই ওর উত্তর লুকিয়েছিল।

চাকী বলল, 'আউসেপের কাছ থেকে টাকা ধার করলে নৌকো আর জাল ওর হয়ে যেত। সেটা বোঝবার বয়স তোর হয়েছে নিশ্চয়ই!'

'তাই কি ? না, আউসেপের কাছে টাকা ধার নিলে টাকা সুদসুদ্ধ্ ফেরত দিতে হত ?'

'আর একে ফেরত দিতে হবে না ?'

'একে ?...একে টাকা ফেরত দেবে মনে করেই কি টাকা ধার করেছ ?'

প্রশ্নটা যেন চাকীর মুখে ছুঁড়ে মারা হল। চাকী এক মিনিট চুপ করে নরম ভাবে বলল :

'পারীকুট্টির কাছে শুঁটকী মাছ নেওয়াতে দোষের কিছু নেই। তোর বাবা একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিল। মিথ্যে কথাও বলেনি, ঠকাতেও চেষ্টা করেনি। ওর টাকা আমরা ফেরত দেবই, যেমন করেই হোক্ ফেরত দেব।'

'তাই যদি ফেরত দেবে তাহলে রাতদুপুরে লুকিয়ে ঝুড়ি এনে দিয়ে যাওয়ার কি মানে হয় ? দিনের বেলায় কি সময় ছিল না ?'

তারপর হঠাৎ বলে ফেলল, 'এই জন্যেই সাগর শুকিয়ে যায়।'

মেয়ের কথা শুনে চাকীর সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। মা-বাপ খারাপ কাজ করেছে তাই সুমুদ্দ্‌র শুকিয়ে যাবে—কি আস্পর্ধার কথা মেয়ের! ও চীৎকার করে বলল, 'হারামজাদী তুই বলছিস কি ? তোর বাবা চুরি করেছে! সে চোর!'

কারুত্তাম্মা চুপ করে রইল। চাকী মা-গিরি ফলাতে জিজ্ঞেস করল, 'বলি ঐ মোছলমান ছোঁড়াটা তোর কে ? তার জন্যে যে তোর দরদ উথলে উঠছে দেখি।'

'আমার কেউ না'—কথাটা কারুত্তাম্মার জিভের গোড়ায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু কথাগুলো ও মুখ দিয়ে বের করতে পারল না। পারীকুট্টি তার কেউ নয় একথা কি সে জোর করে বলতে পারে ? পারীকুট্টি কি সত্যিই তার কেউ নয় ? কারুত্তাম্মার মনে হল যেন পারীকুট্টি তার সবকিছু।

চাকী আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই পুরোনো কথা বলল, 'এই মেয়েটা দেখছি আমাদের সুমুদ্দ্‌র শুকিয়ে মারবে, জেলেদের মুখের ভাত কেড়ে নেবে।'

কারুতাম্মা আর সহ্য করতে পারল না; ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি এমন কিছু খারাপ কাজ করিনি যাতে সমুদ্দুর শুকিয়ে যাবে।'

'তা'হলে তোর ঐ ছেলেটার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন?'

'মাথাব্যথা এই জন্যে যে আর কিছুদিন পরেই একটা ভাল মানুষকে তার ব্যবসা গুটোতে হবে।'

'মুখ সামলে কথা বলবি', বলে চাকী মেয়েকে খেঁকিয়ে উঠল। তারপর একপ্রস্থ বকুনি শুরু হল। কারুতাম্মা আর কিছু না বলে চুপচাপ মার বকুনী শুনে গেল। মার বকুনীতে ওর একটুও দুঃখ হল না। মা বকবক করছে, করুক। কিছুক্ষণ পরে মার বকবকানি থামলে পর ও মার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'আচ্ছা মা, শুধু বাবাকে বিশ্বাস করেই কি ও-লোকটা টাকা দিয়েছে?'

'নয়তো কি?' বলেই হঠাৎ চাকীর মনে হল পারীকুট্টির কাছে মেয়ের টাকা চাওয়ার কথা। সেই কথাটার খেয়াল রেখেই বুঝি মেয়ে এমনভাবে বলছে! চাকী মেয়েকে জিজ্ঞেস করল:

'তা'হলে তুই চেয়েছিলি বলেই কি ও টাকা দিয়েছে?'

হ্যাঁ, শুধু ওর জন্যেই, একমাত্র ওর জন্যেই পারীকুট্টি টাকা দিয়েছে—কিন্তু মুখ ফুটে একথা কারুতাম্মা বলতে পারল না। ও শুধু বলল:

'আমাকে এসব কথা আর কিছু জিজ্ঞেস কর না মা। আমার মুখ দিয়ে কিছু বার করারও চেষ্টা কর না।'

'আহা কি বার করানর চেষ্টা করব না শুনি?' তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে মেয়েকে বলল, 'আমরা কি টাকা সেধে চাইতে গিয়েছিলাম, না ওর দরজায় হত্যে দিয়ে পড়েছিলাম? তুই আমার পেটে হয়ে আমাদের মুখের ওপর এত বড় কথা বলিস?'

কারুতাম্মা এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল:

'মা, কেন ওর কাছ থেকে টাকা নিলে—কেন? কেন? আমাকে কি তুমি কোনটা ভাল কোনটা খারাপ শেখাও নি? সব জেনেশুনে আবার ওর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ওর কাছে বাঁধা পড়ে...' আর বেশি কিছু ও বলতে পারল না। কান্নায় ওর গলা বুজে এল। মেয়ের কথা শুনে এতক্ষণে চাকীর খেয়াল হল। মেয়ে যা বলল তাতো ঠিকই। এইবার চাকীর খারাপ লাগতে লাগল। মনে হল সত্যিই যেন ওরা একটা ভুল করে ফেলেছে। খুব একটা প্যাঁচাল পথে যেন তারা পা দিয়েছে।

মেয়ে তখনও কাঁদছে দেখে চাকী জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তোর হল কি? কাঁদছিস কেন?'

কারুতাম্মা তখনও কাঁদছে।

'ছোট মিয়া এখানে এসেছিল নাকি?'

কারুতাম্মা মিথ্যে বলল, 'না।'

'তাহলে কাঁদছিস কেন খুকি?'

'যদি ও···ও আসে তা'হলে···তা'হলে আমি কি করব মা?'

চাকীর যে এতে কিছু দোষ নেই তা মেয়েকে দেখানর জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে উঠল। অত বেশি ভাবেনি ওরা। পারীকুট্টির কাছে টাকা চাইতেই ও দিতে রাজী হয়ে গেল। পয়সা ফেরত দেবে মনে করেই চেয়েছিল। তবে কারুতাম্মা এইমাত্র যে কথা বলল তাও তো ভাববার মতো। হয়তো মেয়ে চেয়েছে বলেই অত সহজে পারীকুট্টি টাকাটা দিয়েছে। এখন পারীকুট্টি তো ওর মেয়ের কাছে কিছু আশাও করতে পারে। তবে একটা জিনিস ঠিক যে পারীকুট্টি ছেলে ভাল কিন্তু তবু কিছুই বলা যায় না। বয়স কাঁচা। এ-বয়সে রক্তের তেজ একটু বেশিই। কখন কি যে হয় কিছুই বলা যায় না।

চাকীর মনটা খুব অস্বস্তিতে ভরে গেল। টাকাটা না নিলেই ভাল হতো। খুব ভুল হয়ে গেছে।

মা-মেয়ের এই সব কথাবার্তা কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ কিছুই জানতে পারল না।

সেইদিন চাকী কারুতাম্মার বিয়ের কথা নিয়ে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি করল। বলল:

'ভেলায়ুধনের কাছে গিয়ে কথা পাড়। আগে মেয়েটাকে পার করতে হবে তারপর অন্য কাজ। নৌকো আর জাল পরে হবে।'

চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু বউএর কথায় কান দিল না। নৌকো আর জাল ও কিনবেই।

সব কথা কি করে মিনসকে খুলে বলা যায়? চাকী দোটানার মধ্যে পড়ে রাগের চোটে বলল, 'এতদিন তোমার জাল আর নৌকোর জন্যে আমি মাছ বিক্রী করতে গেছি। আর আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'কেন হবে না?' এই ভাবে চেম্পনকুঞ্জ বউএর দিকে তাকাল তারপর বলল, 'দূর্ মাগী কি সব আজেবাজে বকছিস!'

চাকী জেদ ধরে বলল, 'ঠিক কথাই বলছি।'

'কি ঠিক কথা?'

'আমাকে আমার মেয়ের কথা ভাবতে হবে।'

'অর্থাৎ ?'

'মেয়ের বয়স হয়েছে। ওকে আমি বাড়িতে একা রেখে কোথাও যাব না।'

চাকী ওর মন ঠিক করে ফেলেছে।

'আর তা না হলে ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর।'

এতক্ষণে যেন সমস্ত ব্যাপারটা চেম্পনকুঞ্জের বোধগম্য হল। ও আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। কিন্তু চাকী যদি মাছ ফিরি করতে না যায় তাহলে তো তাদের খুবই লোকসান হবে। ও জিজ্ঞেস করল :

'ব্যাপারটা কি শুনি ? কোনও গোলমাল বাঁধেনি ত ?'

'এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি কিন্তু হতে কতক্ষণ ?'

অর্থাৎ তার জন্য তাদের সাবধান হতে হবে। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের মেয়েকে বিশ্বাস খুব। কারুতাম্মা খুব সাবধানী মেয়ে। ওকে একা একা বাড়িতে রেখে গেলেও ওর খারাপ হবার ভয় নেই।

চাকী জিজ্ঞেস করল, 'খারাপ হতে কতক্ষণ লাগে শুনি ?'

চেম্পনকুঞ্জ চুপ করে রইল।

ব্যাপারটার কিন্তু এখানেই শেষ হল না। সত্যিই চাকী পরের দিন শুঁটকী মাছ বিক্রী করতে বেরোল না। চেম্পনকুঞ্জও এই নিয়ে বেশি পীড়াপীড়ি করল না।

সেদিন রাতেও পারীকুট্টির কাছ থেকে শুঁটকী মাছের ঝুড়ি বাড়িতে আনার কথা ছিল কিন্তু চাকী তাতে বাধা দিল। ও বলল, 'আমাদের এ-সবে দরকার নেই।'

চেম্পনকুঞ্জ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দরকার নেই কেন ?'

'কেন আবার কি ? ঐ ছেলেটাকে ঠকিয়ে লাভ কি ?'

'ঠকাচ্ছি কে বলল ?'

'ঠকাচ্ছ না তো কি ? এ-টাকা কি তুমি ফেরত দেবে ?'

'আলবৎ দেব।'

আবার পারীকুট্টির কাছ থেকে মাছের ঝুড়ি আনার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে কারুতাম্মার খুবই ইচ্ছে হল যে ছুটে গিয়ে পারীকুট্টিকে জানিয়ে দেয় যে তার টাকা আর সে ফেরত পাবে না। কারুতাম্মার মা-বাপ তাকে ঠকাচ্ছে। গোপনে পারীকুট্টির সঙ্গে দেখা করে এ-কথার জন্যে অনেক সুযোগ খুঁজল কারুতাম্মা, কিন্তু তা সম্ভব হল না।

সেদিন রাতেও পারীকুট্টি কতকগুলো শুঁটকী মাছের ঝুড়ি চেম্পনকুঞ্জর

বাড়ি নিয়ে এল। চেম্পনকুঞ্জ কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে ঝুড়িগুলো রেখে দিল। কবে যে টাকা ফেরত দেবে তা কিছু বলল না। ওর বাবা এতখানি ছোট হয়ে গেছে দেখে বাবার ওপর কারুতাম্মার শ্রদ্ধাভক্তি সব উবে গেল।

এরপর বাবার মুখের ওপর সোজাসুজি কিছু বলার সাহস কারুতাম্মার জোগাল। মাকে এই নিয়ে ও অনেক কথা বলেছে এবার বাবাকেও বলতে হবে। পারীকুট্টির ওপর এতখানি অন্যায় ও যেন সহ্য করতে পারছিল না।

বাড়িতে এক কণা চাল নেই তাই বউ নাল্লপেন্ন ওর সোয়ামীকে কড়া কথা বলতে ছাড়ল না। কিন্তু আচ্চকুঞ্জ স্বামীগিরি ফলিয়ে বলল, 'এই মাগী, মুখ সামলা, খুব যে, মুখে যা আসছে তাই বলছিস। তোর মেজাজের আমি ধার ধারি না।'

'হ্যাঁ আমি তো যা-তা বলছিই। বন্ধু নৌকো আর জাল কিনে ফেলল আর এর অবস্থা দেখ—চাল কিনতে পয়সা জুটছে না—বললে আবার বলে মেজাজ দেখাসনি। ওঃ ভারি আমার কাজের লোকরে।'

আচ্চকুঞ্জ আর সইতে পারল না। ঠাস ঠাস করে নাল্লপেন্নকে গোটা দুই চড় লাগাল। কি কুগ্রহের ফের দেখ! চেম্পনকুঞ্জ নৌকো আর জাল কিনল তাতে জেলেরা সব ওকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা লাগিয়েছে। বাইরে এই অবস্থা আর ঘরেতেও শান্তি নেই। কেউ যদি নৌকো আর জাল কেনে তার জন্যে আমাকে কি প্রাচিত্তির করতে হবে? কি জ্বালারে বাবা। চেম্পনকুঞ্জ আধ-পেটা খেয়ে উপোস করে টাকা জমিয়েছে। ওরকম করে শুধু আচ্চকুঞ্জ কেন—জেলেদের আর কারুরই সাধ্যি নেই টাকা জমায়।

আচ্চকুঞ্জের আর নাল্লপেন্নর ঝগড়া চাকী আর কারুতাম্মা শুনতে পেল, চাকী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্চকুঞ্জদাদা, আমরা উপোস করে থাকলেও তোমাদের বাড়িতে কি কিছু চাইতে গিয়েছি?'

আচ্চকুঞ্জ চাকীর দিকে ফিরে বলল, 'না না, তোমরা আমাদের বাড়ি আসবে কেন? আমি কি আর চেম্পনকুঞ্জকে জানি না। ভুলে যাচ্ছিস কেন আমি ওকে খুব ছোটবেলা থেকেই জানি।'

চাকীও ছাড়ল না, 'ওহো তাই বুঝি! তুমি যে দেখছি সবজান্তা মহেশ্বর। বাড়িতে আজ উনুন জ্বলেনি কেন শুনি! তোমার আর তোমার জেলেনীর মনের পাপের জন্য তোমাদের আজ এই অবস্থা।'

নাল্লপেন্নকে এর মধ্যে টেনে আনাতে ওরও গায়ে লাগল। ও চাকীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'বলি জেলেনীর কথাটা এর মধ্যে এল কেন? আমি কি করেছি শুনি?'

চাকী উত্তর দেওয়ার আগেই আচ্চকুঞ্জ চাকীকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি পাপ করেছি শুনি?'

'পাপ ছাড়া আবার কি! হিংসেয় তোমাদের গা জ্বলছে।'

'হিংসে? কার উপর, তোর জেলের ওপর!' আচ্চকুঞ্জ হ্যাক থু করে থুথু ফেলে বললে, 'ওই নোংরা লোকটার ওপর আমার মতো লোক হিংসে করবে।'

চাকীর রাগ আরও বেড়ে গেল, বলল, 'আর একটাও খারাপ কথা বলেছ কি দেখবে!'

'কি করবি তুই?'

'কি করব দেখাব।'

'আরে যা যা, দু পয়সা হয়েছে বলে কি এত দেখাচ্ছিস তুই?'

ঝগড়া আরও বাড়ছে দেখে কারুতাম্মা খুব ভয় পেয়ে গেল। ও ছুটে এসে ওর মার মুখ চেপে ধরল। আচ্চকুঞ্জ তখনও থামেনি, চাকী ঝগড়া করার জন্য ছটফট করছিল কিন্তু কারুতাম্মা মাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

রাগটা পড়ে গেলে আচ্চকুঞ্জ বসে বসে ভাবতে লাগল। বাড়িতে রান্না না হলেও তার অতটা খারাপ লাগেনি। কিন্তু এইভাবে ঝগড়া করে মনটা তার খুব খারাপ হয়ে গেল। ওর বউএর সঙ্গে চাকীর ঝগড়াঝাটি হয়েছে বটে কিন্তু ও কোনও দিনও চেম্পনকুঞ্জ বা চাকীর সাথে ঝগড়া করেনি। আজকে তাও হল। মনের দুঃখে বেচারী রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারল না ভাল করে।

পরের দিন ভোরে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে ও নৌকোর মালিকের কাছে দুটো টাকা নিয়ে বউকে দিল। দুপুরে মাছের ভাগ সবটা এনে বউএর হাতে দিল। ভবিষ্যতে খুব ভেবে-চিন্তে খরচ করার কথা বউকে বলে বলল:

'দেখ্, এবার থেকে সব টাকা এনে আমি তোর হাতে দেব। এর থেকে লুকিয়ে রাখবি। দুচারটা পয়সা আমাদেরও জমাতে হবে।'

নাল্লপেন্ন তার জেলের এই মতিগতিতে খুব বেশি হয়ে আহ্লাদে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠিকই তো। নৌকো আর জাল না কিনতে পারলেও অন্ততঃ উপোস করে মরতে হবে না।'

'নৌকো আর জাল যে হবে না তাই বা কে বলল। নিশ্চয় করে কি কিছু বলা যায়। কিনতেও তো পারি!'

ঠিকই তো। নিশ্চয় করে কি কিছু বলা যায়? দেখাই যাক্ না চেষ্টা করে—নাল্লপেন্নও মনে মনে ভাবল। তারপর বলল, 'দেখলে তো সব বন্ধুলোক। কাল পর্যন্ত বন্ধু ছিল। আজ দেখ তারা তোমার সঙ্গে দুটো ভাল কথা বলতেও আসে না।'

কথাটা আচ্চকুঞ্জের ভাল লাগল না। ও বলল, 'পরনিন্দে পরচর্চা করে লাভ কি বল্। আমরা আমাদের চরকায় তেল দিই।'

'না, না—এই কথার কথা বলছি। দেখলে না চাকীর কি দেমাক! তোমাকেও তো কিরকম ডাঁট দেখিয়ে গেল।'

আচ্চকুঞ্জ বউকে উপদেশ দিল, 'তুই বেশি কথা না বলে চুপচাপ থাক না বাপু।'

'আমার কথা বলার কি দরকার!'

'তাই-ই ভাল। আমরা চুপচাপ থাকি। দেখি একবার চেষ্টা করে জাল আর নৌকো হয় কিনা।'

'এই রকম যদি দুদিন আগেও ভাবতে—'

আচ্চকুঞ্জ 'হুঁ' বলে বউএর কথায় সায় দিল। নাল্লপেন্ন ঠিকই বলেছে। তবু যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনভাবে বলল, 'আরে, জেলেদের কি কিছু জমাবার দরকার আছে রে? ওদের সম্পত্তি ওই দেখ সামনে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আগেকার দিনে লোকে বলত নৌকো আর জাল গ্রামের লোকের দরকারে…কিন্তু সে-সব দিন গেছে। তবু মনে করলে কোন জেলেনী নৌকো আর জাল কিনতে পারে।'

'সবই তো বুঝলুম কিন্তু তোমার বন্ধু যে নৌকো আর জাল কিনে ফেলল।'

আচ্চকুঞ্জ বলল, 'চেম্পনকুঞ্জ সত্যিই চালাক লোক। জাল আর নৌকো কেনার জন্যে লোকটা কি কম কষ্ট করেছে।' তারপর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বলল, 'চেষ্টা করে একবার দেখাই যাক্ আমিও কিছু করতে পারি কি না।'

বিকেলের দিকে ছেঁড়া জাল সেলাই করতে জেলেরা সব সমুদ্রতীরে আসে। সেদিন আবার ছেঁড়া জাল গলিয়ে অনেকগুলো মাছ পালিয়ে গিয়েছিল। আচ্চকুঞ্জ সাগরতীরে পৌঁছুবার আগে অন্য সব জেলেরা আগেই জড়ো হয়ে ছেঁড়া জাল সেলাই করতে আরম্ভ করেছিল। জাল সেলাই করতে করতে সকলে চেম্পনকুঞ্জকে নিয়ে গল্প করছিল। আচ্চকুঞ্জ তা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ভাই, তোদের কি কাজ কর্ম নেই। কেন বাবা খালি পরনিন্দে। তবে হ্যাঁ, যতই পরনিন্দে করবি ততই ওর পাপ কমে যাবে।'

আয়ানকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'তাতে তোমার এত গা জ্বালার কি আছে দাদা?'

আচ্চকুঞ্জ বেশ শান্ত স্বরেই বলল, 'না, আমার কেন গায়ে লাগবে। কিন্তু কথাটা কি আমি খুব অন্যায় বলেছি—পরনিন্দে-পরচর্চা করে লাভটা কি বল?'

রামন মুপ্পন তর্ক তুলল, 'চেম্পনকুঞ্জের কথা বললে দোষটা কি হয় শুনি? তুমি এমনভাব করছ যেন ওর সম্পর্কে কিছু বলার আমাদের অধিকার নেই।'

'কি অধিকার আছে শুনি?'

রামন মুপ্পন আচ্চকুঞ্জের এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। ও বলল, 'বাঃ বাঃ, বেশ বললে ভাই! তবে কথাগুলো একটা ছোট ছেলে বললে মানাত।

তুমি তো এখন আর কচি খোকাটি নও। দু'তিন কুড়ি বয়স হল, এই কথা বলা কি তোমার সাজে ?'

রামন মুপ্পন যে ঠিক কি বলতে চায় আচ্চকুঞ্জ বুঝতে পারল না। পরনিন্দে পরচর্চা করে লাভ নেই এইটুকু মাত্র সে বলেছে তাতে ওর বয়স হয়েছে ওর একথা বলা চলে না কথাটা বলবার মানে কি ? কথাটা ঠিক ভালো শোনাচ্ছে না তো। আচ্চকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'কি হে মুপ্পন, তুমি অমনভাবে কথাটা বললে কেন হে ?'

রামন মুপ্পন জাল সেলাই করার সুতোটা নীচেয় রেখে আচ্চকুঞ্জের মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আচ্চকুঞ্জ, আমাদের জেলেদের মধ্যে কি কতকগুলো ভালমন্দ, আচার-বিচার মানতে হয় না ?'

'হ্যাঁ তা হয় বৈ কি !'

'তাই যদি হয় তাহলে চেম্পনকুঞ্জ কি এইগুলো মেনে চলছে ?' তবুও এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য আচ্চকুঞ্জ বুঝতে পারল না। রামন মুপ্পন তখন একেবারে খোলা-খুলিই বলল, 'শুধু আগেকার দিনে নয় আজকালকার দিনেও সোমত্ত মেয়েকে এমনি করে তার রূপযৌবন দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছ ?'

আয়ানকুঞ্জ তাল দিয়ে বলল, 'আগে গাঁয়ের মোড়লের কথা সকলকে শুনতে হত।'

রামন মুপ্পন জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে অমন ধিঙ্গী মেয়ে থাকতে তার বিয়ে না দিয়ে নৌকো আর জাল কিনতে কোন্ জেলে যায় বল ?'

'আগেকার দিন হলে এমনটি চলত না। গাঁয়ের মোড়ল এসব অনাচার হতে দিত না। সমাজের নিয়ম-কানুন কেউ ভাঙতে পারত না। সমাজের আচার-বিচার সকলকে মেনে চলতে হত। এই সব নিয়ম-কানুন জেলেরা খুব ভালভাবেই মানত কেন না এসব জেলেদেরই মঙ্গলের জন্য।'

রামন মুপ্পনের কথার খেই ধরে আয়ানকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'কত বছরে বিয়ে দিতে হয় মেয়ের ?'

রামন মুপ্পন সেকালের লোক, বললে, 'তা দশ বছরে তো বটেই।'

ভেলায়ুধন জিজ্ঞেস করল, 'আর দশ বছরের বেশি হ'লে ?'

ঠিক প্রশ্নের উত্তর জানতে ও এই প্রশ্নটা করল না। নিয়ম যারা মেনে চলে না তাদের ঠেকা দিয়ে ও এই প্রশ্নটা করল।

রামন মুপ্পন ওর প্রশ্নের জবাব দিল, 'দশ বছরের বেশি ধিঙ্গী হয়ে থাকলে ? থাকবে কি করে ? থাকতে দিত না।'

ভেলায়ুধন যেন আরও কিছু স্পষ্টভাবে জানতে চায়—ও আবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে মোড়ল কি করত ?'

'একঘরে করত। জেলে-সমাজে আর ওদের থাকতে হত না।'

পুণ্যন নামে একটা অল্পবয়সী জেলে বলল, 'এতো সব আগেকার কথা। পুরোনো নিয়ম।'

আয়ানকুঞ্জ রেগে গিয়ে বলল, 'আগেকার নিয়ম মানে? আজও সে-সব নিয়ম চলে আসছে। তোমরা দেখতে চাইলে এখনই দেখিয়ে দিতে পারি। এই চেম্পনকুঞ্জকেই আমি ঘোল খাইয়ে ছাড়তে পারি।'

রামন মুপ্পন আয়ানকুঞ্জের কথায় সায় দিল। তারপর আর একটা কথা তুলল, 'আয়ানকুঞ্জ, সকলের কি আর নৌকো আর জাল কেনার সৌভাগ্য হয়?'

'তাতো হয়ই না।'

রামন মুপ্পন তখন কেন হয় না তার কাহিনী বলতে লাগল,—'দেখ, আমরা সাগর-মার ছেলে, আমাদের সম্পত্তির হিসেব নেই। সাগর-মার হাত উপচে পড়ছে এই সম্পত্তি আর তার মালিক হচ্ছি আমরা, আমরা তো সকলেই তাহলে নৌকো আর জাল কিনতে পারি। কিন্তু সকলেই যদি জাল আর নৌকো কিনে মালিক হয়ে বসি তাহলে মাছ ধরতে যাবে কারা? দিনমজুরি করবে কারা?' তারপর একটু থেমে বলল, 'আমরা যদি নৌকো আর জাল কিনতে চাই তা কি আর পারি না?'

'তাতো ঠিকই কিন্তু,' আয়ানকুঞ্জ বেশ একটা জটিল প্রশ্ন করল, 'যদি তাই হয় তাহলে আমাদের সকলের জাল আর নৌকো নেই কেন?'

'তারও কারণ আছে। জেলেদের মধ্যে পাঁচটা জাত আছে। আরায়ান, ওয়ালাকারণ, মুকাওয়ান, মরয়াকান আর বালন।'

'তার ওপর পুবদিকের জেলেরা আছে, এর মধ্যে যারা ওয়ালাকারণ তারাই নৌকো আর জাল রাখতে পারে। আগেকার দিনে গাঁয়ের মোড়লই ওয়ালা-কারণদের এই অধিকার দিয়েছে। তাও অনেক দক্ষিণে দিয়ে পেতে হয়।'

ভেলায়ুধন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের চেম্পনকুঞ্জ মামা তাহলে এদের মধ্যে কোন্ জাত?'

পুণ্যন একটু মুচকে হাসল। রামন মুপ্পন বলল, 'মুকাওয়ান।'

পুণ্যন সেই মিচকে হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'ভেলায়ুধন তো এখন চেম্পন মামার জাত খুঁজবেই।'

আচ্চকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে ?'

'ওর মেয়ের যে বিয়ের কথাবার্তা চলছে।'

আচ্চকুঞ্জ বলল, 'ভাল কথা। মেয়েটা ভাল মেয়ে।'

কথাটা আয়ানকুঞ্জের ভাল লাগল না। ও বলল, 'চেম্পনকুঞ্জের সবকিছু আচ্চকুঞ্জের ভাল লাগে।'

তারপর আয়ানকুঞ্জ ভেলায়ুধনকে বলল, 'ঐ হাড়-কিপ্পন চেম্পনকুঞ্জের হাত দিয়ে একটা পয়সা গলবে না। তাই তো মেয়েটাকে ঐ রকম ধিঙ্গী করে রেখেছে, বিয়ে দিচ্ছে না।'

আচ্চকুঞ্জের কথাটা শুনে রাগ হল, 'কেন ভাই এসব আজেবাজে বকছিস। মেয়েটার বিয়ের কথা হচ্ছে—এখন এইসব কথা বলে কি বিয়েটায় বাগড়া দেওয়া উচিত। আমরা তার পাড়াপ্রতিবেশী, আমাদের কি এটা ভাল দেখায় !'

আয়ানকুঞ্জ বলল, 'আরে আমি যা বলছি ঠিকই বলছি।'

আস্তি এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। এখন এমন একটা কথা জিজ্ঞেস করল যে তাতে ওদের কথাবার্তার মোড় ঘুরে গেল।

'জাল আর নৌকো কেনার অধিকার নেই অথচ জাল আর নৌকো কিনছে এমন কি কেউ দেখেছ ?'

আয়ানকুঞ্জ বলল, 'হ্যাঁ, তা দেখেছি বৈকি ! তবে সে নৌকো আর জাল বেশি দিন টেকেনি। গাঁয়ের ওয়ালাকারণদের কাছে খোঁজ নিলেই জানতে পারবে কোন্ কোন্ পরিবার এরকম জাল আর নৌকো কিনেছে।'

রামন মুপ্পন বলল, 'চেরতলায় পাল্লিকুন্নাথ জেলে, আলেপ্পীতে পারুতী জেলে আর এখানে কুন্নেলেতে রামনকুঞ্জ জেলে।'

পুণ্যন জিজ্ঞেস করল, 'নৌকো আর জাল কেনার অনুমতি যদি মোড়ল দেয় তাহলে তাকে কত দক্ষিণে দিতে হয় ?

রামন মুপ্পন বলল, 'সাতটা তামাকপাতা আর পনেরটি টাকা। এটা ওয়ালা-কারণদের দিতেই হবে।'

তারপর মোড়লের অধিকার আর তার পাওনা নিয়ে অনেক কথা হল। মোড়লদের কত অধিকার জেলেদের ওপর। মোড়লদের এই দাবী, এত মাতব্বরি ভেলায়ুধনের ভাল লাগল না। সে জিজ্ঞেস করল, 'নিজের টাকায় জাল আর নৌকো কিনব তার জন্য মোড়লকে টাকা দিতে হবে কেন ?'

পুণ্যন ভেলায়ুধনের কথার জের টেনে বলল, 'দেখ দেখ কাণ্ড দেখ। ব্যাটা এখনই যেন চেম্পনকুঞ্জের জামাই হয়ে গেছে, কথা বলছে দেখ না।'

আয়ানকুঞ্জও তাতে সায় দিল। তবে ওর আরও একটু বলার ছিল।

'মোড়লকে কিছু না দিয়ে কিছু না জানিয়ে চেম্পনকুঞ্জ জাল আর নৌকো কিনুকই না তখন চেম্পনকুঞ্জ আর তার জামাই দেখবে'খন মজাটা।'

আয়ানকুঞ্জ তাল ঠুকে বলল, 'চেম্পনকুঞ্জ জাল আর নৌকো কিনে নিয়ে এলে পর মোড়লের অনুমতি ছাড়া মাছ ধরতে কি করে যায় দেখে নেব একবার। জাল আর নৌকো নিয়ে ওকে আর মাছ ধরতে যেতে হবে না তা আমি বাজী রেখে বলতে পারি।'

ভেলায়ুধন ভাবল ওর এই তাল ঠোকার পাল্টা জবাব দেবে কিন্তু তারপরে ভাবল কি অধিকারে? তবে চুপ করেও রইল না। আয়ানকুঞ্জের কথায় প্রতিবাদ করে বলল, 'তোমাদের সকলের চেম্পনকুঞ্জের ওপর হিংসে।'

'জেলেদের মধ্যে হিংসে, ঈর্ষে আছে নাকিরে?'

'তাছাড়া আর কি?'

ওদের কথা-কাটাকাটি ঝগড়া শুরু হয় দেখে আচ্চকুঞ্জ ভেলায়ুধনকে বলল, 'একটু চুপ কর না বাবা!'

কিছুক্ষণের জন্যে সকলেই চুপ করে রইল।

এদিকে জেলেদের মধ্যে এই সব কথাবার্তা হচ্ছে আর ওদিকে চাকী দিবাস্বপ্ন দেখছে। শীঘ্র সে নৌকো আর জালের মালিকের বউ হতে চলেছে। ওর অনেকদিনের একটা সাধ আজ মিটতে চলেছে। এর জন্য স্বামী-স্ত্রী কত কষ্ট করেছে। পাড়া-প্রতিবেশী অন্যান্য জেলেনীদের চেয়ে ওর ভাগ্য সত্যিই ভাল। নৌকো আর জালটা হয়ে গেলেই কারুতাম্মার বিয়ের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। তখন অনেক ভাল ভাল জামাই পাওয়া যাবে। চাকী খুশিতে ডগমগ হয়ে তার মেয়েকে বলল, 'খুকি, তোর বাবার খুব ইচ্ছে যে এবছর মাছের মরসুমের পর জমি আর বাড়ি কিনে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করে।'

কারুতাম্মা কিছু বলল না। চাকী নিজেই বলে চলল, 'সাগর-মা মুখ তুলে চেয়েছেন—ধার-দেনা কিছুই নেই। মাছের মরসুম খারাপ হলেও কেউ তাগাদা দিতে আসবে না—'

চাকীর কথা শেষ হওয়ার আগেই কারুতাম্মা বলে উঠল, 'আমাদের ধারদেনা কিছুই নেই কেমন করে?'

চাকী বুঝতে পারল যে মেয়ে পারীকুট্টির দেনার কথা বলছে। চাকী একটু ঘাবড়ে গেল। কোনও রকমে তালগোল পাকিয়ে জবাব দিল, 'আরে ওটা আবার ধার নাকি?'

কারুতাম্মা একটু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি ?'

চাকী বলল, 'আরে ওর টাকাটা এখন না দিলেও ওতো আর আমাদের জাল আর নৌকো নিয়ে পালাবে না।'

'সে ছোট মিয়া অমন সাদাসিধে ভাল লোক বলে।'

চাকী রেগে গিয়ে বলল, 'বলি ছোট মিয়ার নামটা খুব মিষ্টি লাগে বুঝি তোর ?'

কারুতাম্মা চুপ করে রইল। মার প্রশ্নে এবার ও একটুও ভয় পেল না।

চাকী আবার বলল, 'ভালভাবে রীতভীত বজায় রেখে চললে কোনও ভাল ছেলে হয়তো তোমার বরাতে জুটতে পারে, নইলে ভাগ্যে যে কি আছে সাগর-মাই জানেন।'

কারুতাম্মা মার কথায় এবার একটুও ভয় পেল না বরঞ্চ মাকে শক্ত করে চেপে ধরল, 'মা, তুমি কি বলতে চাও যে আমি খারাপ মেয়ে ?'

চাকী মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'ঐ ছোট মিয়া তোর কে শুনি ?'

এ-কথার উত্তরে কারুতাম্মা কিছু বলতে পারল না। শুধু মার অভিযোগে ওর চোখ দুটো জলে ভরে এল।

ও কি অন্যায়টা করেছে ? প্রতিবার মা এমনি করে ওকে খোঁচা মারে কেন ? কারুতাম্মা যে খারাপ কিছু করেনি তা তো মা-ও জানে। আজ পর্যন্ত ও খারাপ পথে পা বাড়ায় নি। মুখ বুজে হিসেবী বুদ্ধিমতী মেয়ের মতোই ও চলেছে। তবে হ্যাঁ, পারীকুট্টির কাছে এরকমভাবে ধার নেওয়াটা উচিত হয়নি। ধারটা শোধ করে দিতে বলে ও কি খুব কিছু অন্যায় করেছে ? পারী-কুট্টির ওপর ওর একটা টান আছে। তাই পারীকুট্টির ক্ষতি হলে ওর খারাপ লাগে।

চাকী আপন মনেই গজগজ করতে লাগল, 'মেয়েটার বিয়েটা আগেই দেওয়া উচিত ছিল। তা ওর বাপ কি আর এসব দেখবে ?' তারপর একটু নরম স্বরে মেয়েকে বলল, 'খুকি, তোর জন্যেই তোর বাবা এত কষ্ট করছে। তুই যেন মা-বাবার মুখে কালি ঢালিসনি।'

কারুতাম্মা চুপ করে রইল।

চাকী বলল, 'সোনা মেয়ে, আমি একটা কথা তোকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করি সত্যি উত্তর দিস। মোছলমান ছোঁড়াটার জন্যে তোর মন কাঁদে নাকি ?'

'না'—বলাটাই কারুতাম্মার উচিত ছিল। কিন্তু ও চুপ করে রইল। ওকে অমনি নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখে চাকীর ভয় লেগে গেল। ভয়ে আর

ভাবনায় চাকী চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই গো সাগর-মা, আমার সোনা মেয়েটাকে ঐ পাজী মোছলমান ছোঁড়াটা বশ করেছে গো।'

কারুতাম্মা তাড়াতাড়ি মার মুখ চেপে ধরল। 'তুমি পাগলের মতো এসব কী বকছ মা!'

মা কিছুক্ষণ চুপচাপ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তোর ওপরই আমাদের মান-সম্মান সব নির্ভর করছে। দেখিস তুই আমাদের ডুবোসনি।' মার এই কথার পরও মুসলমান ছেলেটার ওপর তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই একথা কারুতাম্মা বলতে পারল না।

সেদিনই সন্ধের সময় আচ্চকুঞ্জ চেম্পনকুঞ্জের বাড়ি এল। জেলেদের মধ্যে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে, তা ও চাকীকে শোনাল, 'বুঝলে চাকী, মনে হয় জেলেদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু গোলমাল করার চেষ্টা করছে। এদের সর্দার হচ্ছে আয়ান-কুঞ্জ আর রামন মুপ্পন। চেম্পনকুঞ্জ ফিরলে পরেই প্রথমে এই সব গণ্ডগোল মেটাতে হবে। দেখ, আমি আর চেম্পনকুঞ্জ ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে খেলা করেছি, একসঙ্গে মিলেমিশে এত বড়টি হয়েছি, চেম্পনকুঞ্জের পেছনে এমনিভাবে সকলকে লাগতে দেখলে আমি চুপ করে থাকি কি করে বল?'

মেয়ের হাবভাবে মনের শান্তি তো নষ্ট হয়েছিলই এবার আচ্চকুঞ্জের কথা শুনে চাকী যেন একেবারে বসে পড়ল।

যদি গাঁয়ের লোক তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার ফল যে কি হবে তা চাকীর ভাল করেই জানা আছে। এত বড় কিছু একটা দোষ তারা করেনি। মেয়ের বিয়ে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু তা'বলে সেটা কি একটা এমন কিছু দোষের? এমনিভাবে তাদের পেছনে লাগাটা কি ঠিক? চাকী তাই চেম্পনকুঞ্জের আসার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে বসে রইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জেলে-সমাজের মাতব্বর হয়ে বুড়ো রামন মুপ্পন, আয়ানকুঞ্জ এবং আরও দুজন মিলে মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সঙ্গে দক্ষিণা নিল সাতটা তামাকের পাতা আর পনেরটা টাকা। মোড়ল বাড়িতেই ছিল। তারা মোড়লের কাছে আবেদন জানাল,

'কত্তা! চেম্পনকুঞ্জ যে আমাদের গাঁ একেবারে খারাপ করে দেওয়ার জোগাড় করেছে। ঘরে একটা ধিঙ্গী মেয়ে—বিয়ে দেয়নি, মেয়েটা আবার সারাদিন এখানে সেখানে ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

মোড়ল সব শুনে গম্ভীর হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, 'দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়।'

আয়ানকুঞ্জের কিন্তু মনে হল নালিশটা ঠিক যেন জুতসই হল না। মোড়ল যেন ওদের এই অভিযোগে খুব বেশি গা দিল না। ওরা তাই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জবাবের শেষেও ওদের ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মোড়ল জিজ্ঞেস করল, 'কিরে তোরা যে এখনও দাঁড়িয়ে রইলি?'

আয়ানকুঞ্জ বলল, 'আজ্ঞে আর একটা নিবেদন আছে।'

'কি?'

'ঐ সোমত্ত মেয়েটা অমনিভাবে ঘুরেঘুরে গাঁয়ের ছেলেছোকরাগুলোর স্বভাব-চরিত্তির নষ্ট করছে আর ওদিকে চেম্পনকুঞ্জ তার বিয়ের ব্যবস্থা না করে নৌকো আর জাল কিনতে গেছে।'

এ-খবরটা মোড়লের জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করল, 'জাল আর নৌকো কিনতে টাকা পেল কোথায়?'

টাকা পেল কোথায় তাতো এরাও জানেনা। তাই আয়ানকুঞ্জ মাথা চুলকে বলল, 'কি জানি। তবে ওতো জাতে ওয়ালাকারণ, ওকে কি জাল আর নৌকো কেনার হুকুম আপনি দিয়েছেন?'

'আমি হুকুম দিয়েছি? আমাকে কিছু বলেই নি।'

'আমাদের এখন তাহলে কি করা উচিত কত্তা ?'

মোড়ল একটুখানি ভাবল তারপর বলল, 'চেম্পন হয়তো ভাবছে দিনকাল সব বদলে গেছে।'

আয়ানকুঞ্জ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই হয়তো ভাবছে।'

মোড়ল তখন বলল, 'আচ্ছা, ও নৌকো নিয়ে আসুক। ওর নৌকোয় মজুরি খাটতে কে কে যায় আমাকে জানাবি।'

আয়ানকুঞ্জ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই জানাবো। আমরা তো কেউ যাবই না তবে কতকগুলো জোয়ান ছোকরা আছে তারা কি করবে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ভেলায়ুধনের কথা ভেবেই আয়ানকুঞ্জ এই কথাগুলো বলল, কিন্তু মোড়ল তাতে বেশি গা দিল না। মোড়ল জানতো যে ওর হুকুমকে অগ্রাহ্য করার সাহস এখনও কারুর হয়নি। মোড়ল আয়ানকুঞ্জকে বলল, 'আচ্ছা সে-সব আমি দেখব। তোরা আগে গাঁয়ের লোকদের জানিয়ে দে যে নৌকো কেনার হুকুম আমি দিইনি।'

মোড়লকে চেম্পনকুঞ্জের নামে লাগিয়ে বেশ খুশি মনেই ওরা বাড়ি ফিরল। ফেরার পথে ওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোড়লের হুকুমের কথা জানাল। ভেলায়ুধনই শুধু মোড়লের কথা কানে নেবে না আয়ানকুঞ্জ তা জানতো। কিন্তু ও আর কিই বা করতে পারবে। একটা ছোট্ট কুকুরের মতো তড়পাতে পারবে কিন্তু কামড়াতে পারবে না। ওকে এর ফলও ভোগ করতে হবে।

চাকীও সমস্ত খবর পেল। মোড়লের কোপে পড়ে অনেক জেলে-পরিবারের সর্বনাশ হয়েছে সে-কথা চাকী খুব ভাল করেই জানে। মোড়লের কথা না শোনার ফলে অনেক পরিবারকেই রাতারাতি ঘর ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যে অন্য গাঁয়ে গিয়ে জেলের কাজ করে খাবে তাও হচ্ছে না। মোড়লের কোপ সে-গাঁয়ে গিয়েও পড়বে। যারা এমনিভাবে মোড়লের কোপে পড়ে তাদের ধর্ম পর্যন্ত বদলাতে হয় কিন্তু আজকাল অবশ্য ঠিক আগের মতো নেই, দিনকাল অনেক বদলে গেছে। কিন্তু মোড়লের ক্ষমতা যে একেবারেই কিছু নেই তা ঠিক নয়। আজও যদি মোড়ল হুকুম করে তাহলে নৌকোয় কাজ করার লোক নাও পাওয়া যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে কেউ জন্মালে বা মরলে বাড়িতে কেউ পা দেবে না। সত্যিই মিনসের ভীমরতি ধরেছিল নইলে নৌকো আর জাল কিনতে যাওয়ার আগে দক্ষিণে দিয়ে মোড়লের হুকুমটা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওরা কার কাছে কি অপরাধ করেছে যে এমনিভাবে ওদের নামে সকলে গিয়ে মোড়লকে লাগিয়েছে!

ইতিমধ্যে জেলেদের মধ্যে মোড়লের আদেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই চেম্পনকুঞ্জকে একঘরে করে দেওয়ার কথা নিয়ে বলাবলি করছে। মেয়েরা আবার একটু বেশি বলাবলি করছে। ডাগর মেয়ের বিয়ে না দিয়ে জাল-নৌকো কিনতে যাওয়ার ফল দেখ। এখন বোঝ ঠ্যালা, মোড়ল কি আর অমনি ছাড়বে!

এইসব কথাবার্তা কারুতাম্মার কানে এসেও পৌছোলো। বেচারী সব শুনে বসে বসে নিজেকে দুষতে লাগল। আমার জন্যেই আমার মা-বাবার আজ এই দুরবস্থা। আমার মতো হতভাগিনী বোধহয় আমাদের জেলে-সমাজে আর একটিও নেই। আমি কি মেয়ে হয়ে জন্মাতে চেয়েছিলাম, আমি কি চেয়েছিলাম আমার শরীরটা এত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠুক? আমি তো আমার সমাজের মুখ নীচু করিনি, আমি যদি আইবুড়ো থাকি তাহলে অন্যের কেন গা জ্বলে? একটা জিনিস কিন্তু কারুতাম্মা ঠিক বুঝতে পারেনি, ওর বাবার মতো অবস্থার অনেক জেলেই ওদের সমাজে আছে তারা কেউ জাল কিনতে পারল না আর ওর বাবা পারল কাজেই অন্য জেলেরা তা সহ্য করে কি করে? তাদের রাগ আটকায় কে? মা আর মেয়ে তাই খুবই ভয় আর ভাবনায় চেম্পনকুঞ্জের ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এদিকে পাড়াপড়শীদের ঘরে এই ছাড়া আর কথা নেই। কালিকুঞ্জের বাড়িতে চারপাঁচজন জেলেনী একসঙ্গে বসে এই গল্পই করছিল। চাকী আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শুনছিল।

এক জেলেনী বলল, 'পারীকুট্টি আর কারুতাম্মার মধ্যে কিছু একটা আছে গো। আমি নিজের চোখে দেখেছি নৌকোর আড়ালে বসে দুজনে কি হাসা-হাসি ঢলাঢলিই করছিল। আরে এরজন্যেই তো কারুতাম্মার বিয়ে দিচ্ছে না।'

মেয়ের নামে এমনি বদনাম কোন্ মা সহ্য করতে পারে! চাকী নিজের বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্য বাঘিনীর মতো আড়াল থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তারপরেই শুরু হল জেলেনীদের মুখের আগল খুলে খিস্তী-খেউড়।

এক জেলেনী বলল, 'আরে যেমনি মা তেমনি তো মেয়ে হবে, না কি? মা তার ডবকা বয়সে কি করেছিল তা একবার জিজ্ঞেস কর না।'

চাকীও ছাড়বার পাত্র নয়, বলল, 'এই মাগী, আমার নামে তো খুব বলছিস। বলি তোর ছোটছেলের আসল বাপটা কে শুনি? শুঁটকি মাছ কেনার জন্যে আগাম টাকা দিতে যে মোছলমানটা আসত সে মিনসেটা ওই

ছেলেটার কে শুনি ? আরে জানি রে জানি, তোদের সকলের কেচ্ছাই জানি। শুধু আমার আর আমার মেয়ের নামে বললে কি হবে। তোদের সকলেরই সব ঝুড়ি ঝুড়ি কেচ্ছা আছে।'

চাকী একদিকে আর অন্য সব জেলেনীরা আর একদিকে কিন্তু চাকী একাই একশো।

কারুতাম্মা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত শুনছিল। সব শুনে ও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। ওর মা'ও তাহলে তার ডাগর বয়সে অন্য আর একজনকে ভালোবেসেছিল! আর ওই যে সব অন্য জেলেনীরা তাদের কারুরই তাহলে রীতভীতের ঠিক ছিল না! তাহলে এতদিন ধরে তাদের সমাজে যে ভালমন্দ আচার-অনাচারের কথা চলে আসছে তার তাহলে কোনই মানে নেই? সবই তাহলে বানানো গল্প। কিন্তু…কিন্তু এই সব মেয়েদের রীত খারাপ থাকা সত্ত্বেও সমুদ্র তো ঠিক সেই আগের মতোই বিছিয়ে পড়ে আছে। শুকিয়ে তো যায় নি। আজও তো সেই সমুদ্রে জেলেরা নৌকো নিয়ে নামছে, বৃষ্টি পড়ছে, জেলেরা মাছ ধরে তাদের রুজিরোজগার করছে। তাহলে ওসব কথার মানে কি?

ঝগড়া জমে আসার পর জেলেনীরা আবার কারুতাম্মাকে নিয়ে পড়ল। কারুতাম্মা আর শুনতে পারল না। ও লজ্জায় নিজের কান চেপে ধরল। সমস্ত মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে। পারীকুট্টি নাকি ওকে রেখেছে। তেজী ঘোড়ার মতো ওই মেয়েটাকে মুসলমান ছাড়া আর কেউ বাগিয়ে চালাতে পারবে না। পারীকুট্টির কাছ থেকে নিয়ে অন্য কোথাও বিয়ে দিলে ওদের লাভ কমে যাবে যে। ছি ছি এসব কি কেচ্ছা, মাগো কি ঘেন্নার কথা! এসব তো ডাহা মিথ্যে কথা।

তাহলে এতক্ষণ ধরে ওই সব জেলেনী আর তাদের মেয়েদের যে কেচ্ছা ও শুনল তা সব তাহলে বাজে কথা। নিশ্চয়ই তাই।

চাকীর মুখের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে কালিকুঞ্জ বলল, 'দেখ-না এবার মজাটা। মোড়ল ঠিক করে ফেলেছে। দেখ তোদের কি অবস্থা হয়।'

চাকীর আর সহ্য হল না। ও মুখ ভেঙ্‌চিয়ে বলে উঠল, 'মোড়ল কি ঠিক করেছে? কি করবে আমাদের শুনি?'

তখন কালোমতো একটা জেলেনী বলল, 'তোরা আমাদের সমাজের মুখে চুনকালি দিচ্ছিস। তোদের কি ভাবে জব্দ করতে হয় মোড়লের তা খুব ভালভাবেই জানা আছে।'

চাকী বেপরোয়াভাবে বলল, 'মোড়ল আমাদের করবেটা কি শুনি? অত

কি তার ধার ধারি। বেশি কিছু করতে এলে হয় মোছলমান হব না হয় খেষ্টান হব।

তখন অন্য একটা জেলেনী বলল, 'ওঃ তাই বল্। ভেবে চিন্তেই মেয়েকে মোছলমানের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে দিয়েছিস।'

আর একটা জেলেনী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মেয়ে আর মা দুজনেরই তাতে উপ্‌গার হবে।'

চাকীও সমানে উত্তর দিল, 'তাতে আর দোষের কি বল?'

মার কথাশুনে কারুতাম্মার সারা গা শিরশির করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওর সারা দেহে আর মনে ছড়িয়ে পড়ল। এটা একটা বেদনা না আশ্বাস ও বুঝে উঠতে পারছিল না।

একটু পরেই ও প্রাণপণ শক্তিতে ডেকে উঠল, 'মা!'

ঝগড়া করতে করতে চাকী বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মেয়ের ডাক শুনে এখন বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরেও আপনার মনে গজ গজ করতে লাগল।

কারুতাম্মা মাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। 'মুসলমান হব' মার এই দুটি কথার ধাক্কায় ওর মাথা রিমঝিম করছিল। কিন্তু মার কথাগুলো তার যেন এতটুকুও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না বরঞ্চ মনে হচ্ছিল এটা খুবই স্বাভাবিক। পারাকুট্টিকে ও তার হৃদয়-মন দিয়ে ফেলেছে? তাকে একান্ত আপনার করে পাবার একমাত্র উপায় ওর মুসলমান হওয়া।

এতদিন পর্যন্ত যে জীবন ও কাটিয়ে এসেছে তা একঘেয়ে আর দুঃখকষ্টে ভরা। পারীকুট্টিকে ভালোবেসেছে বটে কিন্তু তার জন্যে অন্যায় কিছু করেনি, কারুর বিশ্বাস ভাঙেনি, তার ব্যবহারে মা-বাপের মনে দুঃখ দেয়নি। আঁটঘাট বেঁধে অনেক সংযত জীবন যাপন করে এসেছে, কিন্তু এ জীবনকে মনে হয়েছে যেন কারাজীবন যার থেকে বেরোবার কোনও পথ নেই। কিন্তু আজ মার কথায় মনে হলো সেই কারাজীবন থেকে বাইরে বেরোবার একটা পথ কে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। না এখন মনটাকে যদি একটু শক্ত করে ফেলে তাহলেই আর সব আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে।

আর মুসলমান হলে খারাপটাই বা কি? তখন তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন হবে? কুপ্পায়ন* আর মুণ্টু পরে মাথায় কাপড় দিয়ে কানে মাকড়ী পরে ও যদি পারীকুট্টির সামনে দাঁড়ায় তাহলে পারীকুট্টি অবাক হয়ে ওর দিকে

* মালিয়ালী মুসলমান রমনীদের ব্লাউজ জাতীয় পোষাক।

তাকিয়ে থাকবে। পারীকুট্টির তখন ওকে কত ভাল লাগবে! সে সময় যদি পারীকুট্টি তার দেহের দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে থাকে তাহলে ওর কিছুই খারাপ লাগবে না। পারীকুট্টির সঙ্গে বিয়ে হলে এই দুঃখেকষ্টে-ভরা জীবন থেকে সে যেন রক্ষা পাবে। তখন তাহলে তাকে আর মাছ মারার বউ হয়ে জীবন কাটাতে হবে না।

এইসব ভাবতে ভাবতে কারুতাম্মা এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে পারীকুট্টি যদি তখন তার সামনে থাকত তাহলে ও বলে ফেলত—'ওগো শুনছ, আমরা যে মুসলমান হতে যাচ্ছি।'

ওঃ, কথাটা শুনে পারীকুট্টি বোধহয় আনন্দে লাফাতে শুরু করে দিত।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি মন থেকে একথা বলেছে না ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় বলে ফেলেছে? সত্যিসত্যিই ওরা মুসলমান হবে কিনা তা মাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না; মা যদি ওর মনের কথা জেনে যায়! এমনিভাবে নানাকথা ভাবতে ভাবতে কারুতাম্মা শেষ পর্যন্ত মাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না।

ইতিমধ্যে তিনচার জন লোক মোড়লের কাছ থেকে চেম্পনকুঞ্জের কাছে এল। চেম্পনকুঞ্জ তখনও বাড়ি ফেরেনি। চার-পাঁচদিন পরে চেম্পনকুঞ্জের কেনা নৌকো আর জাল সমুদ্রের ধারে এল। নৌকোটা কেনা হয়েছে পাল্লিকুন্নাথ গাঁয়ের কাণ্ডানকোরানের কাছ থেকে। এক সময় নৌকোটার খুবই নাম ছিল। এখন অবশ্য একটু পুরোনো হয়ে গেছে। চেরতলার সমুদ্রে এই নৌকোয় সব নৌকোর চেয়ে বেশি মাছ উঠতো। কথাটা মিথ্যে নয়। এখানকার জেলেরা মাছের মরসুমে নিজেদের চোখে দেখেছে। নৌকোটা পুরোনো হয়ে গেলেও কাণ্ডানকোরান বিক্রী করেনি কিন্তু ওর অবস্থা আজকাল পড়ে এসেছে তাই বিক্রী না করে উপায় ছিল না।

চেম্পনকুঞ্জের নৌকো তীরে ভিড়লে ওখানকার জেলেরা সব দেখল। খোলাখুলি কেউ কিছু বলল না। কিন্তু সকলের মনেই হিংসে যে এমন পয়া নৌকাটা কিনা চেম্পনকুঞ্জের হাতে পড়ল। সত্যিই লোকটার ভাগ্য ভাল। আচ্চকুঞ্জ অন্য সব জেলেদের উদ্দেশ্য করে বলল:

'এই দেখ, আমি বলে দিলাম পাল্লিকুন্নাথ, গাঁয়ের মা-লক্ষ্মী নিজে নৌকোয় চেপে সোজা চেম্পনকুঞ্জের বাড়ি চলে এয়েছে। এখন ওকে আর পায় কে!'

আয়ানকুঞ্জের আচ্চকুঞ্জের কথা একটুও পছন্দ হল না, তাই তাকে এক ধমক দিল, 'আরে যা যা, কাণ্ডানকোরানের মা-লক্ষ্মী এই শালার

কাছে আসবে কেন? কাণ্ডানকোরানের সঙ্গে চেম্পনকুঞ্জের তুলনা! কোথায় সেই পাকা সোনার মতো টকটকে রঙ। তাঁর মোটা ভুঁড়ির ওপর মুণ্ডু পরে কাঁধে চওড়া পাড় চাদর ফেলে নৌকো ফেরার সময় তীরে এসে তিনি দাঁড়াতেন। সেই লোক আর এই লোক! আরে ছ্যা।'

রামন মুপ্পন সায় দিয়ে বলল, 'যা বলেছিস। এবার চেম্পনের ওই ভূতের মতো কালো রোগা বউটাও কাণ্ডানকোরানের বউএর মতো সুন্দরী হয়ে উঠবে। তুই তো কাণ্ডানের বউকে দেখেছিস।'

আয়ানকুঞ্জ বলল, 'দেখিনি আবার। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।'

নৌকো তীরে রেখে চেম্পনকুঞ্জ তাড়াতাড়ি বাড়ি ছুটল। বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার শুনে ওর যেন মাথায় বাজ পড়ল। খুব উৎসাহের সঙ্গে বেচারা বাড়ি ফিরছিল। কাণ্ডানকোরানের ঐ নৌকোটা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। তাছাড়া কাণ্ডানকোরানের বাড়ি গিয়ে সেখানে কেমন খাওয়া-দাওয়া করেছিল তার গল্পও বেশ রসিয়ে চাকীকে বলবে বলে ঠিক করেছিল। কাণ্ডান-কোরানের বউএর কথাও অনেক কিছু বলার ছিল। কত উৎসাহ আর আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো এই আঘাত তাকে হতভম্ব করে দিল।

এতবড় একটা বিপদের সামনে ও কোনদিন পড়েনি। কতদিন ধরে এই জাল আর নৌকো কেনার স্বপ্ন দেখে এসেছে ও। সেই স্বপ্ন যখন সফল হল তখন যা যা হওয়া উচিত ছিল তা তা আর হচ্ছে না।

ও অবশ্য খুবই বড় একটা অপরাধ করেছে। জাল আর নৌকো কেনার আগে মোড়লের সঙ্গে দেখা করেনি। ওদের সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে যে নিয়ম চলে আসছে ও তা মানেনি। মোড়লকে অগ্রাহ্য করেছে। সত্যি বটে নৌকো আর জাল কেনার টাকা ওকে অনেক কষ্টে জোগাড় করতে হয়েছে কিন্তু তার থেকে বিশ-পঁচিশটা টাকা নিয়ে মোড়লকে দক্ষিণা দিলে খুব কিছু একটা অসুবিধেতেও পড়ত না। কিন্তু মোড়লকে না জানিয়ে যে এতবড় একটা অপরাধ ও করেছে তা ওর জানা ছিল না।

চেম্পনকুঞ্জ চাকীর মুখে সবকথা শুনে অসহায় ভাবে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আমরা লোকের কি ক্ষেতিটা করেছি?'

'কি আর করেছি। হিংসে গো হিংসে। হিংসেয় যে সকলের গা জ্বলছে।'

'হুঁঃ। কিন্তু এখন বিশ-পঁচিশটা টাকা পেলে তবে সবদিক সামলানো যায়।

কি করা যায় বলত? কিন্তু শুধু তাই নয় নৌকোর পেছনে আরও কিছু ঢালতে হবে এখন যা জাল কিনেছি তাতে শুধু ছোট মাছই ধরা যাবে।'

নিজের সব দুঃখকষ্ট সুবিধে-অসুবিধের কথা বউএর কাছে চেম্পনকুঞ্জ বলতে আরম্ভ করল। আর কার কাছেই বা বলবে, কেই বা শুনবে! কিন্তু চাকী সব শুনে একটা মিষ্টি কথা তো বললই না উপরন্তু জিজ্ঞেস করল :

'ক্ষ্যামতা নেই তো এত ঝন্‌ঝাট মাথায় বইতে গেলে কেন?'

চেম্পনকুঞ্জ একথার কোনও উত্তর দিল না। মনে মনে ও ভাবছিল, সত্যিই তো এতবড় বোঝা ও কেন বইতে গেল। সমস্ত পয়সা খরচ হল, হাতে এখন কানা কড়িটি পর্যন্ত নেই। তার ওপর গাঁয়ের লোকও ওর শত্রু হল।

চাকী আবার বলল, 'টাকাটা দিয়ে যদি মেয়েটার বিয়ে দিতে তাহলে একটা কাজের কাজ হত, এতসব ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে হত না।'

চেম্পনকুঞ্জ চাকীর এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না। ও মনে মনে ভাবছিল যে জীবনে যদি একটা বড় আশা থাকে তাহলে মনের শান্তিটিকে বিসর্জন দিতে হয়। যা পাচ্ছিল তাই দিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়াই ভালো ছিল, কিন্তু মনে বড় সাধ ছিল একটা জাল আর নৌকো কেনার। সেই সাধ যখন মিটল তখন কোথায় আনন্দ করবে না অশান্তির শেষ নেই।

রাত কিছুটা বাড়লে পর চেম্পনকুঞ্জ বউকে বলল :

'কোনরকমে যদি পঁয়তিরিশটা টাকা পাওয়া যায় তাহলে একটা ব্যবস্থা করা যায়।'

'কি রকম?'

'কাল সকালেই মোড়লের সঙ্গে গিয়ে দেখা করব তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাহলে জাল কেনার পয়সা আবার কোত্থেকে জুটোবে?

'সে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাঁশের কেঁড়ের মধ্যে চাকী কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছিল তা ও নৌকো আর জাল কিনতে আগেই দিয়ে দিয়েছিল। এখন টাকা কোথায়! চাকী চেম্পনকুঞ্জকে বকাবকি করতে লাগল, 'এখন বোঝ ঠ্যালা। বললে তো কানে নাও না! আগে কতবার বলেছি, আমার জন্যে দু একটা গয়না গড়াতে তা মিনসের কি সে কথা কানে তোলার সময় আছে?'

চেম্পনকুঞ্জ একটি কথাও না বাড়িয়ে নিজের দোষ স্বীকার করল। তারপর বলল :

'একটা উপায়ই আছে।'

'কি উপায় ?'

'আছে একটা।'

কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারল না চেম্পনকুঞ্জ। চাকী আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি শুনিই না ?'

'ঐ মোছলমান ছোঁড়াটাকে আর একবার কায়দা করে ধরতে হবে।'

চাকী কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চেম্পনকুঞ্জের মুখ চেপে ধরল।

কারুতাম্মা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা জানে না। চেম্পনকুঞ্জ চাকীর রকমসকম দেখে অবাক। ও একঝটকায় চাকীর হাতটা মুখ থেকে সরিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে ?'

'আস্তে বল।'

'আস্তে বলব···কেন ?'

কেন সে সব চেম্পনকুঞ্জের জানা নেই। সে সব কথা কোনও বাপের জানার দরকারও নেই। কিন্তু একটা কিছু এখন বলতে হয়। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে তাই চাকী ওর কানে কানে বলল, 'তোমার মেয়ে বলেছে অমন ভাবে টাকা নেওয়াটা খারাপ। ও যদি জানতে পারে তো ঝগড়া করবে।'

'এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি ?'

'আমিও তো তাই ভাবছি।'

কিছুক্ষণ পরে চেম্পনকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'ছোঁড়াটা কি আছে ওখানে ?'

'কি জানি, থাকতেও পারে।'

'আমি একবার গিয়ে দেখে আসি।'

চাকী কোন কথা বলল না। চেম্পনকুঞ্জ দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

কারুতাম্মা তখন ঘুমিয়ে। এসবের কিছুই জানতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে চেম্পনকুঞ্জ ফিরে এল। মুখে ওর মৃদু হাসি। কাজ যে হাঁসিল করে এসেছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

'ছেলেটা সত্যিই ভাল রে চাকী। ওর হাতে তখন তিরিশটা টাকা ছিল। আমি চাইতেই দিয়ে দিল।'

সমস্যার সমাধান হল বটে কিন্তু চাকীর মনটা যেন কেমন খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। মনে হল মেয়ের কথাই ঠিক। এমনভাবে টাকা নেওয়াটা খারাপ। কিন্তু যখনই চাওয়া যায় ছেলেটা কোনও কিছু না ভেবে তখনই এত সহজে টাকা-গুলো দিয়ে দেয় কেন ? সত্যিই তো কি ব্যাপার ! নিশ্চয়ই কারুতাম্মার কথা

ভেবেই দেয়, তাছাড়া আর কিই বা হতে পারে। ওরা তো তার সাতকুলের কেউ নয়। কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কে জানে। চাকীর মনটা খুব খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল।

পরের দিন সকালেই চেম্পনকুঞ্জ টাকা নিয়ে মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মোড়ল প্রথমটা খুব চোটপাট করলেও টাকার গন্ধ পেয়ে ঠাণ্ডা হল। তবে চেম্পনকুঞ্জ যাতে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা শিগ্রি করে তার চেষ্টা করতে উপদেশ দিল। মাছের ভাগও রোজ ওর বাড়িতে ঠিক মতো পৌঁছে দিতে বলল। এক-ফাঁকে চেম্পনকুঞ্জ তার গাঁয়ের লোকদের তার ওপর হিংসের কথাটাও বলে দিল।

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি তার ব্যবস্থা করছি'—বলে মোড়ল ওকে বিদায় দিল।

এমনি ভাবে গণ্ডগোল কিছুটা মিটল। বাড়ি ফিরে চেম্পনকুঞ্জ চাকীকে বলল, 'মোড়লের সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে এলাম। কিন্তু এখন সব ঠিকঠাক করে সমুদ্দুরে নৌকো নামাতে পাঁচশ টাকার দরকার। তা সাগর-মার কেরপায় তাও জোগাড় হয়ে যাবে।'

চাকী জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে ?'

'পারীকুট্টি দেবে।'

কথাটা শুনে চাকী অবাক হয়ে চেম্পনকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দু'জনে মিলে তুমুল একচোট ঝগড়া হল। ভাগ্যিস কারুতাম্মা তখন বাড়ি ছিল না। নইলে কেলেঙ্কারীর আর বাকি কিছু থাকত না। চেম্পনকুঞ্জ কিছুক্ষণ ঝগড়া করার পর চাকীকে কড়া গলায় বলল, 'তোকেই পারীকুট্টির কাছে টাকা চাইতে হবে।'

'আমার দ্বারা হবে না।'

'তাহলে নৌকোটা কাজে না লেগে নষ্ট হয়ে যাক।'

'যাক।'

কিন্তু মুখে 'যাক' বললেই কি আর মন সায় দেয় ? মনে মনে চাকী ছটফট করতে লাগল। চেম্পনকুঞ্জ ঠিক করে বসে আছে যে চাকীকেই টাকা চাইতে হবে। চেম্পনকুঞ্জ যে এখন আর কোনও কিছু করবে না তা চাকী বুঝতে পারল। ও আরও বুঝল যে চেম্পনকুঞ্জ এমনভাবে সমস্ত ব্যাপারটা গড়াতে দিয়েছে যে এখন চাকীকে পারীকুট্টির কাছে টাকা চাইতেই হয়। চাকী তাই কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আচ্ছা না হয় চাইলাম কিন্তু ওর টাকা কি তুমি ফেরৎ দেবে ?'

চেম্পনকুঞ্জ দিব্যি খেল, 'মাইরি বলছি। শুধু টাকা কেন, সুদসুদ্ধু ফেরৎ দেব।'

চাকী স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে পারীকুট্টির কাছে টাকা চাইল। রাতের

অন্ধকারে পারীকুট্টি শুঁটকি মাছ বিক্রী করে দেবার ব্যবস্থাও করল। এমনিভাবে চেম্পনকুঞ্জের নৌকো নামানোর সমস্ত টাকাটা জোগাড় হল।

টাকাপয়সার ব্যাপার ঠিক হল। এবার দিনমজুরি-খাটা জেলের দরকার। এদিক দিয়েও কোন অসুবিধেই হল না। মোড়ল নিজেই সব জেলেদের ডেকে কারা কারা চেম্পনকুঞ্জের নৌকোয় খাটবে তার ব্যবস্থা করে দিল। লোক জোগাড় করতে মোড়লকে খুব বেগ পেতে হল না। কেননা কাণ্ডানকোরানের ওই পয়া নৌকোটায় কাজ করতে সকলেরই মনে মনে খুব ইচ্ছে ছিল। এখন মোড়ল বলতেই এককথায় সব রাজী হয়ে গেল।

আচ্চকুঞ্জ এদিকে ভাবছিল যে চেম্পনকুঞ্জ তার বন্ধু লোক, নিশ্চয়ই তার মতামত নেবে আর তাকেও নৌকোর কাজে ডেকে নেবে। কিন্তু সে সব কিছুই হল না দেখে আচ্চকুঞ্জ একটু অবাকই হয়ে গেল। বাড়িতেও এই নিয়ে বউএর সঙ্গে এক পশলা হয়ে গেল। আচ্চকুঞ্জ বউএর কাছে খুব তম্বি করল যে দরকার হলে এ নিয়ে ও মোড়লের সঙ্গেও বোঝাপড়া করবে, কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের রকম-সকম দেখে আচ্চকুঞ্জ নিজেই থ' হয়ে গেল। চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে তার ভাব কি আজকের। অথচ দু-তিনবার তার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও চেম্পনকুঞ্জ তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। চেম্পনকুঞ্জ জেলেদের মধ্যে থেকে বারোজনকে বেছে নিল কিন্তু তার মধ্যে ওর পুরোনো বন্ধু আচ্চকুঞ্জ ছিল না।

নৌকো সমুদ্রে নামানোর আগের দিন একটা ছোটখাটো পুজো করতে হয়। ভোজও দিতে হয়। চেম্পনকুঞ্জ জিনিসপত্র সমস্ত হাসানকুট্টির দোকান থেকে ধারে কিনল। কাকাচাতুম আর পুন্নপ্রায়ম নামে দুইজায়গায় ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজন ছিল, তাদের নিমন্ত্রণ করার জন্যে কারুতাম্মাকে পাঠাল।

কারুতাম্মা বাপের আদেশে ওদের আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করতে চলল। আনমনে কত কি ভাবতে ভাবতে ও সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ 'মাছ ধরে আমার কাছে বিক্রী করবে তো?'—এই প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল। মুখ তুলে দেখে পারীকুট্টি ওর সামনে দাঁড়িয়ে। কারুতাম্মা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন করে কোথা থেকে পারীকুট্টি ওর সামনে হাজির হল! কিন্তু ও একটাও কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন কি 'ভাল দাম পেলে বিক্রী করব বৈকি'—তাও নয়। কারুতাম্মা আর সেই আগের কারুতাম্মা নেই। ও অনেক বদলে গেছে। ওকে অমনিভাবে চুপচাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পারীকুট্টি জিজ্ঞেস করল, 'কারুতাম্মা, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?'

কারুতাম্মা কিছু বলল না কিন্তু পারীকুট্টির এই কাতর প্রশ্ন শুনে ওর বুকটা যেন ফেটে যাবে এমনি ভাবে বুকের মধ্যে ধকধকানি শুরু হল।

'কারুতাম্মা, তোমার যদি আমাকে আর ভাল না লাগে তাহলে আমার আর বলার কিছুই নেই।'

পারীকুট্টির কিছু বলার না থাকলেও কারুতাম্মার যে অনেক কিছু বলার আছে, অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। ওর মা ওদের মুসলমান হওয়ার কথা বলেছে তা নিয়েও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে।

কিন্তু ও কিছুই বলল না। তীরে-বাঁধা নৌকোগুলোর ছায়ায় মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পারীকুট্টি যে ওর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তা ও বুঝতে পারল। কিন্তু 'অমনভাবে আমার দিকে তাকিও না'—এ কথাও ও বলল না। হঠাৎ নীচু মুখটা তুলে বলল, 'আমি যাই ছোট মিয়া।'

কিন্তু যাবার জন্যে পারীকুট্টির হুকুম চাইতে হবে কেন? ওতো ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে, এখনি এই মুহূর্তে। হঠাৎ কারুতাম্মা কেমন যেন ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'ওমা কেউ দেখে ফেলবে'—বলেই ও পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। দু-পা হাঁটার পরেই ও পারীকুট্টির ডাক শুনতে পেল, 'কারুতাম্মা!'

সেই ডাক সেই আওয়াজের মধ্যে কি যেন একটা ছিল। এমন করে তো আজ পর্যন্ত কেউ ওকে ডাকেনি। ওর হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া, বুকের মধ্যে সাড়া-জাগানো সেই ডাক ওকে স্তব্ধ করে দিল। আর একপাও ও এগিয়ে যেতে পারল না। বঁড়শীতে-গাঁথা মাছের মতো ওর পাদুটো সেখানে আটকে গেল। কারুতাম্মা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল যে হয়তো পারীকুট্টি ওর দিকে এগিয়ে আসবে। কিন্তু পারীকুট্টি না এল ওর দিকে এগিয়ে, না জিজ্ঞেস করল ওকে কোনও কথা।

কতক্ষণ যে দুজনে চুপচাপ এমনিভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তা দুজনেরই জ্ঞান ছিল না। কারুতাম্মার বুকের মধ্যে তখন যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তার কোনও প্রকাশ বাইরে একবিন্দুও ছিল না।

নীলসমুদ্র ছিল অচঞ্চল। এতদিন যে গল্প সে শুনেছিল তা যেন মনে হচ্ছিল মিথ্যা। কারুতাম্মার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে সমুদ্র দেখাল না কোনও চঞ্চলতা, উঠল না কোন প্রবল ঝড়-তুফান। চারিদিক নির্জন, হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ করে, নীল নীল ছোটো-ছোটো ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে, মাথায় তাদের জ্বলছে সাদা মানিক। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রের পটভূমিকায় এক প্রেমদৃশ্যের মহড়া চলছে আর তাই দেখে সমুদ্র মুচকি মুচকি হাসছে।

একটু পরে পারীকুট্টির সব প্রশ্ন সব বলা কটি কথায় বেরিয়ে এল, 'কারুতাম্মা, তুমি কি আমাকে ভালবাস ?'

কারুতাম্মার মুখ থেকে তার অজানতে বেরিয়ে এল, 'হ্যাঁ।'

পারীকুট্টি ব্যাকুলভাবে আর একটা প্রশ্ন করল, 'শুধু কি আমাকেই ভালবাস ?'

তৎক্ষণাৎ ও জবাব পেল, 'হ্যাঁ, তোমাকেই শুধু।'

হঠাৎ নিজের গলার আওয়াজ শুনে কারুতাম্মা চমকে উঠল। এতক্ষণ যেন ও নিজেতে ছিল না। পারীকুট্টিকে যা বলল তার অর্থ যেন ও এখন সম্পূর্ণ বুঝতে পারছে। যে কথা ও পারীকুট্টিকে এই মাত্র বলল তা যেন এখন সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে ওকে শাসন করতে লাগল—'এমন কথা তুই বললি কি করে ?'

ও পারীকুট্টির মুখের দিকে তাকায়। পারীকুট্টির দৃষ্টির সঙ্গে ওর দৃষ্টি মিলল। যা বলার তা সবই বলা হয়ে গেল। পরস্পর পরস্পরের কাছে হৃদয়-দুয়ার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিল। কিছুক্ষণ মাত্র তারা এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কারুতাম্মা ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরের দিন রাত তিনটের সময় নীরকুন্নাথ গাঁয়ের জেলেরা সমুদ্রের ধারে এসে জড়ো হল। চেম্পনকুঞ্জের নৌকো সমুদ্রে নামানো হবে। নতুন নৌকো নামানোর সময় অন্য আরও সব নৌকো নামানোর নিয়ম তাই সারে সারে নৌকো এসে তীরে ভিড়ল। চাকী, কারুতাম্মা, পঞ্চমী সকলেই এসে জড়ো হয়েছে। একটু দূরে পারীকুট্টিও দাঁড়িয়ে রয়েছে। পঞ্চমী দিদির দৃষ্টি পারীকুট্টির দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছিল, কারুতাম্মা ওকে একটা ছোট্ট চিমটি দিয়ে থামাল।

অনেকে তখনও এসে উপস্থিত হয়নি, রামন মুম্পন তাদের হাঁকডাক করতে লাগল। আয়ানকুঞ্জ বিরক্ত হয়ে বলল :

'নতুন নৌকো নামানো হবে জেনেও সব আসতে কেন যে দেরী করছে বুঝি না বাপু।'

দিনমজুরি-খাটা ছেলেদের মধ্যে একজন পারীকুট্টির বাঁধা একটা গান গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগল। সে গান শুধু কারুতাম্মাকেই ছুঁয়ে গেল আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ওর সারা দেহমন ভরে উঠতে লাগল।

দক্ষিণ দিকে নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদও নৌকো নামানোর দৃশ্য দেখতে উঁকি মারছিল। সাগর-মা প্রসন্ন রয়েছেন দেখা গেল। নৌকো-গুলো ঘিরেই লোকের ভীড়। সবার আগে চেম্পনকুঞ্জের নৌকো নামানো হবে। আয়ানকুঞ্জই প্রথমে একটা ডোকার ছাড়ল আর উপস্থিত সকলে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল। সমস্ত সমুদ্রতীর সেই আওয়াজে গম গম করতে লাগল।

রামন মুম্পন বলল, 'দাঁড় নাও চেম্পনকুঞ্জ।'

চেম্পনকুঞ্জ দাঁড় নিয়ে আগে মাথায় ঠেকাল। মনে মনে কি সমস্ত দেবদেবীকে স্মরণ করল! সকলে মিলে তারপর নৌকোটাকে ঠেলতে লাগল। বালির ওপর দিয়ে সর্‌সর্ করে সরতে সরতে নৌকো সমুদ্রে নামল। চাকী আর

কারুতাম্মা ওপর দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে চোখ বুজে সাগর-মাকে ডাকতে লাগল। যখন তারা চোখ খুলল তখন নৌকো ঢেউএর ওপর দিয়ে ওঠা-নামা করতে করতে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রামন মুপ্পন আর আয়ানকুঞ্জ তীরে দাঁড়িয়ে নৌকোটার হালচাল লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'নৌকোটার পয় আছে।'

একটু পরে রামন মুপ্পন জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম দেখছ হে আয়ানকুঞ্জ ?'

আয়ানকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'জোয়ার পশ্চিম দিকে তো ?'

'হ্যাঁ। নৌকো দক্ষিণে কাত হয়ে যাচ্ছে।'

চাকী নৌকো ভাসার ফলাফল জানতে ওদের কাছে এল। ও জিজ্ঞেস করল, 'কি আয়ানকুঞ্জদাদা, নৌকোটার পয় আছে তো ?'

সবজান্তার ভাবে আয়ানকুঞ্জ বলল, 'পয় আবার নেই ? আমি বলছি দেখে নিও, এবার থেকে তোমাদের ঘরে মা-লক্ষ্মী পা রাখলেন। তোমাদের সব অভাব ঘুচল।'

চাকী আর একবার খুব ভক্তি ভরে সাগর-মাকে নমস্কার করল। নৌকো ইতিমধ্যে প্রায় মাঝসমুদ্রে চলে গেছে। বিনা বাধায় সেটা তর তর করে ভেসে চলেছে।

কারুতাম্মা বলল, 'মা, দেখেছ আমাদের নৌকোটা আর সব নৌকোগুলোর ওপরে মাথা উঁচিয়ে যাচ্ছে !'

চাকী দেখতে দেখতে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। নৌকোটার চলনই আলাদা। কেমন সোন্দর দেখাচ্ছে।'

আয়ানকুঞ্জ বলল, 'তা আর বলতে! তোমরা কার নৌকো পেয়েছ সেটা তো দেখতে হবে। এমন প্রকাণ্ড নৌকো কি এ অঞ্চলে আর একটিও আছে। কাণ্ডানকোরানের সবকিছুই লক্ষ্মীমন্ত। ওর ওই বউটাকেই দেখ না—ঠিক যেন একতাল পাকা সোনা। অমন টুকটুকে সুন্দর একটা মেয়ে তুমি আমাদের জাতে আর খুঁজে পাবে না। তেমনি ওদের ঘরবাড়ি—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওদের এই সব কিছুর গোড়ায় হচ্ছে এই নৌকোটা। সেই নৌকো এখন তোমরা পেলে—তোমাদের সাতপুরুষের ভাগ্যি—মা-লক্ষ্মী এখন গট গট করে তোমাদের বাড়ি এসে ঢুকবেন।'

ইতিমধ্যে অন্য নৌকোগুলোও একটার পর একটা জলে নামল। সমুদ্রের ধার ক্রমে ফাঁকা হয়ে এল, শুধু দাঁড়িয়েছিল চাকী, কারুতাম্মা আর পারীকুট্টি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় পারীকুট্টির গা শির্ শির্ করছিল। দূরে নৌকোগুলো সমুদ্রের

বুকের ওপর দিয়ে তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। জেলেরা জলে জাল নামাতে শুরু করেছে।

পারীকুট্টি আস্তে আস্তে চাকীর দিকে এগিয়ে এল। কারুত্তাম্মা সরে গিয়ে মার পেছনে দাঁড়ালো। পঞ্চমী পারীকুট্টির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

পারীকুট্টি তার সেই পুরোনো প্রশ্নই করলো কিন্তু কারুত্তাম্মাকে নয়— চাকীকে :

'কিগো চাকী জেলেনী, মাছ আমার কাছে বিক্রী করবে তো?'

চাকী বলল, 'তোমার কাছে বিক্রী না করলে আর কার কাছে করব?'

পারীকুট্টির এই প্রশ্নের যেটা আসল উদ্দেশ্য চাকী সেটা বুঝতে পারল না। কিন্তু কারুত্তাম্মা তো জানে এ প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই নয়। এই প্রশ্নের মধ্যে ওর সমস্ত আবেগ, সমস্ত ভালোবাসা, ওর অন্তরের সবটুকু উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রয়েছে।

কারুত্তাম্মা মার পেছন থেকে বলল, 'মা, বাড়ি চল, আমার কেমন শীত শীত করছে।'

তাদের সমস্ত সাধ মিটেছে, নৌকো জলে নেমেছে—এখন পারীকুট্টিকে দুটো কথা না বলে চাকী চলেই বা যায় কি করে। তাই সে বলল, 'তোমার জন্যেই বাবা আমরা নৌকো নামাতে পারলাম। তুমি সাহায্য না করলে কিছুই হত না।'

পারীকুট্টি কিছু না বলে মৃদু হাসল। মার কথা শুনে কারুত্তাম্মা কিন্তু খুব খুশি হলো। যাক্ মা যে অন্ততঃ এইটুকু বলেছে সেটাও মন্দের ভাল। ও আরও ভাবল, মা যখন এইভাবে কথা বলেছে তখন পারীকুট্টির ধার নিশ্চয়ই শোধ করে দেবে।

চাকী একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, 'এই মাছের মরসুমটা শেষ হলেই তোমার টাকাটা ফেরৎ দেব।'

'না না, টাকা ফেরৎ দিতে হবে না, টাকা আমি ফেরৎ চাই না।'

'চাই না? কেন?'

'আমি তো টাকা ফেরৎ পাওয়ার জন্যে দিইনি।'

চাকী ওর কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু কারুত্তাম্মা বুঝতে পারল। আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আর ভয়ে ও যেন কেমন হয়ে গেল।

চাকীর মনে একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। ও আবার জিজ্ঞেস করল :

'টাকাটা নেবে না কেন বাবা?'

পারীকুট্টি এবার স্পষ্ট বলল, 'না, টাকা আমি ফেরৎ চাই না।'

তারপর একটুখানি থেমে বলল, 'কারুতান্না আমার কাছে একটা নৌকো আর জাল কেনার পয়সা চেয়েছিল আমি তা দিয়েছি। ও টাকা আর ফেরৎ নেব না।'

পারীকুট্টিকে এমনিভাবে সমস্ত খোলাখুলি বলতে দেখে কারুতান্না চোখে অন্ধকার দেখল। ওর মাথা ঘুরতে লাগল। চাকী পারীকুট্টির কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। ও শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কারুতান্নাকে শুধু শুধু টাকা দেবে কেন? ও তোমার কে?'

তারপর স্বরটাকে আর একটু চড়িয়ে শক্ত গলায় বলল, 'না না, এসব চলবে না বাপু, এসব আমি একেবারেই পছন্দ করি না। পয়সা তোমাকে ফিরিয়ে নিতেই হবে।'

পারীকুট্টি বুঝতে পারল চাকী তার এমনিভাবে বলাটা একেবারেই পছন্দ করেনি। কিন্তু ও চাকীর কথায় কোনও জবাব দিল না। চাকী পারীকুট্টিকে চুপ করে থাকতে দেখে গলার স্বর একটু নরম করে বলল, 'বাবা, তুমি হলে মোছলমান। আমরা হিন্দু জেলে। তোমরা দুজনে ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছ, একসঙ্গে বড় হয়েছ তা ঠিকই কিন্তু সে তো ছোটবেলার কথা। আমরা দেখেশুনে কারুতান্নাকে একটা ভাল জেলের ছেলের হাতেই তুলে দিতে চাই। তুমিও বাবা তোমার জাতের একটা মেয়েকে দেখে শুনে বিয়ে কর।'

তারপর একটু থেমে চাকী আবার বলল, 'তোমাদের এখন কাঁচা বয়স, ভাল-মন্দ বোঝার বয়স এটা নয়। এই বয়সে বদনামের ভাগী হওয়া কি ভাল? এই যে আমরা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলছি কেউ দেখে ফেললেই হল। যা-তা রটাবে এক্ষুনি। মানুষের কাজই তো পরের কেচ্ছা গেয়ে বেড়ানো।'

ওর বক্তব্য শেষ করে চাকী মেয়েকে ডেকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। তারপর কি যেন ভেবে পারীকুট্টির দিকে ফিরে দাঁড়াল। গলার সুরে স্নেহ ঢেলে দিয়ে বলল, 'টাকাটা কিন্তু তোমাকে নিতে হবেই বাবা।' বলে চাকী আবার বাড়ির দিকে ফিরল। কারুতান্না আর পঞ্চমী মার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। পারীকুট্টি তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

মা যা বলেছে তা সবই ঠিক। এমনি ভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি বলাই ভাল। কিন্তু মার ঐ কথাগুলো কারুতান্নার মনে যেন হাজার হাজার ছুঁচ কোটাতে লাগল আর সেই জ্বালায় ওর ভেতরটাও যেন জ্বলে যেতে লাগল। খানিকটা চলার পর কারুতান্না তার অজান্তে একবার পেছনে তাকাল। না তাকিয়ে ও পারল না। দেখল যে পারীকুট্টি সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কারুতান্না একমুহূর্ত ওর

দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। বাড়িতে যখন পৌঁছোলো তখন পারীকুট্টির গানের সুর শুনতে পেল। সমুদ্রতীর থেকে সেই সর্বনেশে গান ভেসে আসছে। গান তো নয় শুনলে যেন বুকের সমস্ত রক্তকণা দাপাদাপি শুরু করে দেয়। চাকী বলল, 'ছোঁড়াটার কি চোখে ঘুম নেই গা— ' তারপর কারুতাম্মার দিকে তাকিয়ে বলল :

'এখন কোনরকমে তোমাকে পার করতে পারলে বাঁচি বাছা।'

মার কথা শুনে মনে হল কারুতাম্মা যেন কোন অপরাধ করেছে। বাড়ির কারুরই যেন তার জন্যে মনে শান্তি নেই। এ কি অন্যায় দোষারোপ তার ওপর! রাগে-দুঃখে কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'আমি করেছিটা কি? শুধু শুধু তোমরা আমাকে দোষ দিচ্ছে কেন?'

চাকী মেয়ের কথার উত্তর দিল না।

বেশ খানিকটা সকাল হলে পর আবার চাকী আর মেয়েরা সমুদ্রতীরে এল ওদের নৌকোটা সমুদ্রের কতদূরে আছে দেখার জন্যে। নৌকোগুলো তখন ওদূরে মাঝ-সমুদ্রে। সমুদ্রের শান্ত অবস্থা দেখে মনে হয় আজ খুব মাছ উঠবে।

কারুতাম্মা চাকীকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ কী মাছ উঠবে মা?'

'রকমসকম দেখে তো মনে হচ্ছে আয়লা মাছ।'

'গোড়াতেই আয়লা মাছ! খুব ভালো লক্ষণ, না মা?'

'সব সাগর-মার দয়া মা।'

কারুতাম্মা তখন ছোট একটা মেয়ের মতো আদুরে গলায় মাকে বলল :

'মা, আমাদের নৌকোর মাছগুলো ছোট মিয়াকে বিক্রী করবে তো?'

চাকী মেয়ের কথা শুনে রাগ করল না। জিজ্ঞেসও করল না ছোট মিয়া তার কে? চাকীরও ইচ্ছে যে পারীকুট্টির কাছেই যেন মাছ বিক্রী হয়। কিন্তু ওর মনে একটা সন্দেহ উঁকি মারছে। ও মেয়েকে বলল, 'তোর বাবা কি তা করবে?'

কারুতাম্মা বলল, 'আমরা এক কাজ করব মা। নৌকো তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর কাছে দাঁড়াব—তুমি তখন বাবাকে বোলো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করব। এটা আমাদের করা উচিতও।'

পঞ্চমী তাই জলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নৌকো তীরে ভিড়লেই খবর দেবে।

কিন্তু আর একটা বাধা পড়ল। ওদের পাড়া-পড়শী মেছুনীরাও নৌকোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে নাল্লপেন্ন, কালিকুঞ্জ, কুঞ্জিপেন্ন আর

লক্ষ্মী। চেম্পনকুঞ্জের নৌকোর মাছগুলো পাইকিরি দরে না খুচরো দরে বিক্রী করা হবে তাই ওরা জানতে চায়। কুঞ্জিপেন্ন চাকীকে সে কথাই জিজ্ঞেস করল। অবশ্য মাছের ব্যবসায়ীদের কাছে মাছ পাইকিরি দরে বিক্রী করা একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। তাই যেসব মেছুনীরা দক্ষিণ দিকে মাছ ফিরি করতে যায় তাদের পাইকিরি ব্যবসাদারদের হাতে-পায়ে ধরতে হয়। কুঞ্জিপেন্ন বলল :

'এ আর আমি নতুন করে কি বলব চাকীদিদি, তুমি তো সব জানই।'

জেলেনীরা যে কি বলতে চায় চাকী বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারল। পাইকিরি মাছের ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কিনে বিক্রী করলে লাভ প্রায় কিছুই থাকে না। শুধু তাদের বাঁধা দরেই যে কিনতে হয় তা নয় তাদের গালি-গালাজও শুনতে হয় প্রচুর।

চাকী বলল, 'তা আমি কি করব বল ?'

নাল্লপেন্ন বেশ একটু আবদার করে বলল, 'তোমাদের ধরা মাছগুলো আমাদের কাছে খুচরো বিক্রী করবে ?'

চাকী সঙ্গে সঙ্গে কিছু জবাব দিতে পারল না। সকলেই পাড়া-প্রতিবেশী। ওদের দাবী কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু চাকী কি করে কথা দেয় ? মিনসে যদি রাজী না হয় ? শুধু তাই নয় পারীকুট্টিও মাছ চেয়েছে। কিন্তু সেকথা এদের কাছে তো বলা যায় না। চাকী তাই চুপ করে রইল।

কালিকুঞ্জ বলল, 'কি চাকীদিদি, কিছু ববল না যে! চেম্পনদাদা রাজী হবে কি না-হবে ভাবছো বুঝি ? তা তুমি একটু চেপে ধরলেই হবে। একদিন তুমিও তো আমাদের মত মাথায় ঝুড়ি বয়ে নিয়ে মাছ বিক্রী করেছ। এখন না হয় নৌকো আর জাল কিনছে। আমাদের দুঃখুটা তুমি ছাড়া আর কেই বা ভাল ভাবে বুঝবে বল ?'

'তা তো ঠিকই'—চাকী ঘাড় নাড়ল।

লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বোন পুবদিকে আর মাছ ফেরি করতে যাবে না ?'

'কেনরে, একথা কেন ? দশটা নৌকো কিনলেও যে চাকী সেই চাকীই থাকবে।' তারপর একটু অসহায় ভাবেই বলল—

'কিন্তু ঐ ড্যাকরা মিনসে কি মাছ খুচরো দরে বিক্রী করতে রাজী হবে ?'

নাল্লপেন্ন বলল, 'তুমি বলবে—তুমি বললেই হবে।'

কালিকুঞ্জ কারুতাম্মাকে বলল, 'তুইও তোর বাবাকে একটু বলিস মা।'

'আমি পারব না—' কারুতাম্মা স্পষ্ট জবাব দিল।

পঞ্চমী কিন্তু বলল, 'আমি বাবাকে বলব। নৌকো তীরে এলেই পাই-কেররা ভীড় করবার আগেই বলব।'

পঞ্চমীর মনে মনে একটা মতলব ছিল। নৌকো তীরে ভিড়লেই বাবার কাছ থেকে একঝুড়ি মাছ নিয়ে শুকিয়ে কিছু টাকা জমানোর ইচ্ছে তার আছে। পাইকেররা আগে-ভাগে সব নিয়ে গেলে এ সুযোগ আর ঘটবে না।

'দেখি কি করি—' চাকী খুব একটা দোটানার মধ্যে পড়ে বলল। কিন্তু ও যে কিছুই করতে পারবে না তা ও বেশ ভাল করেই জানে। কিন্তু এইটুকুও পাড়াপড়শীর জন্যে যদি না করে তাহলে পাঁচজনেই বা বলবে কি।

দুপুর নাগাদ সমুদ্রতীর পাইকারী আর খুচরো মাছের কারবারীতে আর ছোটছোট ছেলেপিলের ভীড়ে ভরে গেল। ঘরমুখো নৌকোগুলোর মাথার ওপর কাকের দল চক্কর খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। জালতোলা আর ঝাড়ার সময়ই বেশি করে তাদের কা-কা ডাক শোনা যাচ্ছে। কি মাছ উঠেছে তাই জানার আগ্রহই সকলের। কাদের জেলের মনে হলো ছোট মাছ কিছু উঠেছে। যাই উঠুক না কেন প্রচুর মাছ যে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমনি ভাবে যখন সকলে বলাবলি করছে তখন দুটো সিন্ধুশকুন পশ্চিম দিক্ থেকে পুব দিকে উড়ে এলো, তাদের ঠোঁটে মাছ। সকলেই পাখি দুটোর দিকে হাঁ করে তাকাতে লাগলো তারপর একজন চীৎকার করে উঠল, 'মাতি, মাতি মাছ উঠেছে।'

দূর থেকে নৌকোগুলো দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তারা পশ্চিমদিক থেকে পুব দিকে এগিয়ে আসছে। পঞ্চমী বাড়ির দিকে ছুটল—

'মা, মা, মাতি উঠেছে—মাতি!'

কারুতাম্মা আর চাকী দুজনেই মহাস্ফূর্তিতে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। চাকী হাতজোড় করে খুব ভক্তিভরে সাগরদেবীকে প্রণাম করল তারপর দুজনে মিলে সমুদ্রের দিকে ছুটল।

নৌকোগুলো তরতর করে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে কোনটা ওদের নৌকো তাই নিয়ে মা আর মেয়ের মধ্যে তর্ক শুরু হল।

মাতি উঠেছে শুনে সমুদ্রতীর খরিদ্দারে ভরে গেল। কুঞ্জিপেন্ন, নাল্লপেন্ন, কালিকুঞ্জ আর লক্ষ্মী চাকীকে ঘিরে দাঁড়ালো যদি চাকী-দিদি তাদের কিছু সাহায্য করে। পঞ্চমী একটা ঝুড়ি নিয়ে কাছে রাখল। সকলেই উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় ঢেউএর তালে তালে ওঠানামা করতে করতে একটা নৌকো আর সব নৌকোগুলোকে ছাড়িয়ে পাখির মতো সাঁ সাঁ করে

তীরের দিকে উড়ে আসছে ওরা দেখতে পেল। নৌকোটা যে মাছে বোঝাই তা দূর থেকেই এরা বুঝতে পারল।

নৌকোগুলো একটার পর একটা তীরের দিকে দ্রুতগতিতে ফিরছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন নৌকোর শোভাযাত্রা চলেছে। ওপরে সিন্ধুশকুনরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পেছনে সারবেঁধে আসছে নৌকোগুলো। সামনের নৌকোটা যেন অন্য নৌকো-গুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

সামনের নৌকোয় হালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে চেম্পনকুঞ্জ। ঠিক দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে, মনে হচ্ছে যেন ও উড়তে উড়তে আসছে। এত জোরে দাঁড় টানছে যে ও যেন নৌকোতেই নেই, আকাশে উড়ছে। অত জোরে দাঁড় টানার ফলে জলের ধারা গোল হয়ে আকাশে ছিটিয়ে পড়ছে।

কালিকুঞ্জ বলল, 'ঢেউ না কেটে নৌকোটা যেন পাখির মত সাঁই সাঁই করে ছুটে আসছে, না! নৌকোটার চলনটাই বা কি সুন্দর!'

সকলেই চেম্পনকুঞ্জের নৌকোটা নিয়ে বলাবলি শুরু করল। চাকী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, নৌকোর প্রশংসা শুনে গর্বে ওর বুক ফুলে উঠল। তবু বিনয় করে বলল, 'তোমরা যে সব কি বল।'

নৌকোটা তীরে পৌছল বলে। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের চোখমুখের ভাব লক্ষ্য করে চাকী অবাক হয়ে গেল। চেম্পনকুঞ্জ যেন আর সে চেম্পনকুঞ্জ নেই।

চাকী বলল, 'মানুষটার চোখমুখের চেহারা দেখ, কেমন বদলে গেছে। ঠিক যেন সাগর-মার যুগ্যি ছেলে।'

নৌকোটা ইতিমধ্যে তীরে ভিড়েছে। জেলেরা দাঁড় রেখে লাফ দিয়ে নৌকোটাকে ঠেলে বালির তীরে তুলল। কতকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে নৌকোটাকে ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে পঞ্চমীও ছিল। চেম্পনকুঞ্জ রেগেমেগে এক লাফ দিয়ে তীরে নামল। ওর ঐ যমদূতের মতো মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে বাচ্চাগুলো চীৎকার করে পালিয়ে গেল। পঞ্চমী কিন্তু নড়ল না। ওর বাবার কাছে ওর ভয় কি? চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু চীৎকার করে উঠল:

'এই, তোরা কেউ আমার নৌকোর কাছে মাছ কুড়োতে আসবি না।'

পঞ্চমীকে সামনে দেখতে পেয়ে ওকে জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। 'ও মাগো' বলে চীৎকার করে পঞ্চমী ছিটকে পড়ে গেল। পঞ্চমীকে পড়ে যেতে দেখে চাকী আর কারুতাম্মা ছুটে এসে ওকে তুলে ধরল। ভীড়ের মধ্যে এক জেলেনী রকমসকম দেখে বলে উঠল:

'ওরে বাবা একি! এ যে যমদূত গো! কি পিচেশ রে বাবা! লোকটার মাথায় ভূত চাপল নাকি?'

পঞ্চমীর খুব সাধ ছিল যে কুঁচো মাছ কুড়িয়ে শুঁটকি করে কিছু টাকা করবে। টাকাটা কি আর ও নিজে খরচ করবে? সংসারের পেছনেই যাবে। বাবার মেয়ে বলেই ও বাবার নৌকোর কাছে কুঁচো মাছ কুড়োতে গিয়েছিল। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের হল কি? ও কি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল? নিজের মেয়েকে ও দেখতে পেল না, এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিল? এমন ভুল কি কোন বাপে করে?

নৌকোর মাছ সবই তো সাগর-মার দান—কেউ চাষও করেনি বা মাছ-গুলোকে বড় করেও তোলেনি। তাই জাল ঝাড়ার সময় আশেপাশে যে মাছ ছড়িয়ে পড়ে তাতে গরীব লোকদেরও একটা দাবী আছে। বংশপরম্পরায় সমুদ্র-তীরের জেলেদের মধ্যে এই নিয়মই চলে আসছে।

'ও মা, কি যমদূত রে, কি পিচেশ রে, বাবা'—বলে চাকী চীৎকার করে পঞ্চমীকে কোলে তুলল। চাকী আর কারুতাম্মা দুজনে মিলে পঞ্চমীর বুকে দলাই-মলাই শুরু করলো। পঞ্চমী আঘাতের চেয়ে মনে কষ্ট পেয়েছে বেশি। বাবা যে ওকে এমনি ভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে তা ও কল্পনাই করতে পারেনি।

পাইকিরি ব্যবসাদারেরা ইতিমধ্যে নৌকো ঘিরে তার ওপর উঠে পড়েছে। পারীকুট্টি আছে সকলের আগে। চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু এমন ভাব করল যেন কাউকেই চেনে না। কাদের মিয়া জিজ্ঞেস করল:

'কি রকম হে চেম্পনকুঞ্জ, কত টাকায় বিক্রী করবে?'

কুঞ্জিপেন্ন আর লক্ষ্মী ততক্ষণে নৌকোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওদের মাছ দেবে বলেছিল পঞ্চমী কিন্তু সে ওখানে পড়ে রয়েছে, চাকীও মেয়ের কাছে বসে। কুঞ্জিপেন্ন তাই অন্য জেলেনীদের বলল—

'চল্ আমরাও গিয়ে দর জিজ্ঞেস করি।'

নাল্লপেন্ন বলল, 'আরে ছি! ছি! ওই পিচেশটার সঙ্গে আবার দরদস্তর।'

ইতিমধ্যে অন্য নৌকোগুলোও একটার পর একটা তীরের কাছে আসতে শুরু করেছে। চেম্পনকুঞ্জ তাই আগে মাছ বিক্রী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পারীকুট্টি জিজ্ঞেস করল, 'কি গো চেম্পনকুঞ্জ, আমার কাছে মাছ বিক্রী করবে তো?'

চেম্পনকুঞ্জ এমনভাব করল যেন পারীকুট্টিকে সে জীবনে কোনদিন দেখেই নি। সেই ভাবেই বলল, 'বলি নগদ টাকা আছে? আমার টাকা চাই।'

ওর বলার সঙ্গে সঙ্গে কাদের মিয়া ১০০ টাকার কয়েকখানা নোট বার করে চেম্পনকুঞ্জের হাতে গুঁজে দিল।

দরদস্তুর হয়ে গেল দেখে পারীকুট্টি অন্য নৌকোগুলোর কাছে ছুটে গেল। সব নৌকোর মাছই তখন বিক্রী হয়ে গেছে। পারীকুট্টি তখন হতাশ হয়ে ওর ঝাঁপের দিকে ফিরে চলল, অদূরে বসে কারুতাম্মা বিষণ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে তাই দেখতে লাগল। ও বুঝতে পারল যে পারীকুট্টির হাতে নগদ টাকা নেই।

কারুতাম্মা মাকে বলল, 'ছোট মিয়া মাছ পেল না মা।'

চাকী তক্ষুনি পারীকুট্টির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'বাবা, তুমি মাছের দরদস্তুর করলে না!'

'করেছি।'

'তাহলে কি হল?'

পারীকুট্টি এর জবাব দিল না। সেদিন ও কোনও নৌকো থেকেই মাছ কিনতে পারেনি অথচ এত মাতি মাছ হালে এর আগে আর কোন দিন ওঠেনি। পারীকুট্টিকে চুপ করে থাকতে দেখে চাকী সব বুঝতে পারল। চেম্পনকুঞ্জ যে আর সে চেম্পনকুঞ্জ নেই তাতো ও স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। ও বলল, 'বাবা, কারুতাম্মার বাপ অত মাছ একসঙ্গে দেখে পিচেশ হয়ে উঠেছে।'

পারীকুট্টি বলল, 'আমার কাছে কিছু টাকা ছিল। বাকিটা পরে দিতাম।'

'ও, তাই বুঝি কিনতে পারলে না?'

'হ্যাঁ—যাক্, না পেলে আর কি করব।'

পারীকুট্টি চলে গেল। ওকে চলে যেতে দেখে কারুতাম্মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল—ওর মনটা উসখুস করতে লাগল। পারীকুট্টিকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলতে পারলে ভালো হত কিন্তু এখানে বসে ওর সঙ্গে কথা বলাটা কি ঠিক হবে? অনেকদিন আগে ছোট মিয়ার প্রশ্নের জবাবে সে যা বলেছিল এবার তাই ঘটল। সেই কথাগুলো এখনও তার কানে বাজছে—

'নৌকো আর জাল কিনে আমাদের কাছে মাছগুলো বিক্রী করবে তো?'

'ভালো দাম পেলেই করব।'

মেছুনীরা কেউই চেম্পনকুঞ্জের কাছ থেকে মাছ পেল না। কালিকুঞ্জ আর কুঞ্জিপেন্ন মাছ না পেয়ে চেম্পনকুঞ্জকে খুব গালাগালি করতে করতে পাইকিরি ব্যবসাদারদের কাছ থেকে মাছ কিনল।

চেম্পনকুঞ্জ জেলেদের মজুরি চুকিয়ে দিয়ে জাল ধুয়ে শুকোতে দিল তারপর বাড়ির দিকে রওনা দিল। ওর ট্যাঁক ভর্তি টাকা। জীবনে যেন ও এক নূতন

আলোর সন্ধান পেয়েছে। যেন ও জীবনের এক নতুন পথে পা ফেলতে শুরু করছে। রাত তিনটে থেকে এই একটু আগে পর্যন্তও ও ছিল গরীব। হাড়-ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রম ওকে করতে হয়েছে। কিন্তু এখন যে চেম্পনকুঞ্জ বাড়ি ফিরছে সে পরিশ্রান্ত, ক্লান্তদেহ, নুয়ে-পড়া এক গরীব জেলে। এখন ও এক নতুন চেম্পনকুঞ্জ, হাতে ওর এখন অনেক টাকা, গায়ে ওর এখন অসীম শক্তি, মনে ওর নতুন আনন্দ আর প্রেরণা।

আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে চেম্পনকুঞ্জ বাড়ি ফিরল। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখে চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সকলেই গম্ভীর হয়ে বসে আছে। চেম্পনকুঞ্জ ওর গেঁজেটা চাকীর চোখের সামনে খুলে ধরল—কিন্তু টাকা দেখে চাকীর মনে কোনও সাড়াই জাগল না।

ও বলল, 'কি হবে টাকায়? কার জন্যে টাকা শুনি?'

'তার মানে?'

'পঞ্চমীর বুকের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।' পঞ্চমী তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। চেম্পনকুঞ্জ ওকে তুলে ধরল, ওর বুকটা লাল হয়ে একটা জায়গা ফুলে গেছে। ও জিজ্ঞেস করল:

'তুই ছুঁড়ি ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াতে গিয়েছিলি কেন?'

কেন যে পঞ্চমী দাঁড়িয়েছিল চাকী সে-কথা সবিস্তারে বলল। শুনে চেম্পন-কুঞ্জের মেয়ের ওপর স্নেহ আরও বেড়ে গেল। আহা! মেয়েটা টাকা জমাতে চেয়েছিল। এতো খুব ভালো কথা।

'কাল থেকে তোকে আমি একঝুড়ি করে মাছ দেব—' চেম্পনকুঞ্জ স্নেহের স্বরে বলল।

চাকী তখন পারীকুট্টির কথা বলল। পারীকুট্টির সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করাটা ঠিক হল? পারীকুট্টি টাকা দিয়ে সাহায্য না করলে ঐ জাল আর নৌকো কি কোনদিন ওরা কিনতে পারতো? একটার পর একটা চাকী বলে চলল।

ওর কথা বুঝতে না পারার ভান করে চেম্পনকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল:

'কি খারাপ ব্যাভারটা আমি করেছি?'

'ওর কাছে মাছ বিক্রী করলে না কেন?'

'ওর কাছে মাছ বিক্রী করলে সব টাকাটা পাব না। তাহলে ব্যবসা চলবে কি করে? নৌকোর লোকেদের পয়সা দিতে হবে না? তা ছাড়াও ওকে মাছ বিক্রী করলে আমাদের ক্ষেতি হতো। ও ওর পাওনা টাকাটা কেটে নিত।'

'তা ও আমাদের যে টাকাটা দিয়েছে সে টাকা ও ফেরৎ চাইবে না ? এতো তোমার অন্যায় কথা।'

কারুতাম্মা এতক্ষণ মা-বাপের কথা শুনছিল। বাপের কথা শুনে ওর খুব রাগ ধরল। ও ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল—

'ছোট মিয়ার আর টাকার দরকার কি ? সে তার কারবার বন্ধ করে দিয়েছে।'

·

সে দিনই সন্ধ্যেবেলায় আচ্চকুঞ্জের বাড়িতে ওদের জেলে আর জেলেনীর মধ্যে খুব একচোট ঝগড়া হল।

জেলেনী বলল, 'কি গো, চেম্পনকুঞ্জদাদা না তোমার ছোটবেলাকার বন্ধু। তোমাকে তার নৌকোয় কাজ দেবে বলে খুব যে তড়পাচ্ছিলে তার হল কি ?'

আচ্চকুঞ্জও ছাড়বার পাত্র নয়। ও বলল, 'তুইও তো দেখলাম ঝুড়ি নিয়ে চাকীর পেছনে ঘুরছিলি।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, মানুষের কথা আর বলিসনি। টাকা পেলেই সব ভুলে যায়।'

নাল্লপেন্ন ওর জেলের কথায় সায় দিল।

আচ্চকুঞ্জ তারপর তার সেই আগের কথাই আবার ঘুরে ফিরে বলল—

'আচ্ছা দেখি, আমিও একটা নৌকো আর জাল কিনতে পারি কিনা।'

এবার কিন্তু নাল্লপেন্নর তার স্বামীর কথায় খুব একটা বিশ্বাস হল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চেম্পনকুঞ্জ সত্যিই ভাগ্যবান পুরুষ। যত বেশি মাছ ওর জালে ধরা পড়ে তত আর কারুর জালেই ধরা পড়ে না। অন্য জেলেরা যা পায় তার ডবল পায় ও। ও জাল ফেললে মাছ উঠবেই, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার !

রাতে টাকা গুণে রাখবার সময় চাকী বলে :

'মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে এবার।'

চেম্পনকুঞ্জ এর কোনও সোজাসুজি উত্তর দেয়না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে চাকী খোলাখুলিই জিজ্ঞেস করে, 'কি গো, চুপ করে আছ যে? মতলবটা কি তোমার? মেয়ে তাহলে অমনি ধিঙ্গি হয়েই থাক।'

তবু চেম্পনকুঞ্জ কোনও কথা বলে না। টাকা জমানো ছাড়া ও এখন অন্য আর কিছুতে মাথা ঘামাতে চায় না। ওর ধারণা, টাকা থাকলে মেয়ের বিয়ে যেদিন খুশি দিতে পারবে।

নৌকো জলে নামানোর জন্যে যা-যা দরকার তা সবই চেম্পনকুঞ্জ কিনেছে। বর্ষাই হোক্ বা ঝড়-তুফানই উঠুক যে-কোনও সময় ও সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারে। তার জন্যে দরকারী সব জিনিস ওর আছে।

পারীকুট্টির আড়তের ঝাঁপ আজকাল প্রায়ই বন্ধ থাকে। হাতে টাকা না থাকায় কেনাবেচা কিছুই সুবিধেমত হচ্ছে না। ব্যবসাপত্র কিছু হচ্ছে না দেখে ওর বাবা আবদুল্লা একদিন ওকে খুব ধমকাল। টাকার কাঁড়িগুলো সব ওই জেলেনী মেয়েটার পেছনে ঢেলেছে বলে খুব একচোট গালিগালাজও করল। বাপছেলের ঝগড়া শুনে কারুতাম্মা বেড়ার আড়ালে এসে দাঁড়াল। সব শুনে ওর মনে ভীষণ লজ্জা আর ঘেন্না হল।

তক্ষুনি মা বাড়ি আসতেই পারীকুট্টির টাকাটা ফেরৎ দেওয়ার জন্য খুব পেড়াপেড়ি করতে লাগলো। আবদুল্লা মিয়া তার ছেলেকে যা যা বলেছে তাও মাকে বলল।

'এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে মা? কিন্তু এটা কি সত্যি নয় মা? ছোট মিয়া কি তার সব টাকা আমাদের দিয়ে দেয়নি?'

মেয়ের তাগাদায় বিরক্ত হয়ে চাকী চেম্পনকুঞ্জকে টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা বলল।

'আচ্ছা, আচ্ছা, টাকাটা ফেরৎ দোব'খন—অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে' — বলে চেম্পনকুঞ্জ তখনকার মতো চাকীর মুখ বন্ধ করল। তারপর থেকে যখনই পারীকুট্টির টাকাটা ফেরৎ দেওয়ার কথা ওঠে তখন ও রোজ ওই একই কথা বলে চাকীকে থামিয়ে দেয়। তারপর নিজের কথায় আসে—

'এখনও আর একটা নৌকো আর জাল কিনতে হবে। জায়গা-জমিও কিছু কিনতে হবে—ছোটখাটো একটা বাড়ি তুলতে হবে। হাতে কিছু পয়সা রাখতে হবে তারপর অন্য ব্যবস্থা। সারা জীবনটাই তো খেটে মরলাম। কাণ্ডানকোরানের মতো একটু আয়েসে থাকব না?' তারপর একটু সুর নরম করে বলে:

'তোকেও একটু মোটাসোটা করতে সাধ যায়।'

চাকীর কথাটা ভালই লাগে। মুখে কিন্তু বলে, 'হ্যাঁ—আমার গায়ে আর মাস লেগেছে।'

'আরে দেখই না তোকে আমি কি রকম মোটা করে দিই।'

চেম্পনকুঞ্জের কথাবার্তার ধরনটাই বদলে গেছে। আগে তাকে এমনি-ভাবে কথাবার্তা বলতে চাকী কোনদিন শোনেনি। জীবনে সুখভোগ করব আর তার জন্য কতরকম জল্পনা-কল্পনা করা এ যেন একেবারে নিছক একটা নতুন কিছু বলে চাকীর মনে হয়। ও তাই স্বামীকে বলে—

'এই বুড়ো বয়েসে আবার আয়েসে থাকবে কি গা? বলি এসব মতলব পেলে কোত্থেকে? কেউ কি শিখিয়ে দিয়েছে নাকি?'

'আরে তুই মেয়েমানুষ, তুই এসব কি বুঝবি। বয়সকালেও সুখে থাকা যায়। গিয়ে একবার ওই কাণ্ডানকোরানকে দেখে আয়-না তাহলেই বুঝতে পারবি সুখে থাকা কাকে বলে।'

বুড়ো বয়সে এই সব আয়েসটায়েসের কথা বলে মিনসে যেন একটা খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে এমনিভাবে ভর্ৎসনার চোখে চাকী চেম্পনকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইল।

চেম্পনকুঞ্জ বউএর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে চাকী ওর কথায় একেবারেই সায় দিচ্ছে না। তখন বলল:

'তুই কি জানিস রে মাগী। কাণ্ডানকোরানের জেলেনীকে দেখলে বুঝতে পারতিস। সে তো পেরায় তোরই বয়সী, কিন্তু সেজেগুজে কি সোন্দর হয়ে থাকে যদি দেখতিস একবার। চুল বাঁধারই বা তার বাহার কত! কপালে গোল করে ফোঁটা কাটা আর পান খেয়ে ঠোঁট ছুটি লাল টুকটুক্ করছে অষ্টপ্রহর। দেখতে ঠিক একতাল কাঁচা সোনার মতো। ওদের জেলে-জেলেনীকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন জোয়ান বয়সের ছুটো ছোঁড়াছুঁড়ি।'

চাকী বলল, 'তা আমাকেও কি তা'হলে ওই রকম কচি খুকিটির মতো সেজেগুজে থাকতে হবে নাকি?'

'তা দোষ কি?'

'মরণ আর কি? আমার বাপু লজ্জা করবে।'

'কেন, লজ্জার কি আছে?'

চাকী লজ্জায় কুঁচকে গিয়ে বলল, 'আমার দ্বারা ওসব হবে না বাপু।'

চেম্পনকুঞ্জ ছাড়ল না। ও আরও রসিয়ে রসিয়ে কাণ্ডানকোরানদের গল্প বলতে শুরু করলো। ওদের বাড়ির মতো এত ভাল খাবার ও আর কোথাও খায়নি। ওদের বাড়ির রান্নার যেন একটা আলাদা সোয়াদই আছে। ঠিক যেন অমির্তি! আর ওদের কত্তাগিন্নীর ভালবাসাটাই বা কি কম! যেন নতুন বিয়ে করা বর-বউ। যেভাবে ওরা নিজেদের মধ্যে ছুটোপুটি খুনসুটি করে তাতে মনে হয় যেন এই সেদিন বিয়ে হয়েছে।

'শোন্ তাহলে একদিনের কথা। আমার অবিশ্যি দেখে নিজেরই লজ্জা করছিল। একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি ওরা একজোড়া ছোঁড়াছুঁড়ির মতো ছুজন ছুজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।'

চাকী কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠল, 'ছিঃ ছিঃ, রামচন্দর, এসব কি কথা। তোমার মুখের দেখছি একটুও আগঢাক নেই গা।'

'আরে রামচন্দর কি? ওরা ঠিকই ছুটো জোয়ান ছোঁড়াছুঁড়ি। সব সময় হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি এই নিয়েই আছে।'

'তা ওদের ছেলেপুলে নেই?'

'হ্যাঁ, একটা মাত্তর ছেলে।' তারপর চাকীর দিকে তাকিয়ে বলল:

'তোকেও ওই কাণ্ডানকোরানের বউ পালীকুঞ্জের মত মোটা করে তুলব। আর আমরাও ওদের মতো হাসি গল্প করে সময় কাটাব।'

সত্যি কথা বলতে কি অমন একটা সাধ চাকীরও যে নেই তা নয়। নতুন

বিয়ে-করা বর-বউ এর মতো জড়াজড়ি করা, চুমু খাওয়া সবই তার ভাল লাগে কিন্তু বাইরে সে তা প্রকাশ করল না। ও বলল অন্য কথা :

'নিজের শরীরটার দিকে একটু নজর দাও তো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাতো দিতেই হবে। আমার শরীরটা ভাল হলে তবে তো আর সব হবে'—বলে চেম্পনকুঞ্জ একটু হাসল। ভবিষ্যৎ জীবনের সেই সুখের ছবিগুলো যেন ও তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। চাকী হঠাৎ কি মনে করে রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি ঐ মাগীটাকে দেখে যেন খুব মজে গেছ বলে মনে হচ্ছে।'

'তা কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েটা এমন সোন্দরী যে, যে কেউ ওকে দেখে পাগল হয়ে উঠবে।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল :

'লোকটার বরাতটা সত্যিই খুবই ভাল। সবই সাগর-মার কেরপা। জমি-জমা বাড়িঘরদোর হলে পর নতুন বর বউ-য়ের মতো আমরাও হেসে খেলে কাটাব।

'মেয়ে দুটোকেও তখন পার করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সেইরকম তো আমারও ইচ্ছে এখন সবই সাগর-মার দয়া।'

চাকীর মনে একটা ক্ষোভ আছে সে দেখতে সুন্দর নয়। চেম্পনকুঞ্জ বুঝতে পেরে বলল, 'তার জন্যে ভাবিস না। দেখনা তোর গায়ে কেমন গত্তি লাগিয়ে দিই।'

'কিন্তু তদ্দিনে যদি মরেই যাই।'

'দূর মাগী—বাজে বকিসনি।'

ওদের এইরকম সুখালাপের কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সমুদ্রের রঙ বদলে গেল। সমুদ্রের নীল জল লাল হয়ে গেল। একে জেলেরা সমুদ্রদেবীর ঋতুস্রাব বলে। এ সময় মাছ ধরার নিয়ম নেই। চেম্পনকুঞ্জ মহা অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। দুতিনদিন ঠায় বেকার বসে। ওর ভয়ানক অসহ্য লাগল। মাঝ-সমুদ্রে বঁড়শী ফেললে কেমন হয় ভাবতে লাগল। বঁড়শী ফেলে মাছ ঠিকই পাওয়া যাবে।

ও নৌকোর জেলেদের ডেকে এ নিয়ে কথাবার্তা বলল। জেলেরা ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। সমুদ্রে তারা এক-আধবার বঁড়শী যে ফেলেনি তা নয় কিন্তু সাগর-মার ঋতুস্রাবের সময় সমুদ্রে কেউ আজ পর্যন্ত নামেনি। তারা তাই চট করে কোনও জবাব দিতে পারল না। সকলেই চুপ করে রইল। ওদের চুপ থাকতে দেখে চেম্পনকুঞ্জের মেজাজ চড়ে গেল। ও ওদের শাসিয়ে বলল :

'বেশ তাহলে আমিও বলে দিচ্ছি, তোরা যদি না পারিস তো উপোস করে মর্। ধার আমি তোদের দিতে পারব না।'

এভাবে উপোস যে কতদিন চলবে তার কি কিছু ঠিক আছে। যার যা হাতে জমেছিল সব খরচ হয়ে গেছে। এই সময় জেলেদের বড় দুর্দিন। দিনমজুরখাটা জেলেরা এই সময় নৌকোর মালিকদের কাছে ধার চেয়ে চেয়ে বিরক্ত করে। মালিকদের হাতেও এই সময় খুব কিছু একটা পয়সা থাকে না।

আশেপাশের বাড়িতে সব উপোস দিয়ে পড়ে আছে—দিনে একবারও হাঁড়ি চড়ে কি না চড়ে। এদের মধ্যে আচ্চকুঞ্জের অবস্থা খুবই খারাপ—নৌকো আর জাল কিনবে বলে ওইই খুব তড়পাচ্ছিল এখন বেচারা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ভয়ানক মুশকিলে পড়ল।

একদিন বেচারা আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে ঝুড়ি ঝাড়া ঝেড়ে যে কটা শুঁটকি মাছ পেল তা বিক্রী করে কিছু কাগ্‌গা* কিনে সেদিনটা কোনও মতে কাটাল। কিন্তু তার পরের দিন আর চলে না। ওদের কর্তাগিন্নীর মধ্যে বেশ একচোট ঝগড়া আরম্ভ হল। রাগের চোটে আচ্চকুঞ্জ অবাধ্য বউকে দু ঘা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল। বেচারী নাল্লপেন্নর বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে ফেলে বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না। ও তাই বসে বসে আচ্চকুঞ্জকে গালাগালি করতে লাগল—

'ড্যাকরা মিনসে, এই যে বেরোল এখন সোজা গিয়ে চা-খানায় ঢুকবে। আমার আর জানতে কিছু বাকি নেই! মুখপোড়া মিনসে···!'

বউএর কথায় কান না দিয়েই আচ্চকুঞ্জ বেরিয়ে গেল। নাল্লপেন্ন ভাবল নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করবে। বেচারী সন্ধে পর্যন্ত ওর পথ চেয়ে বসে রইল। আচ্চকুঞ্জ তখনও ফিরল না দেখে ও একটা ভাঙা কাঁসার গ্লাস নিয়ে চাকীর কাছে গেল। গ্লাসটা বাঁধা রেখে একটা টাকা দিতে অনুরোধ করল। চাকী গেলাশটা রেখে ওকে একটা টাকা দিল। সব ঘরেই হাঁড়ি চড়ছে না তাই নাল্লপেন্ন টাকা ধারের খবর শুনে লক্ষ্মী ওর বাচ্চা মেয়েটার কানের দুল দুটো নিয়ে এসে চাকির কাছে পড়ল। তারপর জেলেনীরা একটার পর একটা চাকীর কাছে ধন্না দিয়ে ওকে বিরক্ত করতে লাগল। চাকীর হাতেই 'বা এতটাকা কোথেকে আসবে যে ধার দেবে। টাকা নেই বললে কেউ বিশ্বাসও করে না। তাই যখন গত বছর মান্নারশালার মেলা থেকে কেনা কাঁসার থালাটা নিয়ে কালিকুঞ্জ চাকীর কাছে উপস্থিত হল তখন চাকী আর তার রাগ চাপতে

* একরকমের তরকারী

পারল না। ও একটু বিরক্ত হয়েই বলল:

'তোমরা যে সব এখানে এসে ধন্না দিচ্ছ তা আমার কি টাঁকশাল আছে যে টাকা বের করে দেব? না টাকা মাটিতে পুঁতে রেখেছি যে খুঁড়ে বার করে দেব?'

কালিকুঞ্জ চাকীর কাছে এমনি জবাব আশা করেনি তবুও ও অনুনয় করে বলল, 'বাচ্চাগুলোর পেটে সকাল থেকে একটাও দানা পড়েনি দিদি, তাই এসেছি।'

চাকী সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সকলেরই দেখছি কারুতাম্মার বাপের টাকাটার ওপর নজর। কোন উব্‌গারে কেউ নেই আর এখন সব টাকা দাও টাকা দাও করে বিরক্ত করে খাচ্ছে। ঐ যে কথায় বলে না—কাজের বেলায় কাজী আর কাজ ফুরোলেই পাজী।'

কালিকুঞ্জ একটু অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলল, 'ওমা! আমরা আবার তোমাদের কি ক্ষেতি করেছি দিদি?'

'না না তোমরা কেউ কিছু করনি। সব ভালোমানুষ। এখন যাও নিজেদের পথ দেখ। আমার হাতে একটা পয়সাও নেই।'

'তা পয়সা না হয় নাই দিলে কিন্তু তুমি এমন করে কথা বলছ যেন আগে আমাকে চিনতেই না!'

'তা হক্ কথা বলব এতে আর চেনাচিনির কি আছে!'

কালিকুঞ্জের এবার রাগ হল। বলল, 'তোমাদের টাকাপয়সা আর হল কদ্দিন শুনি? বড় যে দেমাক দেখাচ্ছ।'

'তা তুইই বা এত কথা বলছিস কেন? তোর কি হিংসে হচ্ছে নাকি?'

বাস, সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হল। কারুতাম্মা ঘরে ছিল, ও ছুটে এসে দুজনের ঝগড়া থামাল। ঝগড়াকে ওর খুব ভয়। ঝগড়া বাড়লে হয়তো কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। ও কালিকুঞ্জের হাতে-পায়ে ধরে ওকে শান্ত করাল। কালিকুঞ্জ আর কিছু না বলে থালা নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে গেল।

কারুতাম্মা রাগ করে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মা, তুমি আজকাল এত মেজাজ দেখাও কেন?'

'মেজাজ না দেখিয়ে উপায় আছে? দেখছিস্ না সব এসে যেন গায়ের মাংস খুবলে খাচ্ছে!'

'তোমাকে আর বাবাকে দেখে সত্যিই আমার অবাক লাগছে। নৌকো আর জাল কেনার পর থেকে তোমরা দুজনেই যেন কেমন বদলে গেছ।'

সেদিন রাত্রে চেম্পনকুঞ্জ খেতে বসলে পর চাকী ওদের আশেপাশের বাড়ির সব খবর চেম্পনকুঞ্জকে দিচ্ছিল। খবর মানে তাদের সব উপোস দিয়ে পড়ে থাকার কথা। সেদিন ওদের বাড়ি ছাড়া আর কারুরই বাড়ির উনুন জ্বলেনি।

চেম্পনকুঞ্জ সব শুনে বেশ খানিকটা হেসে হেসে বলল, 'থাকুক—থাকুক সব উপোস করে পড়ে।'

কারুতাম্মা কাছেই বসেছিল। বাবার এই রকম কথা শুনে চমকে গেল।

চেম্পনকুঞ্জ বলে চলল, 'মরুক্ মরুক্ সব অভাবে আর হিংসেয় জ্বলে পুড়ে। তখনই দেখবি আমাদের কাজ কেমন হাঁসিল হয়।'

কি কাজ হাঁসিল হবে কারুতাম্মা ঠিক বুঝতে পারল না কিন্তু বাপের কথাবার্তা শুনে বাপের ওপর ওর ঘেন্না হল।

চাকী জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার গো, কি কাজ হাঁসিল হবে?'

'সে তুই পরে দেখবি। শালারা সব হাতে টাকা পেলে আহ্লাদে ডগমগ করতে থাকে। তখন কোনও খেয়াল থাকে না। আলেপ্পীতে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে পয়সাগুলো উড়োয়। বাড়িতে মাগের পরার কাপড় নেই আর বাবুদের জরীর উড়নীর দরকার হয়। তখন সব মাটিতে পা থাকে না। এখন ঘরে বসে বসে কড়িকাঠ গুণুক সব হতভাগারা।'

বাবা কি বলতে চাইছে কারুতাম্মা ঠিক তা বুঝতে পারল না। চাকী কিন্তু পোড়খাওয়া মেয়েছেলের মতো বলল, 'জেলেদের টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখার দরকারটাই বা কি? ওদের টাকা পয়সা তো সব সামনেই ছড়িয়ে আছে।'

'দরকার নেই। তা বেশ—এবার সব তাহলে ঠেলা বুঝুক। আর তোকেও বলে রাখছি, এখন থেকে মেয়েকে তুই উপোস করতে শেখা নইলে পরে পস্তাবি।'

চাকী একটু মুচকি হেসে বলল, 'ওঃ, তুমি যেন সবজান্তা।'

'আরে তাই তাই। সবজান্তাই আমি। আমার হাতে নগদ টাকা আছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বেশি বড়াই করতে আর হবে না। বেচারী পারীকুট্টি তার কারবার গুটিয়ে বসে আছে। তাকে তো একটা পয়সাও ঠেকালে না। আর মেয়েটাও এদিকে বড় হয়ে উঠছে। পারীকুট্টির টাকাটা শোধ করে আর মেয়ের বিয়ে দিতেই জিভ বেরিয়ে আসবে তখন আর অত টাকার ফুটোনি করতে হবে না।'

কারুতাম্মার খুব ইচ্ছে করছিল যে বাপকে জিজ্ঞেস করে যে—'হ্যাঁ বাবা, পারীকুট্টিও তাহলে ঠেলাটা বুঝুক সেইটাই তুমি চাও, তাই না?'

এই অভাবের দিনে চেম্পনকুঞ্জ আর চাকী পাড়া-প্রতিবেশীদের কাঁসার বাসন, সোনাদানা যা পেল জলের দামে কিনে ফেলল। এইভাবে তাদের

কাজের হাঁসিল হল। মেয়ের বিয়ের জন্য এরপর সামান্য কিছু জিনিসপত্র কিনলেই চলবে। একদিন চাকী একটা ভাল খাট সস্তায় পেয়ে গেল। চেম্পনকুঞ্জ ঘরে এলে একটু লাজুক মুখে হাসতে হাসতে বলল, 'একটা খাট কিনেছি।'

চাকীর মতোই লাজুকভাবে হাসতে হাসতে চেম্পনকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'বটে, খাট কিনেছিস? তা হবেটা কী?'

'খাটে আবার কি হয়? শোওয়ার জন্যে?'

'কার শোওয়ার জন্যে?'

'মেয়ে-জামাইএর।'

'তাই বুঝি?'

'তবে কার জন্যে? আমাদের বুড়োবুড়ির জন্যে নাকি?'

'তা ঠিকই। তবে আমি কিন্তু একটা তোশক করাতে চাই। ঠিক কাণ্ডান-কোরাণের বাড়িতে যেমনটি দেখেছি।'

চাকী বলল, 'তোশক যদি নিজের জন্য করাতে চাও তাহলে তার ওপর শোওয়ার জন্য একটা সোন্দরী মেয়েও দেখে এনো।'

'সে আমি তোকেই খাইয়ে-দাইয়ে মোটা আর সুন্দরী করে তুলব।'

চেম্পনকুঞ্জের মনে এই সাধটা একেবারে পাকাপাকি হয়ে বসেছে। জীবনের বাকি কটা দিন খুব আরামে কাটাতে হবে। নৌকো আর একটা কিনতে হবে। যা টাকা জমেছিল তার বেশির ভাগ অবশ্য এই সব বাসনপত্তর সোনাদানা কিনতেই খরচ হয়ে গেছে, তবু নৌকো কেনাটা এখন খুব একটা শক্ত কিছু ব্যাপার নয়।

এর মধ্যে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চেম্পনকুঞ্জ দেখে যে জেলে রামনকুঞ্জ ওর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। চেম্পনকুঞ্জ রামনকুঞ্জকে খুব আদর করে বসাল। রামনকুঞ্জ তাদের গ্রামে ওয়ালাকার অর্থাৎ তার নৌকো রাখার অধিকার আছে। রামনকুঞ্জের দুটো নৌকো আছে। ওর জমিজমা যা ছিল সব অন্যের কাছে বাঁধা পড়েছে। ওর নিজের নৌকো কেনার আগে চেম্পনকুঞ্জ রামনকুঞ্জের নৌকোয় কিছুদিন কাজও করেছিল।

এখন সময় বদলে গেছে—রামনকুঞ্জ এসেছে চেম্পনকুঞ্জের কাছে টাকা ধার করতে। ওর নৌকোয় যে-সব জেলে দিনমজুরি খাটে তারা বড়ই অভাবে পড়েছে। ওর হাতেও টাকা নেই তাই চেম্পনকুঞ্জের কাছে কিছু টাকা ধার করতে এসেছে। সাধারণত ও টাকা ধার করে আউসেপের কাছে। কিন্তু

আউসেপের কাছে দেনা বেশ মোটা হয়ে পড়েছে। ওর কাছে আর টাকা চাইতে লজ্জা করে বলে চেম্পনকুঞ্জের কাছে এসেছে।

রামনকুঞ্জ বলল, 'আমার নৌকোর লোকেদের অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়েছে ভাই যে তা চোখে দেখা যায় না। মাছ ধরতে নৌকো নামাতে পারছি না। বেচারীরা সব উপোস করে মরে গেল। চোখ খুলে এসব দেখাও যায় না।

চেম্পনকুঞ্জ রামনকুঞ্জের কথায় সায় দিয়ে বলল, 'তা ঠিকই, বেচারীদের যে অবস্থা হয়েছে তা আর বলার নয়।'

কোনও রকম উচ্চবাচ্য না করে চেম্পনকুঞ্জ টাকা ধায় দিতে রাজী হল। 'কত টাকা চাই ?'

'তা দেড়শো হলেই হবে।' চেম্পনকুঞ্জ টাকাটা গুণে দিল।

রামনকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তোমার জেলেদের টাকা ধার দিচ্ছ না ?'

চেম্পনকুঞ্জ মাথা চুলকে বলল, 'আমি আর কোত্থেকে ধার দেব দাদা। আমি তো ওদেরই মতো একজন জেলে। ওদের মতো আমাকেও খেটে খেতে হয়। কাঠবেড়ালী কি আর হাতির মতো হাঁ করতে পারে ?'

রামনকুঞ্জ ওর কথা শুনে হাসল। রামনকুঞ্জ চলে গেলে পর চেম্পনকুঞ্জ চাকীর সামনে দাঁড়িয়ে হি হি করে পাগলের মতো হাসতে লাগল। এত খুশি চেম্পনকুঞ্জকে কোনদিন দেখা যায়নি। চাকী ওর রকমসকম দেখে একটু ভয় পেয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কিগো পাগল হলে নাকি ? এত হাসছ কেন ?'

'তুই আর এসব কি বুঝবি রে মাগী। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো। দেখ্ না ওর অমন সোন্দর নৌকোটা কেমন ছমাসের মধ্যে আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়ে—এখন বুঝলি তো হাতে টাকা থাকার কত গুণ।'

এদিকে চেম্পনকুঞ্জের নৌকোর দিনমজুরি-খাটা জেলেরা এসে ওকে টাকা ধার দেওয়ার জন্য বিরক্ত করতে লাগল। চেম্পনকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল :

'টাকা ধার চাইছিস যে শুধবি কি করে ? কাজ করার ইচ্ছে আছে ?'

ওরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠল—'হ্যাঁ।'

'তাহলে মাঝ সুমুদ্দুরে বঁড়শী ফেলবি চল।'

'মাঝ সুমুদ্দুরে বঁড়শী ফেলার সময় এটা নয়',—ওদের মধ্যে কয়েকজন বলল।

চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'বেশ, তোরা যদি না যাস তাহলে আমি অন্য জেলেদের নিয়ে যাব আর পরে তাদেরই আমার নৌকোয় কাজ দেব। টাকা-পয়সা খরচ করে নৌকো জাল আর সব দরকারী জিনিস কিনে এমনি ভাবে হাত গুটিয়ে

বসে থাকা যায় না। এতে আমার খুবই লোকসান।'

দু-তিনদিন পরে একদিন সকাল বেলায় চেম্পনকুঞ্জকে নৌকোর হালে বসে পশ্চিম দিকে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখে চাকী আর কারুতাম্মা সব ঘটনা জানতে পারল। সেদিন চেম্পনের নৌকোর জেলেদের আর ওর নিজের, এই তেরটি ঘরের মেয়েরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তেরঘরের ছোট বড় সবাই ভয়ানক ভয় পেয়ে তীরে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল। সেদিন আর কারুর বাড়িতে হাঁড়ি চড়ল না। বুড়োরা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, 'জোয়ার খুবই বেশি। মাঝসমুদ্দুরে নিশ্চয়ই ঘূর্ণী দেখা দিয়েছে।'

সন্ধে হয়ে আসার পরও নৌকো ফিরে এল না দেখে সমুদ্রের ধারে কান্নাকাটি চেঁচামেচি পড়ে গেল। রাত হলে জেলেদের গ্রামের যে যেখানে ছিল সবাই সমুদ্রের ধারে এসে জড়ো হল। সকলেই মনে নিদারুণ উদ্বেগ নিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাতটা ছিল পরিষ্কার—কোনও দিকে মেঘের কোন চিহ্ন ছিল না। তারাগুলো সব ঝিলমিলিয়ে হাসছিল। আর সমুদ্র ছিল নিশ্চল। হঠাৎ অনেক দূরে একটা বিন্দুর মতো কি যেন দেখা গেল। কে যেন একজন বলল নৌকোই বোধহয়। কিন্তু সে নৌকো তীরে এল না।

কোচ্চান্ জেলের বুড়ি মা বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল আর চাকীকে গালাগালি দিতে লাগল, 'তুই, তুইই মাগী এর জন্য দায়ী। আমার ছেলে তোকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

বাভার পোয়াতি বউটা কাউকে কিছু দোষ না দিয়ে গুনগুন করে কাঁদছিল। এমনিভাবে সমুদ্রের ধারে শুধু কান্নাকাটি আর চেঁচামেচি চলছিল।

মাঝরাতের পর কিসের যেন একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'নৌকো আসছে, নৌকো আসছে।'

সকলে দেখতে পেল একটা নৌকো সোঁ সোঁ করে তীরের দিকে ছুটে আসছে।

নৌকোটা তীরে এলে সবাই দেখল নৌকোয় একটা হাঙর রয়েছে। আর একটাও পেয়েছিল কিন্তু আনার অসুবিধের জন্য সেটাকে কেটে ফেলে দিয়ে এসেছে।

পুবদিক থেকে যে সব মেছুনী এসেছিল চেম্পনকুঞ্জ মাছটা কেটে তাদের দিল। লাভের দরকার নেই। যে দরে বিক্রী করবে সেই দাম দিলেই চলবে। কালিকুঞ্জ, লক্ষ্মী আর অন্য জেলেনীরাও বাদ পড়ল না। বেচারীদের বাড়িতে কদিন পরে উনুন জ্বলল।

দুদিন পরে চেম্পনকুঞ্জ আবার মাঝসমুদ্রে বঁড়শী ফেলতে গেল। সে দিনও চেম্পনকুঞ্জ খালি হাতে ফিরে এল না। ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন চেম্পনকুঞ্জের ওপর। এই দুর্দিনেও চেম্পনকুঞ্জের টাকার জোগাড় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের অভিজ্ঞতা নিয়ে বড়াই করছিল কতকগুলো বুড়ো জেলে—এরপর তারা আর একটা কথাও বলতে পারল না। উপরন্তু জেলেনীরা বলতে লাগল চেম্পন-কুঞ্জের জন্যেই এই অভাবের দিনে তাদের দুমুঠো ভাতের জোগাড় হচ্ছে।

তবে এই দুর্দিন গিয়ে সুদিন একসময় আসবে এ বিশ্বাস সকলেরই আছে, নইলে তারা কিসের আশায় বাঁচবে। গত বছর মাছের ঝাঁক আলেপ্পীর উত্তরে ছিল। সেই হিসেবে মাছের ঝাঁক এ বছর এই সমুদ্রের দিকেই আসবে আর যদি দুর্ভাগ্যবশত এদিকে না আসে তাহলে মাছ ধরার জন্য যে দিকেই হোক তাদের যেতে হবে। তার জন্যে তৈরী থাকা দরকার। নৌকো খারাপ হয়ে থাকলে মেরামত করতে হবে। জাল ছেঁড়া থাকলে তাকে সেলাই করতে হবে। মাছ ধরতে যখন নৌকো নামে না তখন জেলেরা এইসব কাজ সেরে রাখে। কিন্তু হাতে টাকা না থাকায় নৌকোর মালিকেরা বড় মুশকিলে পড়ল। টাকা না থাকলে জেলেদের কি দিয়ে কাজ করাবে।

আউসেপ আর গোবিন্দ এই দুই সুদখোর থলে-ভর্তি টাকা নিয়ে জেলেদের কাছে হাঁটাহাঁটি করছে। এখন টাকা দরকার সকলেরই। তাই যে-কোনও শর্তে টাকা নেবে। পাইকিরি মাছের ব্যবসায়ীরা আলেপ্পী, কুইলন আর কোচিনের চিংড়ী মাছের ব্যবসায়ী শেঠদের ম্যানেজারগুলোকে তোয়াজ করার চেষ্টা করতে লাগল। এমনিভাবে সমুদ্রের ধারে কিছু হৈ চৈ হতে লাগল।

ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা টাকা ধার দেওয়ার জন্য জেলেনীদের বাড়ি বাড়ি ঢুঁ মারছে। যে সব বাচ্চা ছেলেমেয়ে মাছ শুকিয়ে বিক্রী করে তাদেরও তারা টাকা ধার দিতে আরম্ভ করল। এমনি ভাবে টাকা ধার দিতে একটা মুসলমান ছেলে এসে ঢুকেছিল কোচ্চুটি নামে একটা জেলেনীর বাড়িতে। তার জেলে ঠিক সেই সময়ই বাড়ি আসে। বাড়ি এসে ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে রাগের মাথায় ছুরি মারে। এই নিয়ে এখনও আদালতে মোকদ্দমা চলছে।

চেম্পনকুঞ্জ আছে নিজের তালে। ও মাঝে মাঝে রামনকুঞ্জের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। ইদানীং রামনকুঞ্জের চেম্পনকে দেখলেই ভয় লাগে ওর টাকাটা চাইতে এল বুঝি বা। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ টাকা চাওয়ার নামও করে না। উল্টে আরও কিছু টাকার দরকার আছে কি না ওকে জিজ্ঞেস করে।

মাছের অমন মরশুমে পারীকুট্টি কিন্তু কেনাবেচার কোন চেষ্টাই করলনা।

তার বাপজান অবশ্য তাকে আড়তের ঝাঁপ তুলে দিতে বলেছে। বাপের ইচ্ছে মাছের ব্যবসা বন্ধ করে ছেলে অন্য কিছু কাজ করুক। কিন্তু পারীকুট্টির তাতে মন নেই। একদিন সে তাই বাপকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে সে অন্য কোন কাজে তো লাগবেই না উপরন্তু ঐ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও সে যাবে না।

আবদুল্লা ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। এর আগে পারীকুট্টি এত স্পষ্ট করে বাপের মুখের ওপর কোনও কথা বলেনি। সে জিজ্ঞেস করল:

'কেন রে হারামজাদা? অন্য জায়গায় কাজ করতে তোর আপত্তিটা কীসের?'

পারীকুট্টি বলল, 'তুমিই আমাকে ছোট্ট বেলায় এই সমুদ্দুরের ধারে মাছের ব্যবসায় লাগিয়েছ। আমি শুধু সেই ব্যবসাই জানি। অন্য কিছু কাজ আমি জানি না।'

'তাই যদি জানিস রে হতভাগা তাহলে আমার সমস্ত টাকা গোল্লায় দিলি কেন?'

পারীকুট্টির জবাব খুব পরিষ্কার, 'ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান হয়েই থাকে। কখনও কখনও ব্যবসার পুরো টাকাটাও লোকসান হয়।'

'আবার যদি টাকা নষ্ট হয়?'

তার উত্তরে পারীকুট্টি শুধু একটা কথা বলল,'তুমি আমাকে তোমার সম্পত্তির যে ভাগ দেবে ঠিক করেছ সেইটা দাও। পরে আর একটি পয়সাও আমি চাইব না।'

'সম্পত্তি? আমার আর কি সম্পত্তি আছেরে ছোঁড়া—দু বিঘে জমিও আমার নেই।'

সত্যিই আবদুল্লার এখন খুব কষ্টেই চলছে। আগে কিছু জমিজমা ছিল, এখন তাও গেছে। একটা মেয়ের বিয়ে দিতে এখনও বাকি। বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে আছে—তার জন্যে খরচও আছে। আবদুল্লা তাই ওর সব দুঃখকষ্টের কথা ছেলেকে খুলে বলল—কিন্তু পারীকুট্টি তার মত বদলাল না। ও এই সমুদ্রের ধার ছেড়ে নড়বে না আর যদি ব্যবসাই করে তাহলে মাছের ব্যবসা ছাড়া আর কিছু করবে না।

মাছের মরসুমের সময় পারীকুট্টি যে মাছ কেনা-বেচা কিছু করতে পারেনি তা কারুতাম্মা বুঝতে পারল। মাছের ব্যবসা করতে হলে ঝুড়ি, মাছ শুকোতে দেওয়ার মাদুর, মাছ সেদ্ধ করার উনুন কিছুই ও কেনেনি, তৈরীও করেনি। কারুতাম্মা ওর মাকে বলল:

'ছোট মিয়া তো দেখছি মাছের এই মরসুমেও কারবার বন্ধ রেখেছে। হাতে নিশ্চয়ই ওর টাকা নেই। এখন যদি ওর টাকাটা ফেরৎ দেওয়া যায় মা তাহলে লোকটার খুব উপকার হয়। আমাদের হাতে যখন টাকা ছিল না তখন ছোট মিয়া আপনা থেকে কত সহজে টাকাগুলো দিয়েছে। বলতে গেলে ওর জন্যেই আমরা নৌকো আর জাল কিনতে পেরেছি। আমাদের যদি একটুও চক্ষুলজ্জা থাকে তাহলে ওর টাকাটা এক্ষুনি ফেরৎ দেওয়া উচিত মা।'

মেয়ের কথা শুনে চাকী আবার চেম্পনকুঞ্জকে পারীকুট্টির টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তাগাদা দিল। চেম্পনকুঞ্জ স্পষ্ট চাকীকে বলে দিল যে টাকা ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। চেম্পনকুঞ্জ ভয়ানক রেগে গেছে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা শুনে। এবার কারুতাম্মা বুঝতে পারল যে তার বাবার পারীকুট্টিকে টাকাটা ফেরত দেওয়ার কোন মতলবই নেই। কি যে করা যায় ভেবে বেচারী ছটফট করতে লাগল। এইভাবে একদিন এই ছটফটে মন নিয়ে ও ওর মাকে বলল :

'আমি আমার শরীরের এই ভার আর বইতে পারছিনা মা।'

মা মেয়ের কথার অর্থ বুঝতে পারলনা। জিজ্ঞেস করল, 'তোর শরীরের আবার কিসের ভার মা ?'

কারুতাম্মা আর কিছু না বলে কাঁদতে লাগল। চাকী মেয়ের গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে লাগল। কিন্তু আজ কারুতাম্মা একটা মতলব এঁটেছে।

'আমি বাবাকে সব বলে দেব···সব। আর তখনই টাকা বের হবে আমি জানি।'

চাকী মেয়ের কথা শুনে চমকে উঠল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'লক্ষ্মী মা আমার, এসব কথা তোর বাবাকে বলিস না।'

মেয়ের ব্যাপার যতটা চাকী জানে ততটা চেম্পনকুঞ্জ জানলে অবস্থা যে কি ভয়ানক দাঁড়াবে চাকী তা ভাবতেই পারল না। তাছাড়া মেয়ের কথা-বার্তা শুনে মনে হচ্ছে সেও যতটা জানে ব্যাপার তার চেয়েও বেশ কিছুদূর গড়িয়েছে। তাই সে মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গেল। মার কথা শুনে তখনকার মতো কারুতাম্মা শান্ত হল বটে, কিন্তু একলা বসে থাকলে কারুতাম্মা নিজের মনকে বশে আনতে পারে না।

পারীকুট্টিকে ও ভালোবাসে এত গভীরভাবে যে ওর মনে অন্যলোকের কোন জায়গা নেই। কিন্তু তবু ও পারীকুট্টিকে ভুলতে চায়। ভুলতে চায় ওর সঙ্গে যত রকম সম্পর্কের কথা। ও নিজে যে জেলের ঘরে জন্মেছে, জেলের বউ হয়েই ওকে মরতে হবে। তাই পারীকুট্টিকে ভোলা ছাড়া তার উপায় নেই।

কিন্তু ভুলবে কি করে? যতক্ষণ না পারীকুট্টির টাকাটা ফেরত দেওয়া হয়, যতক্ষণ না এই লেনদেনের সম্পর্ক শেষ হয়, ততক্ষণ হয়তো তাকে ভোলা সম্ভব হবে না কিন্তু টাকাটা শোধ হয়ে গেলে পারীকুট্টিকে ভোলা তার পক্ষে সহজ হবে, এই তার ধারণা।

ওরই জন্য পারীকুট্টি তার ব্যবসা গুটোতে বাধ্য হয়েছে। রোজগারের অন্য কোন পথই তার সামনে নেই। বেকার হয়ে সে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে কারুতাম্মার বুক ফেটে কান্না আসে। আর সব সময়ই তার পারীকুট্টির এই ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

একটার পর একটা দিন কেটে গেল কিন্তু পারীকুট্টির টাকা শোধ দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হল না। বাবা যে পারীকুট্টির টাকা ফেরত দেবে না সেটা কারুতাম্মা এখন স্পষ্টই বুঝতে পারল। সব দেখে শুনে ভয়ানক একটা উদ্বেগ আর অশান্তি কারুতাম্মার মনকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। বেচারী খেয়ে শুয়ে বসে এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি পায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমুদ্রতীরের প্রতিটি জেলে-পরিবার উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে মাছের মরসুমের। কাপ্লা আর ফেন ভাত খেয়ে তাদের দিন কাটছে। সাগর-মার আশীর্বাদে কবে পেট ভরে দুটো মাছ-ভাত খাবার দিন আসবে মনে মনে প্রশ্ন জাগে সকলের। মাছের মরসুম এলে তাদের অভাব ঘুচবে, দুঃখকষ্ট দূর হবে তাই সেই মরসুমের আশায় সকলে দিন গুণছে।

চায়ের দোকানে ধারে চা খেয়ে দোকানদারদের মুখের পানে চেয়ে জেলেরা বলে, 'মরসুম আসুক দাদা, সব দেনা মিটিয়ে দেব।' জেলেনীর কাপড় ছিঁড়ে কুটি কুটি। তালি দিয়ে পরে পরে আর পরা যাচ্ছে না—একমাত্র আশা মরসুমের। তখন ভাল ভয়েল ভাল লুঙ্গি কিনবে। জেলেদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন, তাদের সব সাধ আহ্লাদ মেটাবে মাছের মরসুম।

মরসুম এলে তাদের সাধ-আহ্লাদ মেটাবার কথা বলে জেলেনীরা। কারুতাম্মারও একটা ইচ্ছে আছে কিন্তু সে ইচ্ছের কথা পাড়ার জেলেনীদের বলেনি ও। বলেছে শুধু মাকে। মাছের মরসুমের সময় যে করে হোক কিছু টাকা জমাতে হবে আর তারপর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করে পারীকুট্টির টাকাটা এইবার শোধ করতে হবে। চাকীরও একটা সাধ আছে। কিছু টাকা জমিয়ে গয়নাগাঁটি গড়াতে হবে। গয়নার কথা মেয়েকে বললে পর মেয়ে বলল, 'আমার কোনও সোনাদানা চাই না মা। ছোট মিয়ার ধারটা শোধ হলেই বাঁচি।'

চাকী বলল, 'তা সে ধার শোধ দেওয়ার কথা তো তোর বাবার, তা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথার কি আছে?'

'তুমি তো ভাল করেই জানো মা যে বাবা ও টাকা শোধ দেবে না।'

চাকী মাথা নেড়ে বলল, 'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে মা।'

ছোট্ট পঞ্চমীরও একটা সাধ আছে। ও তো মাছ কুড়িয়ে শুকোবেই তা

ছাড়াও বাবা তাকে একঝুড়ি করে মাছ দেবে কথা দিয়েছে। সেইগুলো শুকিয়েও সে কিছু টাকা করবে।

আর পারীকুট্টিও কতকগুলো বিষয় ঠিক করে ফেলেছে। ওর বাপজান জমি আর বাড়ি শেঠের কাছে বন্ধক রেখেছে। ছাড়াতে হাজার দুই টাকা লাগবে। এ বছর বেশ হিসেব করে মরসুমের সময় যদি মাছের ব্যবসা চালাতে পারে তাহলে টাকাটা শোধ করে বোনের বিয়ের ব্যবস্থা ও করতে পারে। মরসুম এলেই এ কাজগুলো শেষ করে ফেলবে বলে পারীকুট্টি মনে মনে শপথ করল।

আচ্চকুঞ্জ এই মরসুমের সময় যে করে হোক একটা নৌকো কিনবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। এরমধ্যে সমুদ্রের রঙ একদিন বদলে গেল, কিন্তু জল হঠাৎ কমে গেল আর জেলেদের অভাব চরমে উঠল। আচ্চকুঞ্জ কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে আউসেপের কাছে গেল। নৌকো আর জাল ওকে কিনতেই হবে। এর জন্যে ও সবকিছু করতে রাজী। একদিন সে তাই আউসেপের কাছে গিয়ে বলল, 'আউসেপদাদা, আমার অনেকদিনের সাধ যে নিজের নৌকোর হাল ধরে সমুদ্দুরে পাড়ি দিই আর আমার মাগ আমার জন্য সমুদ্দুরের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার অনেকদিনের সাধ দাদা।'

'তাতো বুঝলাম, হাতে আছে কত?'

'একটা পয়সাও নেই দাদা।'

'তাহলে আর শখ মিটবে কি করে?' এমনিভাবে বলল বটে কিন্তু তাহলেও আউসেপ ওকে একটা বুদ্ধি বাতলে দিল। মাছের মরসুমের সময় হাতে যা আসবে সেটা জমা করে আউসেপকে দেবে। যদি তাতে না কুলোয় তাহলে বাকি টাকাটা আউসেপই দেবে।

'তবে ভাই একটা কাজ করতে হবে। নৌকো আর জাল আমার নামে থাকবে। তোমাকে মাছের ভাগ দেব, তা মাছের ভাগ একটু বেশিই দেব, বুঝলে? যদি এই ব্যবস্থায় রাজী থাকো তাহলে মরসুমের সময় যে টাকাটা পাবে তা আমার কাছে জমা দিও। তোমার ভয় নেই টাকাটা আমি সাবধানেই রেখে দেব।'

আচ্চকুঞ্জ রাজী হল। না হয়ে উপায়ই বা কি! তা ছাড়া জেলেদের মধ্যে এ-ধরনের কারবার খুবই চলে। ও খুশি মনেই বাড়ি গিয়ে নাল্লপেন্নকে সব খুলে বলল।

'আর দেখ তুইও মাছ বিক্রী করে যা পাবি আমার হাতে দিবি।'

'বাঃ বাঃ, বেশ মজা। মিনসের কাণ্ডখানা দেখ। কোথায় আমাকে টাকা দেবে না আমায় বলছে টাকা দিতে।'

'আরে মাগী বাজে বকছিস কেন? যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। আউসেপের কাছে আমরা দুজনেই টাকা জমা দেব।'

নাল্লপেন্নর কিন্তু ওর জেলের কথাটা তত পছন্দ হল না।

ও বলল, 'বলি চেম্পনকুঞ্জ দাদা কি করে জাল আর নৌকো কিনল শুনি? যা পেত সব চাকীর হাতে তুলে দিত তাই সে কিনতে পেরেছে।'

যাহোক অনেক কথা কাটাকাটির পর আউসেপের কাছে টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে তারা একমত হল। আচ্চকুঞ্জ সকলকে বলে বেড়াতে লাগল যে এবার জাল আর নৌকো সেও কিনবে।

এমনি ভাবে সকলেই তাদের নিজের নিজের সাধ আর ইচ্ছে নিয়ে বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগল। বৃষ্টির পরেই মাছের মরসুম শুরু হবে।

তারপর এল সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। তুমুল বজ্রপাতের সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল। সে কি বৃষ্টি! মনে হল বৃষ্টি যেন জেলেদের ছোট ছোট ঘরগুলো সব ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। বৃষ্টি থামলে পর স্রোতের টান দেখে জেলেরা বুঝতে পারল যে মাছের ঝাঁক এবার ওদের ঐ সমুদ্রের কাছাকাছিই আছে। দেখেশুনে আনন্দে আর উৎসাহে অর্ধোপবাসী জেলেদের ম্লান চোখগুলো আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। দু একদিনের মধ্যেই ওদের ঐ সমুদ্রের ধারটা হয়ে উঠবে একটা ছোট খাট শহর। এখন থেকেই অনেক দোকান বসতে আরম্ভ করেছে। চায়ের দোকান, কাপড়ের দোকান, দর্জির দোকান, গয়নার দোকান কিছুই বাদ পড়েনি। এ বছর আবার ডায়নামো বসিয়ে আলোও জ্বালানো হয়েছে।

পরে আরও একদিন বৃষ্টি পড়ল মুষলধারে। সমুদ্র যেন তোলপাড় হয়ে নাচতে শুরু করল, সব জল ঘোলা হয়ে গেল। আনন্দে আর উৎসাহে জেলেরাও নাচতে লাগল। তাদের সব সাধ-আহ্লাদের পূরণ হবে আর দুদিন বাদেই। ঘোলা জল যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে দুদিনের মেঘ কেটে গিয়ে প্রাচুর্যের আলোয় তাদের জীবনও উজ্জ্বল হয়ে হেসে উঠবে।

বৃষ্টির পর সমুদ্র শান্ত হল—জল হল নিশ্চল! দূর দূর থেকে অনেক নৌকো সেই সাগরতীরে আসতে শুরু করল। বর্ষাকাল—ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্র যেন পুকুরের মত শান্ত আর নিশ্চল।

চেম্পনকুঞ্জের নৌকোর জেলেরা খুবই চালাক। কিন্তু তা সত্ত্বেও চেম্পনকুঞ্জ তাদের মাছধরার নানা কলাকৌশলের কথা শিখিয়ে পড়িয়ে দিল। চেম্পনকুঞ্জ যখন নৌকোর মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে তা সত্যিই দেখার মতো। জেলেদের

ওর কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে সেটা ওরা সকলেই স্বীকার করল।

প্রথম দিন জলে মাছ কমই ছিল। মাছ ওই চত্বরে সবে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু তাহলেও সব নৌকোগুলো জলে নেমে গেল। অন্য দিনের মত সেদিনও বেশি মাছ পেল চেম্পনকুঞ্জ। জেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল :

'আজও চেম্পনকুঞ্জদাদা বেশি মাছ পেল হে।'

তাতে আচ্চকুঞ্জ বলল, 'আরে সে ও আগে নৌকো নামিয়েছে বলে।'

রামন মুপ্পন বলল 'কি যে বল তুমি! চেম্পনকুঞ্জ কাণ্ডানকোরানের খোদ্ লক্ষ্মীকে কিনে এনেছে।'

জেলেদের কেমন যেন নিশ্চিত ধারণা হয়ে গেছে যে চেম্পনকুঞ্জ বেশি মাছ পাবেই। একে তো চেম্পনকুঞ্জ চালাক লোক তার ওপর আবার ও কাণ্ডানকোরানের পয়া নৌকোটাকে কিনেছে। এ ছাড়াও জেলেদের উৎসাহ দিয়ে কেমন করে বেশি মাছ ধরাতে হয় তা সে জানে।

কিন্তু এদের মধ্যে আয়ানকুঞ্জ ছাড়বার পাত্র নয়। ও চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে টেক্কা দিতে চায়। ও ওর নিজের লোকদের খুব একচোট হুমকি দিল :

'দেখ বাপু তোমাদের আবার যেন ডাকাডাকি না করতে হয়। রাত ঠিক সাড়ে তিনটের সময় আসবে। তোমরা বাবা সব আশ্চর্য লোক। চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে একটা পাল্লা দেওয়ার চেষ্টাও করতে চাওনা। আগে ভাগে না আসতে পারলে চেম্পনকুঞ্জকে হারিয়ে দেওয়া যাবেনা। তোমাদের বাবা তাই হাতজোড় করে বলছি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি এসো।'

আয়ানকুঞ্জের কথায় জেলেরা রাগ করলনা উপরন্তু আয়ানকুঞ্জের কথাগুলো তাদের ভালোই লাগল। দেখাই যাক্ না একবার চেম্পনকুঞ্জের মত মাছ ধরা যায় কিনা।

সেদিন খুব ভোরে অন্য সব জেলেরা চেম্পনকুঞ্জের চেয়ে আগেই সমুদ্রের ধারে এল। কয়েকজনকে অবশ্য ডাকাডাকি করতে হল কিন্তু তাহলেও চেম্পনকুঞ্জ বা তার লোকেরা তখনও এসে পৌছয়নি। চায়ের দোকানগুলোও সেদিন সকাল সকাল খুলল। শুধু চেম্পনকুঞ্জের নৌকোই সেদিন দেরীতে নামল। ও অন্যান্য জেলেদের মতলব বুঝতে পারেনি।

সমুদ্রের ধারে যে সব জেলেরা জড়ো হয়েছিল তারা সব জলের টান দেখে বলাবলি করছিল যে আজ খুব মাছ উঠবে। পাইকিরী আর খুচরো খরিদ্দারেরা সমুদ্রের তীরে অনেক আগে থেকেই জড়ো হয়েছে। পারীকুট্টিও ওদের মধ্যে ছিল কিন্তু ওকে কেমন যেন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। ও যেন কার পথ

চেয়ে ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। ওর হাতে টাকা এখন খুব কম— টাকা নিয়ে শেঠের দালালের আসার কথা ছিল কিন্তু এখনও আসেনি। পারীকুট্টি তারই জন্য অপেক্ষা করছিল আর তার দেরী দেখে মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করছিল। তবে দিনটা দেখে মনে হচ্ছিল যে বেশ ভালই যাবে। মাছ বেশ ভালই উঠছে আর রোদ উঠেছে চমৎকার। চিংড়ি মাছ সেদ্ধ করে শুকোতে দিলে কড়া রোদে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। বেশ কিছু টাকা কামানো যাবে তাতে।

কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। শেঠের দালাল পাঁচু পিল্লাই-এর পাত্তা নেই। মরসুমের প্রথমেই ক্ষতি হবে মনে করে পারীকুট্টি রীতিমত ঘাবড়ে গেল। মাছধরা শেষ করে নৌকাগুলো তীরের দিকে আসার জন্য মুখ ঘুরোল। পারীকুট্টি চেয়ে দেখল যে মাছের পাইকিরী কারবারীরা অনেক টাকা নিয়ে মাছের জন্য অপেক্ষা করছে। ও বেচারী ভীষণ ভাবনায় পড়ল।

তীরে তখন ভীষণ হৈ হৈ চীৎকার পড়ে গেছে। নারকোল পাতা ছাউনী দেওয়া হোটেলগুলোয় কলাপাতায় ভাত বাড়া শুরু হয়ে গেছে। নৌকোগুলো তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হোটেলে খেতে ছুটবে। বড় বড় হাঁড়ি সব উনুনে চড়িয়ে ভাত সেদ্ধ হচ্ছে। এখন একমিনিটও নষ্ট করলে চলবেনা। প্রথম নৌকোটা আসতে দেখে পারীকুট্টি তার লোকজনদের তৈরী হয়ে থাকতে বলে নৌকোর দিকে ছুটল।

রোজকার মত চেম্পনকুঞ্জের নৌকো সেদিনও আগে এসেছে। কাদের মিয়া তাই দেখে বলল :

'চেম্পনকুঞ্জকে হারিয়ে দিতে কেউ পারবে না।'

ময়দীনকুঞ্জ তার কথায় সায় দিল। একটা বুড়ো জেলে বলল, 'নৌকোর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে পাকা লোক।'

নৌকো তীরে ভিড়ল। নৌকো বোঝাই চিংড়ী মাছ।

পারীকুট্টি আগের সব কথা ভুলে গিয়ে সকলকে ঠেলেঠুলে চেম্পনকুঞ্জের নৌকোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বেশ অনুরোধের সুরেই বলল, 'চেম্পনকুঞ্জ, মাছগুলো আমায় বিক্রী করবে?'

চেম্পনকুঞ্জ একটুও নরম না হয়ে পারীকুট্টির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল 'নগদ টাকা আছে? না থাকলে সরে পড় বাপু।'

মাছ বোঝাই নৌকো তীরে ভিড়লে জেলেদের এমনিভাবে জিজ্ঞেস করাটা আর এমনিভাবে উত্তর দেওয়াটা নিয়ম। কাজেই এতে খুব কিছু একটা মনে

করবার নেই।

পারীকুট্টি উত্তর দেবার আগেই কাদের মিয়া এগিয়ে এল। পারীকুট্টি বুঝতে পারল যে চেম্পনকুঞ্জের নৌকোর মাছ সে পাবে না। অন্য নৌকোগুলোর দিকে ছুটল সে।

চেম্পনকুঞ্জের নৌকো আগে ভিড়েছে বলে রোজকার মত সেদিনও সেইই মাছের দর বেঁধে দিল। সেদিনও মাছ উঠেছে প্রচুর কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি মাছ পেয়েছে চেম্পনকুঞ্জ।

পারীকুট্টি অন্য একটা নৌকোব মালের তিন ভাগের এক ভাগ কিনে বিক্রী করল। বেচারীর হাতে সব মাছ কেনার পয়সাও ছিল না।

চেম্পনকুঞ্জ ওর নৌকোর জেলেদের মাছের ভাগ ঠিক করছিল হঠাৎ একটা মতলব তার মাথায় এল। ও বলল :

'আজকে মাছ ওঠাটা দেখলি তো? আর কি সোন্দর কড়া রোদ—জোছনাও উঠবে চমৎকার। ঝড়বৃষ্টিও নেই আর আমার জালটাও ভাল'—

ঠিক কি যে ও বলতে চাইছে জেলেবা বুঝতে পারল না।

ও তখন আর একটু পরিষ্কার কবেই বলল :

'তোরা সব একেবারে গাধা। ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। আর তোদের স্বভাবও অতি বদ্। একটু হাওয়া লাগলেই তোরা ধানের শীষের মতো টলতে থাকিস। এখন হচ্ছে দুপয়সা কামাবার সময়। এখন যেন ভাত খেয়েই নেশা-ভাঙ্ করতে যাসনি। আমি আর এক খেপ মাছ ধরতে চাই।'

আচ্চকুঞ্জ কাছেই দাঁড়িয়েছিল। চেম্পনকুঞ্জের কথা শুনে ও বলল :

'বাঃ বাঃ বেশ মজা! টাকা কামাতে চাও বলে কি দুবার করে মাছ ধরে সমুদ্দুর উজাড় করে দেবে নাকি হে—অ্যাঁ? শুধু তাই নয়। এক'দিনে দুবার মাছ ধরার নিয়ম নেই, উচিতও নয়।'

চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'আরে যা যা— নিয়মের কথা আর আমাকে শোনাস না। তোরা মনে রাখলেই হবে।'

আচ্চকুঞ্জ আর একটাও কথা বলতে পারল না।

সমুদ্রের বেলাভূমি যেন ঝিলমিল করে শত ঐশ্বর্যে ফেটে পড়ছে। মাছের কারবারীরা তাদের ঝাঁপের আশে পাশে সমুদ্রতীর জুড়ে চিংড়ি মাছ সেদ্ধ করে শুকোতে দিয়েছে। রোদের আলো তার ওপর পড়ে মনে হচ্ছে যেন সোনার পাত বিছানো রয়েছে।

আচ্চকুঞ্জ সেদিন আর হোটেলে ভাত না খেয়ে সোজা বাড়ি গেল। হোটেলে

খাবেনা বলে বউএর কাছে শপথ করেছিল, ভাবল হোটেলে না খেলে বউ খুশিই হবে। আচ্চকুঞ্জকে শুকনো মুখে বাড়ি ফিরতে দেখে নাল্লপেন্ন জিজ্ঞেস করল :

'ভাত খেয়ে এলেনা যে বড় ?'

আচ্চকুঞ্জ তখন ভয়ানক রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

'তোর জন্যেই মাগী আমার দুর্দশা কোনদিন ঘুচবে না। তুই লক্ষ্মীছাড়ী হতভাগী, তোর জন্যেই আমার নৌকো আর জাল কেনা হবে না'— বলে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল। নিজের দোষ স্বীকার করলেও নাল্লপেন্ন না বলে থাকতে পারল না :

'ভোর বেলায় যাওয়ার সময় বলে গেলেই হত ভাত রেঁধে রাখ।'

'হোটেলে ভাত খাবনা বলে আগেই তো তোর কাছে দিব্যি গেলেছি।'

কথাটা নাল্লপেন্নর মনে ছিলনা। যাহোক্, ও আচ্চকুঞ্জকে চলে যেতে দেখে বলল :

'ভাত খাওয়ার পয়সাটা রেখে বাকীটা আমায় দাও আমি আউসেপদাদার কাছে জমা রাখব।'

আচ্চকুঞ্জ খুচরো টাকা পয়সা যা কিছু ছিল সব নাল্লপেন্নর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ভাত খেয়ে চেম্পনকুঞ্জ তাড়াতাড়ি আবার তীরে ফিরে এল। ওর নৌকোর লোকেরা তখনও ফিরে আসেনি। ও সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দিনই আরও কিছু টাকা কামানোর স্বপ্ন দেখতে লাগল।

বিকেলের দিকে চেরিয়াড়ী, ত্রিকুন্নাপুড়া সব জায়গা থেকে নৌকোগুলো ঐ সমুদ্রের ধারে এল। সেদিন রাতে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। তাই পরদিন খুব ভোরে নৌকো নামানো গেলনা। নৌকো নামতে বেশ দেরীই হল। চেম্পনকুঞ্জের লোকেরা এল অনেক দেরীতে ; তাই নিয়ে চেম্পনকুঞ্জ তাদের খুব গালিগালাজও করল।

সেদিনও চেম্পনকুঞ্জের নৌকো সকলের আগেই ফিরছিল কিন্তু আরও একটা নৌকো খুব তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে চেম্পনের নৌকোর সমান সমান যাচ্ছিল। চেম্পনের নৌকোর সঙ্গে পাল্লা দেয় কার নৌকো জানতে সকলেরই খুব কৌতূহল হল। নৌকোটা এসেছে ত্রিকুন্নাপুড়া থেকে। হালেতে দাঁড়িয়ে আছে এক সবল সুস্থ জোয়ান ছেলে।

চেম্পনের আর সেই ছেলেটার নৌকো সমান সমানেই চলছে। কে আগে যায় তাই নিয়ে যেন দুজনের মধ্যে রেশারেশি চলছে। দুপক্ষই খুব জোরে দাঁড় বাইছে। দাঁড়িদের দাঁড়টানাটাও বেশ দেখাচ্ছে দূর থেকে। হঠাৎ মনে হল চেম্পনকুঞ্জের নৌকো যেন কিছুটা পেছনে পড়ে গেছে। আজ মাছ কে বেশি পেল তাও জানতে হবে। দু-পক্ষেরই ফেলা জালে নৌকোগুলো ঢাকা পড়ায় কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কে জানে আজ কার ভাগ্যে বেশি মাছ উঠেছে।

মাছ ধরা শেষ করে নৌকো দুটো ফিরলো যেন দুজনদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে। নৌকোগুলোর মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হলে জেলেদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয় তাই এদের নৌকো দুটোর মাথা ঠোকাঠুকি হতে সমুদ্রের ধারে জড়ো-হওয়া জেলেরা খুব ভয় পেয়ে গেল। কারুতাম্মা মাকে বলল :

'আচ্ছা মা, বাবা এমন করে পাল্লা দিচ্ছে কেন বলত ?'

চাকীর নিজেরই এদিকে খুব ভয় লাগছে। মাছ ধরতে গেছে মিনসে মাছ ধবে ফিরে আসবি। এত রেশারেশির দরকার কি রে বাপু? মিনসে কি কচিখোকা, বোঝেনা কিছু! নৌকোর মাথায় ঠোকাঠুকি হলে কি না হতে পারে।

তীরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে এক একটা নিমেষ যেন এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। যাক ভগবান! বাঁচা গেল। নৌকো এবার তীরের দিকে সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসছে। তীরে ভয়ানক চেঁচামেচি হৈ হৈ পড়ে গেল। দুজনের কেউই হারে নি—জেতেও নি কেউ, দুজনেই সমান সমানে এসেছে, দুজনের নৌকোও মাছে ঠাসা।

নৌকো দুটো একসঙ্গেই তীরে ভিড়ল। সেই জোয়ান ছেলেটাই আগে ওর প্রকাণ্ড দাঁড়টা নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। ওর মাথায় একটা কাপড় জড়ানো, চওড়া মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে—সবল সুস্থ এক জোয়ান ছোকরা। কারুতাম্মা বেশ ভাল করে ওকে দেখতে লাগল। ছেলেটা তীরে লাফিয়ে পড়তেই চেম্পনকুঞ্জ ওকে জড়িয়ে ধরে বলল :

'সাবাস বেটা! তুমিই সমুদ্দুরের সাচ্চা ছেলে।' ছেলেটা কোনও উত্তর দিলনা।

সেদিনকার কেনাবেচায় ঐ জোয়ান ছেলেটার মাছই সবচেয়ে বেশি দামে বিকোল। অবশ্য চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে খুব বেশি তফাত ছিলনা তবু চেম্পনকুঞ্জ সেদিন হেরে গেল।

চেম্পনকুঞ্জ নতুন ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নামটা কি বাবা ?'

তেল পিছলে পড়া জোয়ান ছেলেটাকে এখন কত লাজুকই না মনে হচ্ছে। এই কিছুক্ষণ আগেই সে নৌকোর মাথায় দাঁড়িয়ে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টেনে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। কিন্তু এখন নতমুখ যে লাজুক ছেলেটি চেম্পনকুঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এ যেন সে ছেলেই নয়। ও যেন একটা বাচ্চা ছেলে। চেম্পনকুঞ্জ নাম জিজ্ঞেস করাতে বলল :

'পালানি।'

'তুমি তোমার কাজ তো বেশ ভাল জান দেখছি বাপু। জেলে হয়ে জন্মালে সুমুদ্দুরের কাজ বেশ ভালভাবেই জানতে হয়।'

পালানি চুপ করে রইল।

চেম্পনকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার নামটা কি বাবা ?'

'বাবার নাম ভেলু—অনেকদিন হল মারা গেছে।'

'মা ?'

'মাও মারা গেছে।'

'আপন বলতে তোমার তাহলে কে আছে ?'

'কেউ নেই।'

চেম্পনকুঞ্জ একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কেউই নেই ?'

উত্তরে পালানি চুপ করে রইল।

বাড়ি ফিরলে পর চাকী একচোট নিল। বলল, 'জোয়ান হওয়ার সখ আছে জানি। তা বলে কি এ বয়সে এমনিভাবে ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সাজে ?'

চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু চাকীর কথায় কান দিলনা। ওর মাথায় তখন একটা খুব বড় চিন্তা তোলপাড় করছে। নৌকোর মাথায় দাঁড়িয়ে ও যখন দাঁড় চালাচ্ছিল তখন কেন যে ও নিজেকে ভুলে গিয়ে এমনিভাবে পাল্লা দিয়েছে তার কারণটা ও জানে। কিন্তু সে নিয়ে এখন কিছু বলতে ইচ্ছে করলনা। বউকে এখন অন্য কথা বলার আছে। ও চাকীকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল :

'আমার সঙ্গে যে নৌকোটা এল তার মাথায় দাঁড়ানো ছেলেটাকে দেখেছিস ?'

'দেখেছি।'

'ছেলেটা দেখতে শুনতে ভাল আর বেশ চালাক চতুরও মনে হল।'

ছেলেটাকে চাকীরও খুব পছন্দ হয়েছে। শুধু চাকীর কেন সমুদ্রের ধারে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সকলেরই ছেলেটাকে মনে ধরেছে। চাকী জিজ্ঞেস করল :

'তা একথা কেন ?'

'ছেলেটাকে জামাই করতে পারলে মন্দ হয় না। কি বলিস ?'

চাকী কিছু বলল না। চেম্পনকুঞ্জ আবার বলল :

'আমি ওর সব খোঁজখবর নিয়েছি। ওর কেউ নেই—তা সেটা একপক্ষে ভালই।'

চাকী বলল, 'তোমার যখন ছেলেটাকে এত মনে ধরেছে তখন ওকে ভাত খেতে ডাকলেই পারতে।'

'ঠিক বলেছিস। আমি একথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।'

ছেলেটাকে জামাই করার কথা তার স্বামী ভাবছে দেখে চাকীর মনটা সত্যি-সত্যি খুশিতে ভরে উঠল। যাক্ এত দিনে তাহলে মেয়েটার গতি হবে। বাপ মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবছে দেখে চাকী মনে মনে আশ্বস্ত হল।

সেদিন একটু তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে চেম্পনকুঞ্জ সমুদ্রের ধারে ছুটল। ছেলেটা দেখতে শুনতে বেশ ভাল। কেউ না আবার ওকে হাত করে নেয়। হাত থেকে ফস্কে গেলে আবার মেয়ের জন্য ছেলে খোঁজাখুঁজি করতে হবে।

সমুদ্রতীরে এসে দেখে পালানি আর তার সঙ্গীসাথীরা নারকেল গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে রয়েছে। সেদিন আর চেম্পনকুঞ্জের ওকে কিছু বলা হলনা। পরের দিনও চেম্পনকুঞ্জ আর পালানির নৌকোর মধ্যে রেশারেশি চলল। সেদিন কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের হার হল—মাছও বেশি পেল পালানি।

চেম্পনকুঞ্জের নৌকোর জেলেরা কিন্তু এ ব্যাপারটাকে ভাল মনে নিতে পারলনা। কোথাকার কোন্ এক ছোকরা এসে তাদের নৌকোকে হারিয়ে দেবে। কারুকুঞ্জ নামে একটা জেলে বলল :

'আরে দেখইনা ওদের কি অবস্থা করি। বেশিদিন আর আমাদের এই সুমুদ্দুরের ধারে ওদের ফুটানি মারতে হবে না।'

কুঞ্জবাবা বলল, 'আর একবার নৌকো নিয়ে বেরোলে হয়।'

আর একবার নৌকো নিয়ে বেরোলেই মারামারি হবে। চেম্পনকুঞ্জ তাই ওদের মধ্যে এসে বলল, 'কি রে, কাজের লোক দেখলেই তোদের এত হিংসে হয় কেন ? ওদের যদি হারাতে হয় তো কাজ দেখিয়ে হারা। এসব খেয়োখেয়ি করে কিছুই হবেনা।'

জেলেরা ওর কথায় কান দিল না। ওরা নিজেদের মধ্যে একটা মতলব আঁটল। মাঝসমুদ্রে পালানিদের হারাতে পারেনি। এবার ফিরে এলে একবার ওদের দেখে নিতে হবে। ভেলু নামে একটা জেলে কিন্তু ওদের এই দলে

ছিলনা। সে আপত্তি জানিয়ে বলল :

'আরে ভাই তাতে আমাদেরই ক্ষেতি হবে। আজ না হয় ওরা আমাদের সুমুদ্দুরে মাছ ধরতে এসেছে কিন্তু কাল যখন আমরা ওদের সুমুদ্দুরে যাব।'

সে তখন যা হবার তাই হবে। এখন তো যে করে হোক ওদের একটা শিক্ষা দিতে হবে। তাতে মামলা মোকদ্দমা হলেও কুছ পরোয়া নেই। এখন হাতে মুঠো মুঠো টাকা পাওয়ার সময়। মোকদ্দমা হলেও পেছপা হবেনা ওরা।

জেলেদের এই সব মতলবের কথা চেম্পনকুঞ্জের কানে গেল। ও মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেল। যদি শুধু ওর নৌকোর জেলেরা হত তাহলে কোনরকমে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক করত। কিন্তু অন্য নৌকোর অপর সব জেলেদেরও পালানিদের ওপর একটা ভয়ানক আক্রোশ। পালানি ওদের সকলকে হারিয়ে দিচ্ছে তা যেন ওরা কেউই সহ্য করতে পারছে না। তবে কয়েকজন অবশ্য ওদের এই মতলবে সায় দেয় নি।

দু-তিনদিনের মধ্যেই সমুদ্রেরধারে একটা মারামারি লাগল। কিন্তু পালানিদের সঙ্গে নয়। ওখানকাব জেলেদের নিজেদেব মধ্যেই। দুতিনজনের মাথা ফেটে রক্তও ঝরল। সেদিন আর তার পবের দিনও ঐ গাঁয়ের কোন নৌকো জলে নামলনা। পুলিশের ভয়ে লোকগুলো লুকিয়ে রইল। পুলিশও ঠিক সময় এসে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। গাঁয়ের মোড়ল আবার জামিনে তাদের ছাড়িয়েও আনল।

জামিনে যারা খালাস পেল তারা মোড়লেব কাছে এসে তাকে বেশ কিছু টাকা দক্ষিণা দিল। তাবপর মোকদ্দমা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য যেখানে-যেখানে পয়সা ঢালার দরকার সেখানে সেখানে পয়সা ঢালা হল আর এমনিভাবে মাছের মরশুমে যে বাড়তি টাকাটা জেলেদের হাতে এসেছিল তা সব খরচ হয়ে গেল।

ভেলাযুধন শুধু মোড়লের হাতে কিছু দেয়নি তাই মোড়লের রাগ পড়ল তার ওপর। সে পুলিশকে হাত কবে ভেলাযুধনকে ধরাল। ওর জেল হল সাত দিনের। কিন্তু খালাস পাওয়ার পরও ভেলাযুধন বলে বেড়াতে লাগল যে সে মোড়লকে থোড়াই কেয়ার করে।

এই সব হাঙ্গামায় চেম্পনকুঞ্জের কাজকর্ম এক হপ্তার জন্য বন্ধ ছিল। মাছের এই মরশুমে এক হপ্তা কাজ বন্ধ থাকা মানে যে কতটাকার লোকসান তা সেই শুধু জানে। বেচারা রাগে হাত পা কামড়াতে লাগল। তবে দুদিন পরে গোলমাল সব মিটে যেতেই আবার ঠিকমতো মাছ ধরা শুরু হল।

পালানিকে একদিন খেতে বলার জন্য চাকী প্রায়ই চেম্পনকুঞ্জকে তাগাদা দিচ্ছিল। সেদিন পালানির সঙ্গের জেলেরা ছুটি নিয়ে গিয়েছিল ত্রিকুন্নাপুড়ায়। শুধু পালানিই যায়নি। চেম্পনকুঞ্জ পালানিকে জিজ্ঞেস করল :

'কি বাবা, তুমি গেলেনা যে বড় ?'

'আমি আর যাব কোথায় ?'

কথাটা সত্যি। ত্রিকুন্নাপুড়ায় তার কে আছে যে দেখা করতে যাবে। চেম্পনকুঞ্জ তখন বলল :

'তাহলে আজ দুপুরে আমার বাড়িতে দুটো ডালভাত খেও—কেমন ?'

পালানি রাজী হল। চাকী নানারকম রেঁধে ওকে খাওয়াতে বসল।

পালানি যেন কোন গৃহস্থের সন্তান নয়। ও যেন ত্রিকুন্নাপুড়ার সমুদ্রতীরের সন্তান। মা বাবাকে কবে যে ও দেখেছে সেকথা ওর মনে নেই। কেমন করে বড় হল জিজ্ঞেস করলে 'ঐ একরকম করে হয়েছি' বলে উত্তর দিল। 'কে তোমাকে এত বড়টি করে তুলল'— জিজ্ঞেস করলে বলল, 'কেউ আমায় বড় করে তোলেনি। আমার জন্যে কেউ কষ্ট পায়নি, আমি আপনিই বড় হয়েছি।' যখন ছোট্ট ছিল তখন জালের দড়ি টানার কাজে ওকে জেলেরা ডেকে নিয়েছিল। হাঙর তিমিমাছ আরও নানারকম ভয়ঙ্কর জীবজন্তুতে ভরা সাগরের ভেতরে ও কাজ করেছে। কিন্তু ওর প্রাণের জন্য একটি প্রাণীও কোনদিন একটু ভাবেনি বা দয়া দেখায়নি। আর একটু বড় হলে যখন নৌকোতে কাজ পেল তখন হাতে পয়সা আসতে লাগলো। হাতে যখন টাকা থাকে তখন প্রাণভরে নিজের খুশিমতো খরচ করে। টাকা যখন থাকে না তখন কষ্টেস্বষ্টে কাটায় কিন্তু তাবলে কি সে জীবনে কোন সাধ আহ্লাদ কোন মধুর স্বপ্ন দেখেনি ? দেখেছে বৈকি।

খেতে খেতে পালানি ভাবছিল আজ অবধি ওর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায়নি। ওর পেট ভরল কিনা তাই নিয়ে কেউ চিন্তা করেনি। আজ ওকে খাওয়ানোর জন্যে এক বাড়িতে ভাল ভাল রান্নাবান্না হয়েছে। পেটভরে খাওয়ার জন্য মায়ের মতো এক স্ত্রীলোক বসে সাধাসাধি করছে। এ সমস্ত যেন ওর এক নতুন অনুভূতি। ওর পছন্দমত তরকারী রেঁধে ওকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করা এ যেন একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার।

কেন এমনি ভাবে তাকে আদর যত্ন করা হচ্ছে তা পালানি কিন্তু বুঝতে পারছেনা। কি কারণ কে জানে ? হঠাৎ চাকীর প্রশ্নে ওর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।

'বাবা তোমার বয়স কত হল ?'

'জানিনা।'

নিজের বয়স জানেনা। একি একটা কথা হল? এরপর তাহলে আর চাকী কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে যদিও হাজারটা প্রশ্ন 'ওর মনে ভীড় করে আছে। কি জাত সেটা তো জানা খুবই দরকার। কেমনভাবে জিজ্ঞেস করে?

'তা বাবা এখন তোমার থাকা হয় কোথায় ?

'একটা ছোট কুঁড়েঘর মতো আছে তাতেই থাকি।'

'তা এতো যে টাকা রোজগার কর তা সব কি কর ?'

'কি আর করব—সব খরচ করি।'

চাকী তা শুনে একটু অবাক হল। তারপর মায়ের মতো উপদেশ দিল:

'বাবা, এই মাত্তর বললে যে তোমার কেউ নেই। তা এমনি ভাবে যদি সব পয়সা খরচ করে কেল তাহলে অসুখবিসুখ করলে বা কোন বিপদ-আপদ এলে কে দেখবে তোমায়? তখন কি করবে? দুটো পয়সার জন্যে যে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে বাবা।'

পালানি যেন কথাটা অনেক ভেবেছে এমনি ভাবে বলল, 'কি আর করব ?'

কিন্তু পালানির কাছে এটা একটা সমস্যাই নয়। ও যে ভাবে এত বড়টি হয়েছে তাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। ছোট্টবেলায় যখন তাকে দেখাশোনার কেউ ছিলনা তখন নিজে নিজেই সে এত বড়টি হয়েছে। আর আজ যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে তখন অসুখবিসুখ করলে তাকে দেখবে কে এটা কি একটা খুব বড সমস্যা ?

পালানির উত্তর শুনে চাকী চুপ করে রইল। এরপর আর কি-ই বা ও জিজ্ঞেস করবে? কিন্তু ছেলেটা ভাল। ওর বিপদের দিনে 'আহা' বলতে আর আনন্দের দিনে সেই আনন্দের ভাগ নিতেও কেউই নেই। ও একা···আজ পর্যন্ত ওর বিপদ-আপদ ভালমন্দ দিয়ে কেউই মাথা ঘামায়নি। বেচারী চাকী তাই মায়ের মতো দরদ দিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করল:

'এমনিভাবে কি চিরদিন কাটান যায় বাবা ?'

'তা ছাড়া আর উপায় কি ?'

এ আবার কি জবাব? নিজের জীবনের সম্বন্ধে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওর কোন ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদ কিছুই নেই? যেমনতেমন ভাবে কেটে গেলেই হল? একজন সবল সুস্থ জোয়ান ছেলের মুখে একথা শোভা পায় না।

কিন্তু তবু ওকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। জীবনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু

যে একটা আছে সে সম্বন্ধে ও কোনদিন ভাবেনি। ওর হয়ে কেউ সেকথা ভেবেও দেয়নি। চাকী তাই বলল :

'না বাবা, এমনভাবে চলাটা ঠিক নয়।'

পালানি কিছু বললনা। চাকী আবার বলল :

'তুমি বাবা একেবারে একা। এখন অবশ্য তোমার জোয়ান বয়স, কাজ-কম্ম করে খাচ্ছ। কিন্তু চিরদিন তো এভাবে যাবে না। তাছাড়া…তাছাড়া মানুষের যে আরও কিছু চাই বাবা। দেখাশোনা করার একজন লোক চাই। তোমাকে রেঁধে বেড়ে দেবে, আদর যত্ন করে খাওয়াবে, কাছে বসবে—তাতে কত আনন্দ।'

পালানি চুপ করে রইল।

'তোমার বাবা এবার একটা বিয়ে করা দরকার।'

'তা—'

'তাহলে আমি বাবা তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক করি? তোমার আপত্তি নেই তো?'

'হ্যাঁ—তা করতে পারেন।'

চাকী তারপর খোলাখুলি জিজ্ঞেস করল :

'মেয়েটা কে তা তুমি শুনতে চাও না?'

'কে?'

'আমার মেয়ে।'

পালানি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল। কিন্তু কথাবার্তা এতটা এগোলেও যেন কিছু বাকি রইল বলে চাকীর মনে হল। ছেলেটা দেখতে-শুনতে ভালই। কিন্তু একদিকে ভাল হলেও অন্যদিকে তেমনি ঘরবাড়ি নেই, আপনার বলতে কেউ নেই—একেবারে বাউণ্ডুলে। এমনিভাবে একটা চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে ভবিষ্যতে যদি কোন গোলমাল ওঠে তাহলে কি করবে, কাকে বলবে। চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু বলল :

'আরে অত ভাবার কি আছে, ছেলেটা ভালই।'

'লোকে যদি জিজ্ঞেস করে মেয়ের বিয়ে কোথায় দিচ্ছ, তো কি বলব?'

'ও নিজের ঘরবাড়ি করে নেবে।'

কিন্তু এ সবের ওপর একটা প্রশ্ন চাকীর মনে খোঁচা মারছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা—ছেলেটার জাত তো জানতে পারলাম না।'

'মাছমারা জেলের আবার জাতফাত কি? ও হচ্ছে সাগর-মার ছেলে।'

'কিন্তু আমাদের আত্মীয়কুটুম বন্ধুবান্ধব সব যে আমাদের ছি ছি করবে।'

'করতে দাও।'

'তাহলে আমরা যে সমাজে একঘরে হব।'

'হই হব।'

চেম্পনকুঞ্জ মন ঠিক করে ফেলেছে। ও বেশ জোর দিয়েই বলল :

'আমি মেয়ের বিয়ে ওর সঙ্গে দেবই। তা সে একঘরে হই আর না হই।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আজ দু-তিনদিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে। মুহূর্তের জন্যও তার বিরতি নেই। সমুদ্রে প্রচুর চিংড়ি রয়েছে বলে জেলেরা বলাবলি করছে কিন্তু বৃষ্টির জন্য কেউ নৌকো নামাতে পারছে না। ঠাণ্ডাটাও বেশ পড়েছে এবার, তাই এই বৃষ্টি আর শীতে মাছমারারা জলে নামতে চায় না। তারাও তো মানুষ!

পরের দিন কিন্তু মেঘ কেটে গেল। সকাল থেকে রোদ একেবারে ঝিল-মিলিয়ে উঠল। রোদ দেখে নৌকোগুলো সব তাড়াহুড়ো করে জলে নামানো হল। মাছও উঠল প্রচুর। কেনাবেচা বেশ ভালই চলল। হঠাৎ আবার আকাশের রঙ্ বদলে গেল—কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল। এরকমভাবে বৃষ্টি এর আগে কখনও হয়নি। পড়ছে তো পড়ছেই। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় এ বৃষ্টি যেন কোনওদিনও থামবে না।

মাছের আড়তগুলোতে শুঁটকি, আধশুঁটকি আর সেদ্ধ করা মাছ সব জমে পাহাড় হয়ে গেছে। টাটকা চিংড়ি পচেও গেছে বেশ কিছুটা। ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ জমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে মাছের ব্যবসায়ে খুব লোকসান হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

মরশুমের গোড়ার দিকটায় আকাশ বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে ছিল, রোজ কড়া রোদ উঠত। প্রত্যেক দিনের ধরা মাছ সেইদিনই বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল। শেঠের লোকেরা রোজ মাছ কিনে চালান দিচ্ছিল। ব্যবসা বেশ জোর চলছিল। হঠাৎ এই দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া সামনে দেখে জেলেরা খুব ঘাবড়ে গেল।

পারীকুট্টির আবার এর ওপর আর এক বিপদ হল। প্রথম প্রথম যে মাল ও চালান দিয়েছিল তা বেশ ভালই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যে মাছ চালান দিল ভালভাবে শুকোয়নি বলে শেঠেরা অভিযোগ করে পাঠাল। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে পারীকুট্টির সঙ্গে কেনাবেচা তারা করতে চায় না। ওদের টাকা ফেরত দিয়ে মাল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলল।

পারীকুট্টি অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও শেঠের লোকেরা তার কথা কানে নিল না। বেচারী তখন আলেপ্পী শহরে প্রত্যেকটি মাছের দোকানে ঢুঁ মেরে ঐ মাছগুলো বিক্রী করতে চেষ্টা করল কিন্তু কেউই কিনতে চাইল না। প্রত্যেকেরই গুদাম মাছে ভর্তি হয়ে আছে। পারীকুট্টি শেষে পাঁচু পিল্লাই-এর হাতেপায়ে ধরতে লাগল—যে করে হোক শেঠের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওকে দিতে হবে। তার জন্যে ও পাঁচুকে কিছু কমিশান দিতেও রাজী। পাঁচু চেষ্টা করব বলে ওকে কথা দিল। এমনিভাবে লোকসান হলেও পাঁচু পিল্লাই-এর কাছ থেকে কিছু টাকা সে ধার পেল। কিন্তু ঐ টাকায় মালকেনার পর এই সর্বনাশা বৃষ্টি শুরু হল। পারীকুট্টির মাছ এখন পড়ে থেকে পচে যাচ্ছে, তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আর দু একদিন পরেই মাটির তলায় পচা মাল পুঁতে ফেলতে হবে।

মরসুমের কটা ভাল দিন ফুরিয়ে গিয়ে জেলেদের জীবনে আবার দুর্দিনের চরম অবস্থা নেমে এল। নৌকো যে জলে নামছে না তা নয়—মাছও উঠছে প্রচুর কিন্তু কেনাবেচা বেশী নেই। আশেপাশের গাঁগুলোতে চিংড়ি মাছ কিছু কিছু বিক্রী হচ্ছে। কালেভদ্রে দু-একটা লরি এসে মাছ নিয়ে যাচ্ছে···কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাকি মাছ সব জমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেলেরা মাছের দাম বাঁধলে সে মাছ আর বিক্রী হয় না। ব্যবসাদারেরা যে দাম বলে তাইতে মাল ছেড়ে দিতে হয়। জেলেদের হাতে পয়সা নেই বলে হোটেলগুলোরও আয় নেই। কাপড়ের দোকানগুলোর দিকে তো জেলেরা ফিরেও তাকায় না। এমনকি চিনেবাদাম ভাজাওয়ালারা তাদের বাদামভাজা বিক্রী বন্ধ করেছে।

এই অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে কে জানে। জেলেদের রোজকার সংসারের খরচ চালাবার পয়সাটি পর্যন্ত হাতে নেই। শুধু যে জেলেদের এই অবস্থা তা নয়, নৌকোর মালিকরাও এই অবস্থা থেকে বাদ পড়ল না। এদের মধ্যে বেচারা রামনকুঞ্জের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ল। ওর এবছরে কেনাবেচা একেবারেই ভাল হয়নি। আবার এর মধ্যে সুদখোর আউসেপ তার টাকার জন্যে তাগাদা দিতে আরম্ভ করেছে। চেম্পনকুঞ্জের মত আউসেপেরও নজর রামনকুঞ্জের ঐ ভাল নৌকোটার ওপর।

সেদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েই রামনকুঞ্জ আর আউসেপের মধ্যে এই নিয়ে বেশ কিছুটা কথা কাটাকাটি হল। রামনকুঞ্জ শপথ করল যে করেই হোক এক সপ্তাহের মধ্যে ও আউসেপের টাকাটা শোধ করে দেবে। রামনকুঞ্জ মনে মনে এঁটেছিল যে চেম্পনকুঞ্জের কাছে ধার নিয়ে টাকাটা শোধ করে দেবে। তাই অত সহজে আউসেপের কাছে দিব্যি খেল।

একদিন সে এই মতলব নিয়ে চেম্পনকুঞ্জের কাছে এসে কিছু টাকা ধার চাইল। এবার কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ টাকাটা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিতে রাজী হল না। অন্যবারের মত এবার যেন ওর তেমন গা নেই। রামনকুঞ্জ চেম্পনকুঞ্জের মনোভাবটা বুঝতে পেরে বলল:

'কি হে, খোলাখুলি বলই না যা বলতে চাও।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে চেম্পনকুঞ্জ বলল:

'মানে—ইয়ে, কিছু একটা না রেখে শুধু হাতে টাকাটা কি করে দিই?'

'কি রাখতে চাও বল?'

'সেটা আমি আর কি বলব?'

তা-না-না করতে করতে চেম্পনকুঞ্জ শেষে ওর মনের ইচ্ছেটা জানিয়েই ফেলল। রামনকুঞ্জের নৌকোটা বন্ধক রাখতে হবে। মনে মনে চেম্পনকুঞ্জ নিশ্চিত জানে যে এমনিভাবে নৌকোটা একদিন তার হাতে আসবে। কারণ রামনকুঞ্জ কোনদিনই নৌকোটা ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। রামনকুঞ্জ বেচারীর রাজী হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এইভাবে চেম্পনকুঞ্জের দুটো নৌকো হল, এই নিয়ে আচ্চকুঞ্জের বাড়িতে জেলেজেলেনীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। নাল্লপেন্ন বলল:

'বলি তুমি কি মরদ নাকি গো? এখনও কি করে সব দেখেশুনে ব্যাটাছেলে হয়ে বেঁচে আছ তাই ভাবছি।'

'খুব যে ছোটমুখে বড় কথা বলছিস্ হারামজাদী। আমার সব দুঃখুদুর্দশা তোর জন্যে রে পোড়াকপালী। এই মরসুমে আউসেপের কাছে যে টাকাটা জমানোর কথা ছিল সেটা কোথায় রে হতভাগী?'

'টাকা? টাকা আবার কোথায়? কাপড় না কিনে কি ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াব? আর বাসনপত্তর কিনতে হবে না—গিলতে হবে না।'

'তাহলে আমার কাছে টাকাটা থাকলে কি দোষ হতো রে মাগী?'

'তাড়ি খেয়ে উড়িয়ে দিতে।'

আচ্চকুঞ্জ আর সহ্য করতে পারল না। বৌকে ধরে বেশ ঘা কতক কষিয়ে দিল।

এদিকে আর একটা নৌকো হওয়ায় চাকীর আনন্দ দেখে কে? তবে পারীকুট্টির টাকাটা শোধ করতে না পারলে আনন্দ যেন ভরপুর হচ্ছে না। আর মেয়েটাও হয়েছে তেমনি, উঠতে-বসতে পারীকুট্টির টাকাটার কথা মনে

করিয়ে দিচ্ছে।

রামনকুঞ্জের নৌকোটা যেদিন চেম্পনকুঞ্জের হাতে এল সেদিন চাকী চেম্পন-কুঞ্জকে বলল, 'এটা কিন্তু খুব খারাপ?'

'কোনটা?'

'রাত বারোটার সময় পারীকুট্টির কাছ থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ আনিয়ে বিক্রী করে টাকা পেলে এখন ওর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছ—টাকা দেওয়া তো দূরের কথা।'

চেম্পনকুঞ্জ চাকীর কথা শুনে ওকে খুব একটা দাবড়ানি দিল।

'আমাকে দাবড়ালে কি হবে? ছেলেটা সত্যিই খুব কষ্টের মধ্যে আছে। এখন যদি ওর টাকাটা দাও তাহলে ওর খুবই উব্‌গার হয়।'

'এখন টাকা কোথায়?'

কারুতাম্মা বসে বসে মা-বাপের কথা শুনছিল। হঠাৎ ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'টাকাটা তোমার ফেরত দেওয়া উচিত বাবা।'

চেম্পনকুঞ্জ মেয়ের কথা শুনে খুবই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর এর মধ্যে মাথা গলানোর কারণটা কি শুনি?'

এ প্রশ্নের জবাব কারুতাম্মার জানা আছে। দরকার হলে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সাহসও তার আছে। অনেক কিছুই বলার আছে। সেইই যে আগে পারীকুট্টির কাছে টাকা চেয়েছিল একথাটা তার বাপকে মনে করিয়ে দেবার জন্যও ছটফট করতে লাগল। বাবার হাতে টাকা যখন ছিল না তখন পারীকুট্টি ঝুড়ি ঝুড়ি মাল বাবাকে দিয়েছে সে কার জন্যে? কাজেই পারীকুট্টির টাকাটা ফেরত দেওয়ার কথা বাবাকে সে ছাড়া আর কে জানাবে? ওদের টাকা যতই বাড়ছে পারীকুট্টির টাকা শোধ না করায় ততই ওর মনে অশান্তি বেড়ে চলেছে। যতদিন যাচ্ছে ও যেন তত বেশি করে পারীকুট্টির কাছে বাঁধা পড়ছে।

কারুতাম্মা বেঁকাস কিছু বলে ফেলবে বলে চাকী ভয় পেয়ে গেল। তাহলেই তো চিত্তির। ও তাই মাঝে পড়ে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল:

'তোমারই বা এতে রাগের কি আছে? মেয়ে তোমার ঠিকই বলেছে।'

'ওর এসব ব্যাপারে কথা কইবার কি দরকার তাই আমি জানতে চাই। ও কি টাকাটা পারীকুট্টির কাছ থেকে চেয়ে এনেছে না পারীকুট্টি ওকে টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছে?'

চাকী ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ও তবু মুখে সাহস টেনে বলল:

'পারীকুট্টি টাকাটা না চাইলে কি ও একটা কথাও বলতে পারবে না?'

চেম্পনকুঞ্জ চাকীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে মেয়েকে উপদেশ দিল, 'দেখ্, আমি একটা কথা বলে রাখি। আমরা মদ্দরা নিজেদের মধ্যে যা খুশি তাই করব। তার মধ্যে তুই মাথা গলাতে আসিসনি। তুই যাবি পরের ঘর করতে আজ বাদে কাল। এসব বিষয়ে মাথা ঘামানোর তোর দরকারটা কী?'

চেম্পনকুঞ্জ যা বলল তা ঠিকই। কারুতাম্মার এসব শিক্ষা হওয়া দরকার। ও চুপ করে রইল।

তাবপর চেম্পনকুঞ্জের রাগ গিয়ে পড়ল চাকীব ওপর :

'যত দোষ তোর মাগী। তুই যদি এমনিভাবে কথাবার্তা বলিস তাহলে তোকে দেখেই তো মেয়ে শিখবে।'

এখানেই শেষ হল না। চেম্পনকুঞ্জ বসে বসে গজ্‌গজ্ করতে লাগল। চাকী আর একটাও কথা না বলে ভয়ে ভয়ে চুপ কবে বইল। চেম্পনকুঞ্জ চলে গেলে পর মা আর মেয়ে যখন একত্রিত হল তখন চাকী মেয়েকে জিজ্ঞেস করল :

'তোব বাবাকে কি বলতে যাচ্ছিলি? বাবা তোর কিছু সন্দেহ করলে কেলেঙ্কারিটা দাঁড়াবে কোথায় সেটা বোঝার বুদ্ধি তোর ঘটে নিশ্চয়ই আছে। একেই তো পাড়ার মেয়েরা সব যা-তা বলে বেড়াচ্ছে। যদি সেসব তোর বাবার কানে ওঠে তাহলে যে কি হবে সাগব-মাই জানেন।'

কাকতাম্মা সবই জানে। তবুও বলল :

'ছোট মিয়ার টাকাটা যে করে হোক ফেরত দিতেই হবে মা।'

'আমারও তো তাই ইচ্ছে মা।'

'তুমি ঐ একই কথা বারবার বল কিন্তু টাকা ফেরত দিতে তোমাবও গা নেই মা। আমি তোমাকে কত রকম ভাবে টাকাটা জোগাড় করে দিতে বললাম কিন্তু তুমি তার কোনোটাই করলেনা।' একমুহূর্ত থেমে ও আবার বলল, 'এই ধারটা মিটে গেলেই বাস্—', কারুতাম্মা কথাটা শেষ করল না। চাকী বুঝতে পারল মেযে কি বলতে চায়।

'হ্যাঁ মা তা তো ঠিকই।'

পালানির সঙ্গে বিয়েতে মত আছে কিনা চাকী মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিল কিন্তু মেযে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। চাকী তাতে ভেবেছিল যে জবাব দিতে মেয়ের বোধহয় লজ্জা করছে। ও তাই এ নিয়ে খুব বেশী পেড়াপিড়ি করেনি। কিন্তু পারীকুট্টির সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কটা ঠিক কতটা এগিয়েছে তাই নিয়ে চাকীর মনে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে? ওর সমবয়সী বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলে তো এই নিয়ে হৈচৈ-এর আর অন্ত থাকবে না। এই

সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল মেয়ের কথাগুলো— 'এই ধারটা শোধ হলেই—বাস্— ।' একথাগুলো কারুতাম্মা বলল কেন ? এর মানেটাই বা কী ? তখন অবশ্য মেয়েকে এর জবাব দিয়েছিল কিন্তু এখন ঠিক বুঝতে পারছে না। তবু এর মধ্যে কোথায় যেন একটা কিছু আশ্বাস আছে।

ও একটু খুশি মনেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে পালানিকে মনে ধরেছে তো ?'

কারুতাম্মা কিছু বলল না। চাকী হাসি হাসি মুখে বলল, 'পালানি সত্যিই খুব ভাল ছেলেরে। আমাদের সকলের ওকে মনে ধরেছে।'

তারপর চাকী একপ্রস্থ পালানির গুণগান করতে লাগল। ছেলেটার প্রশংসা না করে উপায় নেই কিন্তু কেন জানিনা কারুতাম্মার এই প্রশংসা একেবারেই ভাল লাগছিল না। শুনতে শুনতে ওর মনের মধ্যে কেমন যেন একটা রাগ হচ্ছিল। রাগ হওয়াটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। পালানির কত বয়স সে বলেনি। কিন্তু কারুতাম্মার কি জানার অধিকার নেই ওর কত বয়স ? পালানির নিজের বলতে কেউ নেই সেটা কি খুব একটা প্রশংসার কথা ? আর সবচেয়ে বড কথা, পালানির স্থান ওর অন্তরে নেই।

চাকী অনেকক্ষণ ধরে পালানির কথা বকে যাচ্ছিল। শুনতে শুনতে কারুতাম্মার দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। মার কথার মাঝখানে ও হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—

'মা তোমার পায়ে পড়ি। একটু চুপ কর মা।' তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আরও কি সব বলল কিন্তু কান্নার শব্দ শোনা গেল না। মেয়ে যে কি বলছে চাকী কিছু বুঝতে পারল না। তবু মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল :

'তোর বিয়ের আগেই আমি পারীকুট্টির ধার-দেনা সব মিটিয়ে দেব।'

মার কথা শুনে কারুতাম্মা আর তার তীব্র ঘৃণা চাপতে পারল না। রেগে ও বলে উঠল :

'থাক্ থাক্, ধার যে কত শোধ করবে তোমরা তা আমি বুঝতে পারছি। যদি শোধই করবে তাহলে এতদিন করনি কেন ?'

'এবার তোর বাবাকে শক্ত করে চেপে ধরব।'

'হ্যাঁ তুমি আবার চেপে ধরবে ? আর চেপে ধরলেও কিছু হবে না। এর মধ্যে আমার বিয়েটাও হয়ে যাবে। আমি ঠিক জানি তোমরা তাইই চাও।'

চাকী কিন্তু জোর দিয়ে বলল, 'আচ্ছা তুই দেখ ধারটা শোধ হয় কি না।'

কারুতাম্মা কিন্তু মার কথায় বিশ্বাস করতে পারল না। কি করবে কি না

করবে, কেমন করে এই ধারটা শোধ করা যায় এই চিন্তা করতে করতে ওর মাথা গরম হয়ে উঠল। তারপর ও যেন কিছু একটা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে এমনিভাবে শক্ত গলায় মাকে জানিয়ে দিল :

'ছোট মিয়ার টাকাটা ফেরত না দিলে আমি এ বিয়েতেই বসব না। তোমরা যদি জোর করো তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। হ্যাঁ, তাইই করব।'

মেয়ের গলার আওয়াজে চাকী একটু ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, 'বালাই ষাট! এসব অলুক্ষণে কথা বলতে নেই মা।'

কারুতাম্মা ফুঁপিয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তা নয়তো কি? লোকটা দেউলে হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তোমরা তার টাকাটা দেওয়ার নামটা পর্যন্ত করছ না। আমাদের হাতে যদি টাকা না থাকত তো আলাদা কথা, কিন্তু তা তো নয়।'

তারপর ও মাকে দোষ দিতে লাগল, 'তোমারও টাকাটা ফেরত দেবার ইচ্ছে নেই।'

'আমি এই তোর সামনে দিব্যি গালছি—আমার ও বদ মতলব নেই।'

কারুতাম্মা তখন আর একটা উপায় বার করল।

'আমি এবার বাবার সামনে সব কথা খুলে বলব।'

'বাবার সামনে কী খুলে বলবি শুনি? লক্ষ্মী মা আমার, এমন কাজ কক্ষনো করিসনি।

'নইলে কোন কাজই হবে না।' তারপর কি যেন একটু ভেবে বলল, 'আমার তো বিয়ে দিতে যাচ্ছ তোমরা। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় ও যদি আমার পথ আটকায়, যদি বলে আমার টাকাটা দিয়ে যেখানে খুশি যাও, তখন?'

এরকমটা যে হতে পারে তা চাকী কখন কল্পনাই করেনি। সত্যিই তো যদি পারীকুট্টি নিজে এসে টাকা চায় তখন যে সব কেলেঙ্কারী ফাঁস হয়ে যাবে। ও ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল :

'কিন্তু ও তোর কাছে কেন টাকা চাইবে?'

'আমি চেয়েছিলাম বলেই তো ও তোমাদের টাকা দিয়েছে।'

'সে তো···সে তো তুই এমনি ঠাট্টা করে চেয়েছিলি।'

'কে বলল ঠাট্টা করে চেয়েছি?'

চাকী এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। কারুতাম্মার বিয়ের পর পারীকুট্টি ওর কাছে এসে টাকা চাইছে এ দৃশ্য যেন ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

সত্যিই তো অসম্ভব কিছু নয়। পারীকুট্টি এখন দেউলে হয়ে গেছে। হাতে একটাও পয়সা নেই, ব্যবসা লাটে উঠেছে। ও এখন বেপরোয়া হয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। কি যে হবে তখন তা সাগর-মাই জানেন।

কারুতাম্মা আবার বলল: 'আমি বাবাকে বলব বলে ঠিক করেছি, আজকেই বলব। বলতে পারবই বা না কেন?'

'লক্ষ্মী সোনা মেয়ে, বাবাকে তুই এ নিয়ে কিছু বলিসনি।'

'আমি বলবই।'

চাকী আবার মেয়ের কাছে দিব্যি খেল যে কারুতাম্মার বিয়ের আগে যে করেই হোক্ ও পারীকুট্টির দেনাটা মিটিয়ে দেবে।

সেদিন চেম্পনকুঞ্জ বাড়ি এলে চাকী ওকে একটা বিশেষ খবর দিল। মেয়ের এ বিয়েতে আপত্তি নেই তবে—এই তবেটা যে কি তা কি ও খুলে বলবে? চেম্পনকুঞ্জের কাছে কারুতাম্মার আপত্তি একটা প্রশ্নই নয়। ও তাই চাকীর কথায় বিশেষ কান দিল না।

পারীকুট্টির ধার মেটানোটা সত্যিই দরকার কিন্তু কী ভাবে যে চেম্পনকুঞ্জের সামনে এই ব্যাপারটা তুলবে চাকী তা ভেবেই পেল না।

মাছের দর খুবই পড়ে গেছে। শুধু চেম্পনকুঞ্জ কেন জেলেদের কারুর মনেই শান্তি নেই। অবশ্য কয়েকদিন পরেই দরটা একটু চড়ল। কোচিন আর আলেপ্পী শহরের গুদামের মাল জাহাজে চালান দেওয়া হল। কিন্তু রেঙ্গুনে মাছের দর তখনও কম। বড় বড় মাছের কারবারীরা বলছে যে বিক্রীর দাম কেনা দামের অর্ধেক দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে একটা মালভর্তি জাহাজ সমুদ্রে ডুবেও গেল। দাম অর্ধেক হওয়ার এও একটা কারণ। এর ফলে বেচারা পারীকুট্টির এক হাজার টাকা লোকসান হল।

আজকাল কারুতাম্মার স্বভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। চারপাশের স্থিতিগতি বদলে যাওয়ার ফলে ওর সাহসও বেড়েছে। তাছাড়া এখন ও বড় হয়েছে, নিজের শক্তিতে ওর আস্থা জেগেছে। এখন ও কাউকে বিশেষ ভয়ও করে না। পারীকুট্টিকে তাই কিছু বলার জন্যে ও সুযোগ খুঁজতে লাগল। পারীকুট্টিকে তার অনেক কিছু বলার আছে।

পারীকুট্টির সঙ্গে তার দেখাও হয়ে গেল একদিন হঠাৎ। বেড়ার এ পাশে কারুতাম্মা আর ও পাশে পারীকুট্টি। সেদিন কারুতাম্মাই আগে কথা আরম্ভ

করল। ওকে প্রাণ খুলে হাসানোর কোন সম্ভাষণ নয়। ও জিজ্ঞেস করল :

'ছোট মিয়া, তোমার ব্যবসা তো একেবারে শিকেয় উঠল।'

কারুতাম্মা এমনি ভাবে কথা শুরু করবে পারীকুট্টি ভাবতেও পারেনি। ও চুপ করে রইল। কারুতাম্মা আবার বলল :

'তোমার টাকাটা আমরা ফেরত দেব।'

'তুমি তো আমার কাছে টাকা নাওনি।

'কিন্তু আমাকেই তোমার টাকাটা শোধ করতে হবে।'

'তার মানে ?'

'তার মানে তাইই—তোমার টাকাটা শোধ করার পরই—'

কথাটা ও শেষ করতে পারল না। ওর গলায় যেন কী একটা আটকে গেছে। নিজেকে বড় অসহায় বড় ক্লান্ত মনে করতে লাগল ও। আপনার অজান্তে চোখ দুটো ওর জলে ভরে এল।

পারীকুট্টি কিন্তু ওর শেষ না হওয়া কথাটা শেষ করে বলল : 'টাকাটা শোধ করার পরই তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও—তাই না ?'

উত্তরে কারুতাম্মার চোখ দিয়ে একটার পর একটা জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল। পারীকুট্টি কিন্তু চুপ করল না, বলল :

'টাকাটা শোধ করে আমাদের মধ্যেকার এতদিনের সম্পর্কটা তুমি বরাবরের মত চুকিয়ে দিতে চাও—তাই না ?'

ওর কথাগুলো যেন তীরের মত এসে কারুতাম্মার বুকে বিঁধল। ওর মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিল। পাংশুবর্ণ সেই ফ্যাকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে পারীকুট্টির হঠাৎ মনে হল কারুতাম্মা বড় অসহায়। কিন্তু ও তো কারুতাম্মার মনে আঘাত দিতে এ কথাগুলো বলে নি। ও কারুতাম্মার উত্তর শুনতে চায়। তাই চুপ করে কারুতাম্মার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কারুতাম্মা অনেকক্ষণ ধরে নিজের শক্তি সংগ্রহ করে বলল :

'না-না তা নয়, তা নয়, ছোট মিয়া···তোমার জীবন সুখের হোক তোমার ভালো হোক্।'

পারীকুট্টি সেই আগের লঘুচিত্ত প্রেমিক আর নেই। কারুতাম্মার কথা শুনে একটু মৃদু হাসল—অর্থপূর্ণ মৃদু হাসি।

'তুমি আমার ভাল চাইছ কারুতাম্মা ? বলছ যে আমি জীবনে সুখী হই ?'

পারীকুট্টির এই প্রশ্নের অর্থ কারুতাম্মা বুঝতে পারল। তার অর্থ যে পারীকুট্টি

কোনদিনও সুখী হবে না। তার ভালোও হবে না। এর পরে কারুতাম্মা আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। ও আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে চলে গেল। পারীকুট্টি আরও একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।

সেদিন রাতে চেম্পনকুঞ্জ খুশিতে ডগমগ হয়ে চাকীকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল :

'শোন্, জবর খবর আছে। পালানি পণ না নিয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।'

কথাটা চাকীর বিশ্বাস হল না। জিজ্ঞেস করল, 'কেন? পণ নেবে না কেন? কারণটা কি?'

'কারণ আবার কি? পণ না নিয়েই ও বিয়ে করবে।'

চাকী চেম্পনকুঞ্জর দিকে বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চেম্পনকুঞ্জ তখন দিব্যি খেয়ে বলল, 'সাগর-মার নাম নিয়ে বলছি, বিশ্বেস কর। পালানি বলেছে কিছু না নিয়েই কারুতাম্মাকে বিয়ে করবে।'

চাকী বলল, 'পণ না হয় নাই নিল, কিন্তু তা বলে আমাদের কিছু কর্তব্য নেই? আমরা শুধু হাতে মেয়েটাকে গছিয়ে দেব? তোমার কি চক্ষুলজ্জা বলে কিছু নেই গো?' চাকী জবাবের জন্য চেম্পনকুঞ্জের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পালানি বিনাপণে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। তাতে খুশি না হয়ে মাগী বলে কিনা মেয়েকে শুধু হাতে কেন পাঠাব। চেম্পনকুঞ্জ চাকীর বুদ্ধিবিবেচনা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল।

চাকী তখন কড়া গলায় বলল :

'চালচুলো নেই বাউণ্ডুলে ঐ ছেলেটাকে কিছু না নিয়ে বিয়ে করতে জোর করে রাজী করিয়েছ তুমি।'

চেম্পনকুঞ্জ এই অভিযোগে একটু ঘাবড়ে গেল। ও বলে উঠল :

'দূর মাগী, কি বাজে বকছিস। আমি ওকে একটা কথাও বলিনি। ও নিজে নিজেই রাজী হয়েছে।'

চাকী তখন গম্ভীর হয়ে দার্শনিকের মতো একটা প্রশ্ন করল :

'এইসব টাকা পয়সা কিসের জন্যে? কার জন্যে?'

'আমার টাকাপয়সা কোথায়?'

'মেয়েকে জন্মের মতো একজনের কাছে বিদেয় করে দিচ্ছ আর পণের টাকাটা দেবেনা?'

'আরে জ্যালা আপদরে বাপু। তার যদি টাকাটা দরকার না থাকে ?'

'আমি তো তাই জিজ্ঞেস করছি, কার জন্যে তাহলে এই সব টাকাপয়সা ?'

তারপর চাকী অনেক কথা বলল :

'বুড়োবয়সে ছেলে-ছোকরার মতো সুখে থাকার স্বপ্ন দেখছ তুমি। নতুন তোশক বালিশ বানাচ্ছ। তোমার মুখে আগুন! আমি মরে গেলে সোন্দর দেখে একটা মেয়ে এনে সাধ আহ্লাদ মিটিয়ো। কিন্তু যদ্দিন আমি বেঁচে আছি তদ্দিন আমার একটা কর্তব্য আছে।' তারপর বেশ গম্ভীর ভাবে বলল 'এসব টাকাপয়সায় আমারও ভাগ আছে।'

চেম্পনকুঞ্জ হেসে চাকীর কথাগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্ট করল। বলল, 'হ্যাঁ তাইতো বলছি আমরা দুজনেই ভোগ করব। তোশক তো তোরও জন্যে।'

চাকী ভীষণ রেগে গেল আর চীৎকার করে উঠে চেম্পনকুঞ্জকে গালাগালি করতে লাগল। চেঁচামেচি বেশি হলে লোকজন এসে জড়ো হবে—চেম্পনকুঞ্জ সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার কারুতাম্মা মার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল :

'আমার পণের টাকার দরকার নেই মা।'

'তোর দরকার নাই বা রইল, তা বলে মেয়ের বিয়ের সময় তার মা-বাপ কানাকড়ি ঠেকাবে না, এ কেমন কথা ? লোকে যে আমাদের ছি ছি করবে। আর তা ছাড়া তোর হাতেও তো কিছু টাকা থাকা দরকার।'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে কারুতাম্মা বলল :

'না তার আর দরকার কি মা ? আমার তো ননদ ভাজ শ্বশুর শাশুড়ী কেউই নেই। তোমরা তো দেখেশুনে সেই রকম ঘরেই বিয়ে দিচ্ছ।'

মেয়ের কথাটা মার মনে খটাং করে লাগল। তিনকুলে কেউ নেই এমনি একটা বাউণ্ডুলে হাঘরের হাতে মেয়েকে তারা গছিয়ে দিচ্ছে, মেয়ে নিজে একথা বলতে পারল ? ও একটু চুপ করে থেকে বলল :

'তা শাশুড়ী ননদ নাই বা থাকল। গাঁয়ের লোক পাড়া পিতিবেশী তো আছে।'

কারুতাম্মা বলল, 'ওঃ, গাঁয়ের লোক! কি সব আমার আপনার লোকরে।'

তারপর বলল : 'আমাকে কোন রকমে তাড়াতে পারলে বাঁচ তোমরা। আচ্ছা তাই সই। কিন্তু যে টাকাটা বাঁচবে সেটা ছোট মিয়াকে দিয়ে দাও।'

একমুহূর্ত থেমে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—'মা, লোকটা দেউলে হয়ে গেছে—লোকটাকে এমনি ভাবে পথে বসিয়ে দিয়ে আমি কিছুতেই চলে যেতে পারব না। আমি যদি ওর এই অবস্থায় চলে যাই তাহলে ও ঠিক মরে যাবে মা।'

কারুতাম্মার যা কিছু বলার ছিল সব বলে দিল। ওদের মধ্যে যে একটা নিগূঢ় বন্ধন আছে তা এই কটি কথায় সব বলা হয়ে গেল। কিন্তু চাকী সেটা ঠিক বুঝতে পারল না। যদি কিছু বুঝতে পারত তাহলে মা হয়ে সে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে পারত। কিংবা চাকী হয়তো সবই বুঝছে। মা যে অন্তর্যামী। মেয়ের ঘৃণা ভালোবাসার কথা সে সব বুঝতে পারে। সে মেয়ের মনের ভেতরের মনটাকে পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেখতে পায়। তাই সব জেনে সে হয়তো চুপ করে রইল। মেয়ের দুঃখ-বেদনা চাকী আজ যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পারল। একটুখানি চুপ করে থেকে ও বলল :

'তুই ভাবিসনে খুকী। তোর মা তোকে কথা দিচ্ছে যে সে ওই দেনাটা শোধ করবে।'

'কিন্তু বাবার যে মোটেই গা নেই মা।'

'আমায় কি করতে হবে বল।'

'বাবার টাকা চুরি করেও তোমার এই ধার শোধ করা উচিত।'

কিন্তু মিনসে জানতে পারলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। চাকীর তাই টাকা চুরি করার সাহস নেই। চাকী আজ পর্যন্ত এ কাজ কক্ষণো করেওনি। কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল :

'তোমার কি চুরি করতে ভয় করছে ?'

হ্যাঁ, চাকীর ভয়ই করে। তাইতো ও হাজার দিব্যি খাওয়ার পরেও টাকাটা পারীকুট্টিকে দিতে পারে নি।

মরসুমের গোড়ার দিকটা খুব হাতে টাকা এসেছিল। তখন রোজ যদি তার থেকে কিছু কিছু সরিয়ে রাখত তাহলে আজ মিনসের অজানতেই টাকাটা শোধ করা যেত। কিন্তু কারুতাম্মা ছাড়ল না। ও মাকে ক্রমাগত সাহস জোগাতে লাগল। ক্রমে চাকীরও মনে হল—হ্যাঁ চুরি করাটা কিছু খারাপ নয়। পারীকুট্টির টাকাটা শোধ দেওয়ার জন্য চুরি করলেও দোষ নেই। তাই একদিন ভোরে চেম্পনকুঞ্জ মাছ ধরতে বেরিয়ে গেলে মা আর মেয়ে বাক্স খুলে কিছু টাকা সরাল। সে দিন সারাদিনটা দুজনে খুব

ভয়ে ভয়ে কাটাল। রাতে বাড়ি ফিরে চেম্পনকুঞ্জ সেদিনকার টাকাটা বাক্সে রেখে চাবি দিল। সেদিন কত টাকা পেয়েছে চাকী জিজ্ঞেস করলে চেম্পনকুঞ্জ বলল :

'বাজার খুব খারাপ—কারুরই এখন চিংড়ি মাছ চাই না।'

'তাহলেও কত পেলে ?'

'সে তোর জানার দরকার নেই।'

রোজই মা আর মেয়ে বাক্স থেকে অল্প অল্প করে টাকা সরাতে আরম্ভ করল। একদিন চেম্পনকুঞ্জ বাক্স খুলে টাকাপয়সা গুণতে আরম্ভ করল। সেদিন মা আর মেয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে রইল। টাকা গুণে চেম্পনকুঞ্জ যখন বাক্স বন্ধ করল তখন দুজনেই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। চেম্পনকুঞ্জ ওদের ধরতে পারে নি। এরপর একদিন মেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'হাতে কত হল মা ?'

কয়েকদিনের মধ্যেই সত্তর টাকা জমেছে। বাড়িতে কিছু শুঁটকি মাছও ছিল। সেগুলো বিক্রী করলে কমসেকম দশ-বিশ টাকা পাওয়া যাবে। টাকা কম হলেও যা জমবে তাই পারীকুট্টিকে দেবে বলে মা আর মেয়ে ঠিক করল।

নবম পরিচ্ছেদ

কারুতাম্মার বিয়ের ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে। খুব একটা কিছু ঘটাঘটি করার ইচ্ছে চেম্পনকুঞ্জের ছিল না। খরচ যাতে বেশি না হয় সেইদিকেই ও বেশি নজর দিচ্ছিল। পালানির কেউ না থাকায় একদিক দিয়ে বেশ সুবিধেই হল। কেউ কিছু বলার বা জিজ্ঞেস করার নেই। এই চাই, ওই চাই করে হাজারটা দাবীদাওয়াও নেই। পালানির গাঁয়ের মোড়লকে পানসুপারি আর কিছু টাকা দক্ষিণা দিতে চেম্পনকুঞ্জ পালানির সঙ্গে গিয়েছিল। নিজের গাঁয়ের মোড়লকে চেম্পনকুঞ্জ দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করল।

বাস্! এইবার গাঁয়ের লোকের মুখ বন্ধ হল। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না বলে কি কেচ্ছাই না তারা রটাচ্ছিল। এখন তারা একটা কথাও বলতে পারবে না। চেম্পনকুঞ্জ চাকীর সামনে বুক ফুলিয়ে বলল :

'কিরে, এবার বুঝতে পারছিস তো এই চেম্পনকুঞ্জকে দিয়ে সব কাজই হয়।'

চাকী পাল্টা জবাব দিল, 'থাক্-থাক্ আর বাহাদুরি করো না। ভারি তো একটা ছেলে, চাল নেই চুলো নেই, তাই নিয়ে আবার বড়াই করতে এসেছ।'

'আরে মাগী তুই থাম্। যা জানিস না তাই নিয়ে মাতব্বরী করিস না। এরকম একটা ছেলে তুই আমাদের জেলেপাড়ায় একটা বের কর দেখি। অমন জোয়ান ছেলে এ তল্লাটে একটাও নেই, তারপর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রোজগার করছে ও।'

চাকী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল :

'এবার তো তোমার পোয়াবারো। মেয়েটাকে বিদেয় করে বেশ মজায় থাকবে বলেই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ তা তুই ঠিক ধরেছিস। আমার একটু আরামে থাকার সাধ আছে, ঠিক ঐ পাল্লীকুন্নাথের কাণ্ডান্‌কোরানের মতো।'

চাকী এই সুযোগে বলল, 'তাতো বুঝলুম, কিন্তু পারীকুট্টির টাকাটা তো আজ পর্যন্ত দিলে না।'

মহা বিরক্ত হয়ে চেম্পনকুঞ্জ বলল :

'কারুতাম্মার বিয়ের কথা উঠলেই ওই টাকাটা শোধ দেওয়ার কথা তোর যেন একটা অব্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

কথাটা শুনে চাকী চমকে উঠল। ঠিকই তো! যখনই কারুতাম্মার বিয়ের কথা ওঠে তখনই পারীকুট্টির ধার শোধ করার কথাটা মনে পড়ে। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ যে এমনভাবে জিজ্ঞেস করবে চাকী তা ভাবতে পারেনি। তবু চাকী ভেবেচিন্তে একটা জবাব খুঁজে বার করল :

'আমরা তো ছোঁড়াছুঁড়ির মতো আমোদ-আহ্লাদ করতে যাচ্ছি, কিন্তু ধারটা শোধ না করতে পারলে মনটা কেমন যেন খচ্‌খচ্‌ করে।'

'আরে, সেকথা আমি ভুলিনি, হাতে যেই কিছু ফালতু টাকা পাব তক্ষুনি ধার-দেনা সব মিটিয়ে দেব।'

একটু পরে বেশ যেন একটা রহস্য উদ্‌ঘাটনের সুরে সে বলল, 'দেখ, আমাদের তো কোনও ছেলে নেই। আমি একটা উপায় ঠাউরেছি, পালানিকে আমরা ছেলে করে নিই না কেন?'

চাকী খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পালানি তো আমাদের ছেলের মতোই।'

চাকী ওর কথাটা ঠিক ধরতে পারে নি। চেম্পনকুঞ্জ তখন সব কথা খুলে বলল, 'দেখ, পালানির কেউ নেই। তাই বিয়ের পর ও যদি আমাদের ঘরজামাই হয়ে থাকে তাহলে খুবই ভাল হয়। এখন আমাদের দুটো নৌকো আছে। পালানিকে যদি ঘরজামাই করা যায় তাহলে ও আমাদের খুবই সাহায্য করতে পারবে। ছেলেটা ভাল হাল ধরে। সবদিক দিয়েই খুব সুবিধে হয়। তোর কী মনে হয়?'

চাকী কথাগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনল। মতলবটা ভালই। ওদের ছেলে নেই। এমনি ভাবে ছেলের অভাব মিটবে। তবে একটা সন্দেহ আছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু পালানি কি রাজী হবে?'

'রাজী না হওয়ার কি আছে?'

'কি জানি বাপু, আমার তো মনে হয় না ও রাজী হবে। কোনও জেলের ছেলেকে কি তুমি তার শ্বশুরবাড়িতে থাকতে দেখেছ?'

কথাটা ভাববার বটে। তাই কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে চেম্পনকুঞ্জ বলল :

'নাঃ, ও থাকতে রাজী হবে। ছেলেটা বড্ড ভালরে, বড্ড ভাল।'

চাকী বলল, 'আর না থাকতে চাইলে? এই তুমি নিজেকেই দেখো না। বিয়ের পর পুরো দুটো দিন তুমি কখনো শ্বশুরবাড়ি থাকনি।'

'আমি থাকিনি আমার বাড়িঘর মা-বাপ ছিল বলে। পালানি থাকবে তার কেউ নেই বলে।'

কিন্তু চাকীর কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না যে পালানি ওদের বাড়ি থাকতে রাজী হবে।

বাবার এই মতলবের কথা কারুতাম্মার একটুও ভাল লাগল না। মাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিল, বিয়ের পর ও কিছুতেই বাপের বাড়িতে থাকবে না। মেয়ের কথা শুনে চাকী হাঁ হয়ে গেল। মেয়েকে বলল :

'ধন্যি মেয়ে তুই। বিয়ে না হতে হতেই তুই আমাদের ভুলতে চাস্। তোকে তাহলে এত কষ্ট করে মানুষ করাটাই আমাদের ঝকমারি হয়েছে। মরদ জুটতে না জুটতেই তোর আমাদের ওপর টান কমে গেল। দেখালি বটে তুই।'

মার কথাগুলো কারুতাম্মার বুকে গিয়ে তীরের মতো বিঁধল। মা যে ওর কথা এমন ভাবে ঘুরিয়ে নেবে তা ও ধারণাই করতে পারেনি। মা-বাপের ওপর টান নেই বলে কি ও অমন কথা বলেছে? বিয়ের পর বাপের বাড়িতে থাকার মান-অপমান নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছে না কারণ সে তার মায়ের মেয়ে। মায়ের বাড়িতে থাকায় মেয়ের আবার মান-আপমান কি? মা যে তাকে কত ভালোবাসে তাতো সে জানে। তারপর রয়েছে ছোট বোন পঞ্চমী। তাকে ছেড়েও তো সে থাকতে পারবে না। যেদিন এ বাড়ি ছেড়ে ও বাইরে পা বাড়াবে সেদিন···সেদিন কেমন করে এদের সকলকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট সে সইবে?

তবু—তবু এই গাঁ ছেড়ে, এর ছোঁয়া থেকে দূরে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে পারলে সে যেন বাঁচে। কারুতাম্মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কান্না-ভেজা স্বরে বলল—'মা, আমি তা বলছি না। তুমি অমন করে বল না। আমার যে কত কষ্ট হয় এসব কথা শুনলে তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। মা, তুমি আর বাবা ছাড়া আমার আর কে আছে? মা—' বলতে বলতে কারুতাম্মা কান্নায় মার কাঁধে ভেঙে পড়ল।

চাকী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। চাকী অতশত ভেবে বলেনি। মেয়ে যে ওর কথা শুনে এত কষ্ট পাবে তা ও বুঝতে পারে নি। তাহলে কি ও বলতো! কারুতাম্মা তখনও অঝোরে কেঁদে চলেছে। মেয়ের কান্না দেখে চাকী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার চোখ দিয়েও টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে কারুতাম্মা বলল :

'আমি···আমি এখানে থাকতে চাই না মা। চল আমরা সকলে অন্য কোথাও চলে যাই। এখান থেকে অনেক দূরে। চল মা, যাবে ?'

চাকী মিষ্টি গলায় বলল, 'কি সব আবোলতাবোল বকছিস ?'

ব্যথাতুর কণ্ঠে কারুতাম্মা বলল, 'আমি···আমি এই সমুদ্দুরের ধারে থাকলে···'

'ধারে থাকলে···?'

কারুতাম্মা কি যেন বলতে চায়। চাকী এতক্ষণ ভাবছিল যে মেয়ে তার কথায় কাঁদছে। কিন্তু তাতো নয়। কি যেন একটা বড রকমের দুঃখ মেয়ের মনে জমাট বেঁধে রয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ যে কতখানি চাকী তা জানতে পারেনি। তারই জন্যে মেয়ে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছে।

কারুতাম্মা আবার কাঁদতে শুরু করল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে দাঁতে দাঁত চেপে ও বলল, 'মা, আমি এখানে থাকলে সমুদ্দুর শুকিয়ে যাবে···একেবারে শুকিয়ে যাবে।'

চাকী মেয়ের কথা শুনে চমকে উঠল। মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ছিঃ, মা অমন সব অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস নি।'

'মা, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে। না পালালে আমাকে আর বাঁচতে হবে না। মা, তোমাকে ছাড়া এসব কথা আমি আর কাকে বলব, কে আমার দুঃখ বুঝবে মা ?'

সত্যি কথা। মনের সব কথা খুলে বলবার লোক কারুতাম্মার মা ছাড়া আর কেউ নেই। তবু কি সব কথা খুলে বলা যায় ? না, তা সম্ভব ?

চাকী বলল, 'ঐ মুসলমানটা তোকে মন্তরটন্তর করেনি তো ?'

কারুতাম্মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না মা, মন্তরটন্তর ও কিছুই করেনি।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা মা, আমাদের এই সমুদ্দুরের ধারে এই রকমের মেয়ে কি আগে ছিল ?'

'কোন রকমের ?'

'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছনা, মা ?'

'হায় হায় সাগর-মা, আমার সোনা মেয়ে এসব কি পাগলের মতো বকছে গো।'

'আমি পাগলের মতো বকছি না মা। আমি এখনও পাগল হইনি। আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই রকমের কোন মেয়ে আমাদের এই গাঁয়ে আগে ছিল কিনা ?'

ওর মনে যে প্রশ্ন বাসা বেঁধে রয়েছে, তা খুলে মেলে কি করে মাকে যে বলবে কারুতাম্মা তা বুঝতে পারছে না। যে ধরনের মেয়ের কথা ও মাকে জিজ্ঞেস করছে সে যে কি ধরনের মেয়ে তা ও জানে। কিন্তু ও জানতে চায় এমন কোন জেলে-মেয়ের কথা যে অন্যজাতের ছেলেকে ভালোবেসেছে। এমন ভাবে ভালোবাসাটা অন্যায় জেনেও তার থেকে মন সরিয়ে নিতে বহু চেষ্টা করেও যে প্রেম দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এমনি কোন মেয়ে ওর আগে ওদের এই সমুদ্রের ধারে জন্মেছিল কিনা তাই ও জানতে চেয়েছে। যে মেয়ের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সেই অবৈধ প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠেছিল, এমনি এক মেয়ের বাস্তব কাহিনী কি সেই সমুদ্রতীরের আকাশে-বাতাসে মিশে আছে ? সে আরও জানতে চেয়েছে, এক জেলের মেয়ে অন্য জাতের ছেলেকে ভালোবেসে ব্যর্থ হয়েছে কিনা। ওর মতোই সেই মেয়ের জীবন যৌবন ব্যথায় ভরে গেছে কিনা। এই সমুদ্রের ধারের বালিগুলো কোনও প্রেমিকের গানে চৈতন্য পেয়ে শিউরে উঠছে কিনা। সেই রকম মেয়ের কাহিনী কি মা জানে ? এই ধরনের মেয়ে তাদের গাঁয়ে ছিল কিনা তাই সে জানতে চেয়েছে।

কিন্তু এসব প্রশ্ন মার কাছে কি করে করা যায় ?

হতে পারে এই সমুদ্রের ধারে কোনো হতাশ প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের ব্যর্থপ্রেম নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। হয়তো কোনও প্রেমিকা ব্যর্থ প্রেম বুকের ভেতর লুকিয়ে মা-বাপের কথা মতো আর একজনের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে আর নয়তো সে আত্মহত্যা করেছে একান্ত নিরুপায় হয়ে।

কিন্তু কারুতাম্মার মনে হয় তার মত হতভাগিনী মেয়ে এই সমুদ্রের ধারে আর দেখা যায় নি। সেই একমাত্র মেয়ে যে অন্যজাতের পুরুষকে ভালোবেসেছে। তাদের এই উপকূলে আরও বহু প্রেমের কাহিনী থাকলেও বাস্তবে সেই একমাত্র মেয়ে যে সেই প্রেমের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। মেয়েকে অমনিভাবে চুপচাপ ভাবতে দেখে চাকী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু কি খারাপ কাজ

করেছিস মা ?'

কারুতাম্মার মনের তখন যা অবস্থা তাতে মার কথাগুলোর মানে ও ঠিক বুঝতে পারলনা। চাকী তখন খুলে বলল, 'তোদের এখন ডাগর বয়স। এ সময়…'

কারুতাম্মা এবার বুঝতে পারল মা কী বলতে চায় কিন্তু সে কথার ও গুরুত্ব দিল না। তবুও বলল, 'না মা, আমি নষ্ট হয়নি।'

তারপর মার কাছে একটা কাতর অনুরোধ জানাল, মা যেন ওকে রক্ষা করে। কি যেন একটা ভয়ানক ভয় ওর মনে ঢুকেছে। সেই ভয় যেন একটা অতিকায় জন্তুর মতো হাঁ করে ওকে গেলার জন্য এগিয়ে আসছে। এই ভয়ের কালো ছায়া থেকে রক্ষা পেতে হবে, বাঁচতে হবে। মা তখন মেয়েকে কথা দিল যে এই ভয় থেকে সে তাকে বাঁচাবে।

'বিয়ের দিনই তোকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেব।' মা মেয়েকে আশ্বাস দিল।

কারুতাম্মার বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল পাড়া-প্রতিবেশী অন্য জেলে-মেয়েরা তত কারুতাম্মাকে সব সময় ঘিরে রাখতে লাগল। ওদের মধ্যে কতকগুলো নিয়ম হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। বিয়ে ঠিক হলে পর বিয়ের কনেকে স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া পাড়াপ্রতিবেশীর কর্তব্য। শ্বশুরবাড়িতে নতুন বউএর ভুলচুকের জন্য দায়ী তার পাড়াপড়শীরা। নাল্লপেন্ন তাই কারুতাম্মাকে বলল, 'মা, মনে রাখিস, একটা ব্যাটাছেলেকে তোর হাতে তুলে দিচ্ছি। তোকে একটা ব্যাটাছেলের হাতে তুলে দিচ্ছি না। মনে রাখিস্ কথাটা।'

কালিকুঞ্জ বলল অন্য কথা, 'মনে রাখিস মা, তোর মদ্দকে সমুদ্দুরে থাকতে হবে। তুই তোর রীতভীত নিয়ে ঠিক থাকিস।'

কুঞ্জপেন্ন বলল, 'মেয়েদের মনই তাড়াতাড়ি খারাপ হয় মা।'

এমনিভাবে পাড়াপড়শীরা নানাজন নানাভাবে উপদেশ দিল। এরা সকলেই নিজেদের বিয়ের সময় এইসব উপদেশ পেয়েছে ; সেগুলোই তারা আর একজনকে ফিরিয়ে দিল। যেন এমনিভাবে তাদের দেনা তারা শোধ করল। ওদের গাঁ থেকে যে মেয়ে ওদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাকে এসব উপদেশ বিলোতে ওদের একটুও কার্পণ্য দেখা যায় না। খুব আনন্দিত মনেই তারা এ উপদেশ দেয়, দিয়ে খুশিও হয়।

কারুতাম্মা সব চুপ করে শুনল। ওদের এই সব উপদেশ ওর মনে এখন ঠেসে রয়েছে। কিন্তু একটা কথা, শুধু একটা কথা এদের ও জিজ্ঞেস করতে চায় যা ও মাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। তা হচ্ছে, এই সমুদ্রের ধারে ওদের গাঁয়ের কোন জেলের মেয়ে কি অন্য জাতের কোন ছেলেকে ভালোবেসেছে? আর সেই ছেলে তাকে ভালবাসে জেনেও কি সেই মেয়ে অন্য আর একজনকে বিয়ে করেছে?

সমস্ত বুক জুড়ে এই প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু ও কাউকেই কিছু জিজ্ঞেস করল না। ওর খুবই জানতে ইচ্ছে করছিল যে এমন যদি আর কোনও মেয়ে থাকে তাহলে সেই হতভাগিনীর পরিণতি কী, কিছুই জিজ্ঞেস না করে ও পাড়াপড়শীদের উপদেশ শুনে গেল।

যখন নির্জনে একা বসে থাকে তখন কারুতাম্মার মনে হয় যেন এক ভাগ্যহীনা অভিশপ্তা মেয়ের আত্মা এই বেলাভূমির আকাশে-বাতাসে গভীর অতৃপ্তি আর প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কারুতাম্মা বসে বসে অনুভব করে অজানা এক ভাষায় অব্যক্ত এক জীবনকাহিনী যেন ওর সামনে বলে চলেছে। ওর মতো প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ভগ্নহৃদয় নিয়ে অনেক প্রেমিকাই এই সমুদ্রের ধারে জন্ম নিয়েছে বলে ওর ধারণা। সমুদ্রের হাওয়ায় তাদেরই জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী ভেসে বেড়াচ্ছে। নারকেল গাছের পাতা সোঁ সোঁ করে তাদেরই দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। চরের বালিস্তূপে সেই সব হতাশ প্রেমিকাদের অস্থি ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশে গেছে। তারা হয়তো আজ আর একজনের দুঃখের সেই একই পরিণতি দেখে শিউরে উঠছে।

এমনিভাবে ভাবতে ভাবতে কারুতাম্মা একদিন নাল্লপেন্নকে জিজ্ঞেস করল, 'কাকী, আমাদের এই সমুদ্দুরের ধারের নষ্ট মেয়েদের কোন গল্প তুমি জান? শুনেছ?'

হ্যাঁ, নাল্লপেন্ন শুনেছে সে গল্প—অপূর্ব সে গল্প। কিন্তু বেশি নয়—দুচারটি। তারা কেউ অবশ্য ইচ্ছে করে খারাপ পথে পা দেয়নি। ওদের মধ্যে একটা গান প্রচলিত আছে। সেই গানে আছে এমনি একটি নষ্ট মেয়ের কথা। তার চরিত্র খারাপ হয়েছিল বলে পাহাড় সমান ঢেউ সমুদ্র থেকে উঠে তীরে আছড়ে পড়েছিল। বিষাক্ত বিরাট বিরাট সাপ সমুদ্র থেকে উঠে এসে এই বেলাভূমিতে চলাফেরা শুরু করেছিল। গুহার মতো হাঁ করে অতিকায় সামুদ্রিক জন্তুরা জেলেদের নৌকোকে ধাওয়া করেছিল। এ সবই পুরোনো গল্প। সেই গানের কিছুটা গেয়েও নাল্লপেন্ন কারুতাম্মাকে শোনাল। তারপর বলল:

'এই হচ্ছে আমাদের সমুদ্দুরের ধারের নিয়ম মা।'

কারুতাম্মা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কাকী, এখনও কি সেই নিয়ম চলে আসছে?'

'নাঃ, এখন আর অত নিয়মটিয়ম কেউ মানে না। তবু জেলেনীদের রীতি ঠিক রাখতে হয় মা। নইলে সব্বনাশ হয়।'

একদিন ওর পাড়াপড়শী ছোটমেয়েরা ওকে বলল :

'কারুতাম্মা দিদি, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, না?'

সেই বাচ্চা মেয়েগুলোকে ওর বেশ একটা ভারী উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছে হওয়ায় ও বলল, 'দেখ্, শুকনো ঝরে-যাওয়া পাতার মতো তোরা যেন এই সমুদ্দুরের ধারে ছোটাছুটি করিসনি।'

বাচ্চা মেয়েগুলো ওর এই কথা বুঝতে পারল কিনা কে জানে, কিন্তু ওরা এই কথাগুলো আরও পাঁচজনকে বলে বেড়াল।

কারুতাম্মার এই সমুদ্রতীর ছেড়ে যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। যে সমুদ্রের ধারে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানকার বালিতে দৌড়ঝাঁপ করে বড় হয়েছে, যেখানে তার যত আনন্দ যত বেদনা লুকিয়ে আছে, সেই গাঁ, সেই সমুদ্রের ধার ছেড়ে যেতে তার যে কি কষ্ট হবে সেকি আর কেউ বুঝতে পারছে। এই গাঁ—এই হাসি-ঝলমল সমুদ্রতীর, এখানকার মানুষ, সর্বোপরি পারীকুট্টি—সকলকে সে ভুলবে কি করে?

এখান থেকে বিদায় নিয়ে কোন গাঁয়ে সে যাবে তা কে জানে? সেখানকার সমুদ্রতীর কেমন হবে কে জানে? ও ভাবতে লাগল—এমনি করে কি সেখানকার সমুদ্রের ধারেও সূর্য তার রাঙা আলো ছড়িয়ে জলের মধ্যে ডুবে যায়? এ সমুদ্র শান্ত থাকুক বা ঝড়-তুফানই উঠুক, তবু এর মত সুন্দর বুঝি আর কোনও সমুদ্র নয়। আর সেই হতভাগিনী জেলেনীর গান এখানকার সমুদ্রের যে বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই বাতাসটাও কি ঠাণ্ডা। ঠিক এমনটি কি হবে সেখানকার সেই সমুদ্রের তীর? কে জানে!

আর সেখানকার লোকেরা? তারা কেমনতর? হয়তো তারাও ভালবাসতে জানে, কিন্তু তবু এই সমুদ্রের তীরের ভালবাসা, সেই মিষ্টি স্বাদ কি সে আর কখনও আর কোথায়ও পাবে? এই ভালবাসার বাঁধন কাটিয়ে তাকে চলে যেতে হবে।

ও রোজই উপকূলের প্রতিটি জিনিসের কাছে বিদায় নিতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল—'আমি চললাম রে, তোদের সবাইকে ছেড়ে চললাম।'

সেদিন ছিল চাঁদনী রাত আর সমুদ্র ছিল শান্ত, অচঞ্চল। জ্যোৎস্না উঠেছিল ফুটফুটে আর সেই জ্যোৎস্নায় কার যেন গানের সুর মিশে গিয়ে সমুদ্রতীরে কাকে যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

পারীকুট্টি গান করছিল।

কিন্তু কারুতাম্মার কানে যে গান এসে বাজছিল তা পারীকুট্টির নয়। যেন পারীকুট্টি বলে ও কাউকে চেনে না। শুধু গানের সেই অশরীরী রূপ ওকে যেন কোন আনন্দলোক থেকে ডাক দিচ্ছে আর ডাক দিচ্ছে সমুদ্র তার একটানা ঢেউএর শব্দে। ওর জীবনের সমস্ত আনন্দ সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা যেন আজ মূর্ত হয়ে ওকে ডাক দিচ্ছে। যে গান ওর কানে এখন ভেসে আসছে, যে গান ওকে ডাক দিচ্ছে তা যেন সমুদ্রের গান। যে সমুদ্রের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তার শেষ গান।

এই সমুদ্রের উপকূলে যা-যা ও ভালবেসেছে, যাকে যাকে ওর ভাল লেগেছে তাদের সকলের কথা এই গান যেন তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ক্রমে সেই গান তার হৃদয় দুয়ারে ঘা দিতে লাগল। যেন বলতে লাগল—'খোল্ খোল্, আগল খোল, এখনও তুই চুপচাপ বসে আছিস।'

কারুতাম্মা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। ও বিছানা থেকে উঠে বসল। এবার পারীকুট্টির মুখের ছবিটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এবার বুঝতে পারল কার গান; কে তাকে ডাকছে। ওর মনে হল পারীকুট্টি সত্যিই যেন তাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকছে। গান ছাড়া পারীকুট্টি আর কি দেবে তাকে? কি দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করবে? কারুতাম্মা তো জানে শুধু আজ নয় চিরদিন . চিরদিন ও গান গাইবে। ও চলে গেলেও সে গাইবে।

মা ঘুমিয়ে আছে। বাবাও যেন কোথায় গেছে। এখন সমুদ্রের তীর স্তব্ধ নির্জন তা ও জানে। দরজা খুলে ছুটে বাইরে যাবার একটা প্রবল আগ্রহ ওর মনে জাগল।

গান যে গাইছে তার হৃদয় এখনও ভেঙে পড়েনি। যেন হৃদয়টাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলার জন্য সে গান গাইছে। সেই নষ্ট-হয়ে-যাওয়া জেলেনীর জীবনকাহিনীর কয়েকটা কথা। গানের এই কথাগুলোই নাল্লপেন্ন তাকে সেদিন গেয়ে শুনিয়েছিল। গানের সেই কথাগুলো তার কানে স্পষ্ট হয়ে আসছে না কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে যে গভীর হতাশা, যে চরম ব্যর্থতা তা যেন ওর হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে ওকে পাগল করে তুলল।

নিজের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছিল যে জেলেনী সেও হয়তো সেদিন এই গান শুনে বিভ্রান্ত হয়ে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজকের মতো সেদিনকারও জ্যোৎস্না তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। ঠিক তেমনি ভাবে আজও আর একজন মন্ত্রমুগ্ধের মত সমুদ্রের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

এখনি হয়তো সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে তীরে আছড়ে পড়বে। ভয়ানক সব সামুদ্রিক জীবজন্তু মুখ হা করে তেড়ে আসবে। উপকূলে বিষাক্ত সাপেরা ঘুরে বেড়াবে।

হাঁটতে হাঁটতে কারুতাম্মা আরও একটা কথা ভাবছিল। সে এই সমুদ্রতীর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চেনাজানা সকলের কাছেই তার বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু তবু এখনও কারুর কারুর কাছে বিদায় নেওয়া বাকি আছে। সমুদ্রের সেই জ্যোৎস্নার কাছে বিদায় নেওয়া হয়নি—হয়নি জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে যে অপরূপ সমুদ্র তার কাছেও বিদায় নেওয়া। জ্যোৎস্নায় ভেসে-আসা সেই সুন্দর গানের কাছেও সে বিদায় চায়নি আর চায়নি সেই গানের স্রষ্টার কাছেও।

হয়তো কাল বা পরশু যতদিন না এ জায়গা ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে ততদিন গান আর নাও শোনা যেতে পারে। গাইতে গাইতে গায়কের গলা হয়তো ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু কারুতাম্মা চায় সে যেন কোনওদিন তার গান বন্ধ না করে। যদি ওর গান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে জ্যোৎস্নালোকিত এই সমুদ্র উপকূল চিরদিনের মত স্তব্ধ, মূক হয়ে যাবে।

আর একটা চিন্তাও কারুতাম্মাকে গভীর ভাবে পেয়ে বসল। এই চাঁদের আলোয় এই গানের স্রোতে অবগাহন করার সুযোগ আর তো সে পাবে না। হয়তো এই শেষ সুযোগ। এ সুযোগ কারুতাম্মা ছাড়বে না, ছাড়তে পারবে না। শুধু এই শেষবারের মতো তীরে-বাঁধা নৌকোগুলোর আড়ালে সে যেতে চায়— এই শেষবারের মতো সেই বিমল আনন্দ, রোমাঞ্চকর অনুভূতি সে আর একবার মাত্র পেতে চায়।

এই সমুদ্রের বালিতে ছোট্ট মেয়ে হয়ে সে দৌড়োদৌড়ি করেছে। এখানেই সে বড় হয়েছে, আর ভালবেসেছে। এখন সে এক জেলের ঘর করতে চলেছে। সে জেলেকে দিনের পর দিন ঝড়-তুফান-ঘূর্ণীতে-ভরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হবে। পাহাড়ের সমান ঢেউএর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তার মরাবাঁচা নির্ভর করছে তার সতীসাধ্বী জেলেনীর ওপর। এখন সে একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করতে চলেছে, জীবনের কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি হতে চলেছে। তার দায়িত্ব, তার ভার অনেক বেশি। সে জীবন তখন শুধু তার একার নয়, সে

জীবন দ্বৈতজীবন। তাই এতদিন যে সহজ সরল জীবন সে কাটিয়েছে সেই জীবনের শেষ দিনটা শুধু একবার মাত্র সে নিজের বলে, শেষবারের মতো সম্পূর্ণ একার বলে অনুভব করতে চায়।

কিন্তু একটা ভয়ও তার মনে রয়েছে। তার যে নিজের ওপরই নিজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই। হয়তো সে ভুল পথে পা দিতে পারে। যে কোনও মুহূর্তে সে খারাপ হয়ে যেতে পারে। এর আগে কোনদিন এই ধরনের ভয় তার মনে ঢোকেনি। কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে, না গিয়ে সে পারবে না।

পারীকুট্টির কাছে গিয়ে সে বলবে—'ওগো, অমন করে গান তুমি গেয়ো না। অন্ততঃ যে দুদিন আমি আছি সে দুদিন তোমার গানকে জোছনার মধ্যে দিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় আমার কাছে অমন করে পাঠিয়ে দিয়ো না।'

আরও আরও অনেক কথা তার পারীকুট্টিকে বলার আছে। পারীকুট্টির কাছে তার ক্ষমা চাওয়ারও আছে।

কারুতাম্মা খুব আস্তে আস্তে দরজা খুলল। আঃ, বাইরে কি ফুটফুটে জোছনা! ও বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর নারকেল গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে সে সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত হল।

হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে গেল। গান গেয়ে গেয়ে পারীকুট্টি তার প্রেমিকাকে তার সকল আগল খুলিয়ে তার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। তবু যেন নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। বিস্মিত ভাবটা কেটে গেলে পারীকুট্টি জিজ্ঞেস করল, 'কারুতাম্মা তুমি চলে যাচ্ছ—না?'

এ ছাড়া আর কি প্রশ্ন সে করবে? ওই একটি প্রশ্নই যে শত প্রশ্ন হয়ে তার মনে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে।

'কারুতাম্মা তুমি চলে যাওয়ার পরও কি আমার কথা মনে রাখবে?'

খুব সংশয় আর দ্বিধাভরে পারীকুট্টি এই কথা জিজ্ঞেস করল। তারপর বলল, 'তুমি আমার কথা মনে না রাখলেও আমি সমুদ্দুরের ধারে বসে এই গান গেয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব বুড়ো হয়ে দাঁত পড়ে গেলেও আমি এখানে বসে বসে গান গাইব।'

কারুতাম্মা এতক্ষণে কথা বলল, 'ছোটমিয়া, তুমি একটা সোন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে কর। তারপর ছেলেপুলে নিয়ে মাছের কারবার ভালো করে চালিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর কর।'

পারীকুট্টি ওর কথার জবাব দিল না।

কারুতাম্মা আবার বলল, 'ছোটমিয়া তোমার আমাকে…আমাদের এই

মেলামেশাকে ভুলে যাওয়া উচিত।'

তাতেও পারীকুট্টি কিছু বলল না। কারুতাম্মা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তাতে আমাদের তুজনেরই মঙ্গল। আর আর···তোমার কাছ থেকে আমরা যে টাকা ধার নিয়েছি তা আমি যাবার আগে শোধ করে দিয়ে যাব। ছোটমিয়া, তোমার ভালোর জন্যে, তোমার সুখের জন্যে···'

বাকি কথাগুলো ও আর বলতে পারল না। ও বলতে চেয়েছিল, 'তোমার সুখের জন্যে আমি রোজ প্রার্থনা করব।' কিন্তু কথাগুলো বলার আগে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা খোঁচা লাগল। একজন জেলেনী তার জেলের ভালোর জন্যেই শুধু প্রার্থনা করতে পারে। যার হাতে তাকে তুলে দেওয়া হবে সেই হচ্ছে সেই পুরুষ যার ভালোমন্দ ইষ্ট-অনিষ্টের জন্য সে কামনা করতে পারে, প্রার্থনা করতে পারে। সে যদি অন্য কোনও পুরুষের ভালোর জন্য প্রার্থনা করে, তার মঙ্গলকামনা করে তাতে কুলধর্মের উন্টোটাই করা হবে। তাই একথা বলা উচিত নয়। কিন্তু তবু ওর অজান্তে ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—

'আমি চিরদিন···চিরদিন তোমায় মনে রাখব ছোটমিয়া।'

'কেন কারুতাম্মা? আমাকে মনে রাখবে কেন? আমাকে মনে রাখার দরকার নেই।'

কিছুক্ষণ ওরা তুজনে কেউ কিছুই বলল না। কিন্তু কথা না বলেও সেই মুহূর্তগুলো মূক ছিল না। তুজনেই মনে মনে তখন মুখর হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ একটা পাখি নারকেল গাছ থেকে উড়ে চীৎকার করতে করতে আকাশের দিকে উড়ে গেল। মনে হল সে তাদের এই মিলনের দৃশ্য দেখেছে তাই জানিয়ে গেল। অদূরে সমুদ্রতীরে একটা কুকুর তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু এই তুজন ছাড়া তাদের এই সাক্ষাতের সাক্ষী আর কেউ ছিল না।

পারীকুট্টি বলল, 'এই সমুদ্দুরের ধারে আমরা কত হাসাহাসি কত ছোটাছুটি করেছি, তুজনে মিলে কত খেলা করেছি, ঝিনুক কুড়িয়েছি তার সব শেষ হল আজ।'

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সেই দিনগুলো হারিয়ে গেল।'

কারুতাম্মা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। পারীকুট্টি বলল, 'এখন এই সুমুদ্দুরের ধারে আমিই শুধু একা রইলাম।'

কথাগুলো কারুতাম্মার বুকে গিয়ে বিঁধল।

পারীকুট্টি আবার বলল, 'কারুতাম্মা, আমি ভেবেছিলাম যাওয়ার আগে তুমি

আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে। অবশ্য এর জন্যে আমার নালিশ করার কিছুই নেই।'

পারীকুট্টির কথাশুনে কারুতাম্মা দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। পারীকুট্টি বলল, 'কারুতাম্মা তুমি কাঁদছ কেন? পালানি খুব ভাল ছেলে, সে তোমাকে সুখে রাখবে—' বলতে বলতে ওর গলা ভেঙে এল। তবু বলল— 'এইই তোমার ভাল।'

কারুতাম্মা আর সহ্য করতে পারল না। ও কান্নাভেজা গলায় বলল, 'ছোটমিয়া, এমন ভাবে মড়ার গায়ে খাঁড়ার ঘা মেরো না।'

পারীকুট্টি কিন্তু ওর কথার অর্থ বুঝতে পারল না। ওকে ব্যথা দেওয়ার মত হয়তো কিছু বলে ফেলেছে মনে করে ও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কই ওকে ব্যথা দেওয়ার মত তো ও কিছুই বলেনি।

গভীর দুঃখের সঙ্গে কারুতাম্মা বলল, 'ছোটমিয়া, তুমি আর আমাকে ভালোবেস না।'

'একথা বললে কেন কারুতাম্মা—আমায় বিশ্বাস কর কারুতাম্মা, এখন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা তোমার সুখ।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'আমি এই সমুদ্দুরের ধারে এমনিভাবে চিরদিন গান করব।'

'আর আমি সেই ত্রিকুন্নাপুরার সমুদ্দুরের ধারে বসে তোমার গান শুনব।'

'এমনি ভাবে গাইতে গাইতে গলা চিরে আমি মরে যাব।'

'বুক ফেটে আমিও তখন মরে যাব। আর···আর তখন আমাদের আত্মা দুটো এই সমুদ্দুরের হাওয়ায় হাওয়ায় এই জোছনার আলোয় উড়ে বেড়াবে।'

'হ্যাঁ তাইই উড়ে বেড়াবে।' পারীকুট্টি বলল।

তারপর দুজনের কেউই কথা বলল না।

কারুতাম্মা নিঃশব্দে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। পারীকুট্টির কাছে এইভাবে সে বিদায় নিল। একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পারীকুট্টি তার যাওয়ার পথে তাকিয়ে রইল।

এমনি ভাবে এতদিনকার দুটি সাথী চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হল।

দশম পরিচ্ছেদ

মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান বেশ একটু ঘটা করেই করার ইচ্ছে ছিল চাকীর। পাড়াপড়শীরাও ভেবেছিল ভালো-মন্দ খাওয়া হবে, সাজানো-গোছানো আরও কত কী। চেম্পনকুঞ্জের টাকা আছে তার ওপর কারুতাম্মা বড় মেয়ে। কাজেই বিয়ের জাঁকজমক কিছু কম হবে না। চেম্পনকুঞ্জের কিন্তু টাকা খরচ করার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কারুতাম্মার জন্য কিছু গয়না গড়াতে গিয়েই এরমধ্যে বেশ কিছু টাকা খসে গেছে। তাই সে চাকীকে জানিয়ে দিল যে বিয়েতে ঘটাঘটি করার বা সাজানো-গোছানোর মতো পয়সা তার নেই। কিন্তু পয়সা নেই বললে কি হবে—কিছু টাকা খরচ না করলেই তো নয়। এই নিয়ে চাকী আর চেম্পনকুঞ্জের মধ্যে বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। কারুতাম্মা মাঝে ছুটে এসে তাদের ঝগড়া থামাল। ওর মনে সত্যি সত্যি বড় কষ্ট হল। ওর জন্যেই না বাড়িতে নিত্যি ঝগড়া আর নিত্যি চেঁচামেচি! কোন রকমে এখন বিয়ের দিনটা কেটে গেলেই হয়। এত অশান্তি আর ওর ভালো লাগেনা। আশ্চর্য ওর কপাল! যাদেরই সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাদের সকলকেই ও দুঃখ দিয়েছে। ভবিষ্যতে তার জন্যে আবার কার ঘরে কি অশান্তি সৃষ্টি হবে কে জানে।

ক্রমে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। গাঁয়ের মোড়লকে আগে বলতে হবে তারপর বাকি কাজকর্ম শুরু হবে। পানসুপুরি আর টাকা দক্ষিণে দিয়ে চেম্পন-কুঞ্জ মোড়লের অনুমতি নিল। বলাবাহুল্য মোড়ল চেম্পনকুঞ্জের এই ব্যবস্থায় খুবই আপ্যায়িত হল। কথা দিল বিয়ের দিন একটু আগেই সে আসবে।

তারপর বিয়ের দিন এল। খুব বেশি কিছু ঘটাঘটি না করলেও চেম্পন-কুঞ্জ যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ হয়ে গেল। মোড়ল তার কথা মতো একটু আগেই এল। পালানির সঙ্গে ত্রিকুন্নাপুড়া থেকে দশ-পনের জন লোকও এল। কিন্তু একজনও মেয়েছেলে নেই সে দলে। এই নিয়ে

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে কথার অন্ত ছিলনা। পালানির যে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তা সকলেই জানত কিন্তু তা বলে বরের সঙ্গে একজনও মেয়েছেলে আসবেনা এটা যেন সকলের কেমন কেমন লাগল। দশ-পনের জন ব্যাটাছেলে শুধু বর-যাত্রী হয়ে এল অথচ একটি মেয়েও এল না দেখে চাকীরও কেমন যেন খটকা লাগল।

নাল্লপেন্ন তো ট্যাঁক করে বলেই ফেলল:

'বলি চাকীদিদি, এ কেমন ব্যাপার হল? এতগুলো ব্যাটাছেলে আসতে পারল আর পাড়াপড়শী অন্ততঃ একটা মেয়েকেও জোগাড় করে আনতে পারলে না গা?'

কালিকুঞ্জ নাল্লপেন্নর কথায় সায় দিল। কুঞ্জীপেন্ন জিজ্ঞেস করল, 'আর এই সব মদ্দদের সঙ্গে মেয়েটাকে তোমার একা পাঠাবেই বা কি করে?'

লক্ষ্মী বলল, 'না পাঠিয়ে উপায় কি দিদি।'

নাল্লপেন্ন বলল, 'সত্যিই তো, না পাঠিয়ে উপায়ই বা কি? কিন্তু এ আবার কি ছিরি রে বাপু। কনেকে নিয়ে যেতে বরের সঙ্গে দুএকজন মেয়েছেলের দরকার হয়ই। এই রেওয়াজই তো আমাদের বরাবর চলে আসছে।'

জেলেনীদের এই সব কথা চাকীর কানে এল। চাকীও মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবছিল আর মনটা ওর খুঁতখুঁত করছিল।

এবার টাকা বেঁধে দেওয়ার পালা এল।* কত টাকা দিতে হবে সেটা ঠিক করে দেবে মোড়ল, তারপর বিয়ে আরম্ভ হবে। মোড়ল বরযাত্রীদের সব ডাকল। তারা সবাই একসঙ্গে হয়ে মোড়ল কত টাকা ঠিক করে সেটা জানার জন্য কান খাড়া করে রইল।

মোড়ল বলল, 'পঁচাত্তর টাকা দিতে হবে।'

বরের লোকজন তো এতটাকা শুনে একেবারে অবাক্। এত টাকা দিতে হবে একথা ওরা একেবারেই ভাবতে পারেনি। শুধু তাই নয়, টাকার অঙ্কটা খুবই বেশি বলে তাদের ধারণা। একটা সামান্য জেলের বিয়েতে এত টাকা দেওয়ার কথা বলাটাই যেন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিছুক্ষণের জন্য কেউ কিছু বলল না। বরযাত্রীদের মধ্যে বরকর্তা সবিনয়ে অথচ বেশ জোর গলায়

* কেরালায় জেলেদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত আছে বিয়ের সময় গাঁয়ের মোড়ল বরকে একটা টাকার সংখ্যা বেঁধে দেয়। বর সেই টাকাটা দিলে পর মোড়ল আর কনের বাবা সেটা ভাগ করে নেয়। মেয়ের বাবা কিন্তু টাকাটা নিজের জন্য খরচ করতে পারে না। তার সম্প্রদায়ের জন্য টাকাটা ব্যবহার করা হয়।

জিজ্ঞেস করল :

'বাবা, আপনি কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। আমরাও আর এক গাঁয়ের মানুষ। সেখানে আমাদেরও মোড়ল আছে। আপনি টাকাটা বেঁধে দিলেন বটে এখন এর ওপর কিছু বলার সাধ্যি আমাদের নেই। তবু...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবুটা কি শুনি ? বলেই ফেলনা হে।'

বরকর্তা অচ্যুতন বলতে লাগল, 'টাকা বেঁধে দেওয়ার অধিকার আপনার আছে স্বীকার করি কিন্তু তা বলে বরের বাড়ির লোকজনকে কি একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল না আপনাদের ?'

এমনিভাবে এতগুলো টাকা ঠিক করাটা মোড়লের সত্যিই উচিত হয়নি। তাই ওর দোষ এমনিভাবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ায় মোড়ল একটু দমে গেল। তবু সে উঁচু গলায় বলল :

'বলি এতে আবার এত শত কি জিজ্ঞেস করার আছে শুনি ?—যত সব।'

অচ্যুতন ছাড়ল না। ওর গাঁয়েও হোমরা চোমরা মোড়ল আছে। কাজেই ওর অত ভয় করার কিছু নেই। বলল, 'তা আপনি যাই বলুন, এতে জিজ্ঞেস করার আছে বৈকি।'

'কেন তাইতো আমিও জিজ্ঞেস করছি।'

অচ্যুতন এবার আর না থাকতে পেরে খোলাখুলি বলে দিল, আপনার ইচ্ছেটা কী এই বিয়েটা না হয় ?'

কথাটা খুবই খারাপ। মোড়ল ওকে এক দাবড়ানি দিল।

'বলি খুব যে মাতব্বর হয়েছ হে, আমার দোষ দেখাতে এসেছ।'

অচ্যুতন বলল, 'বরের কাছে কত টাকা আছে তা না জেনে টাকাটা ঠিক করা খুবই খারাপ। এতে অনেক সময় বিয়েই ভেঙে যায়। তাই আমি উচিত কথাই বলেছি।'

মোড়ল বলল, 'আরে ছি ছি, তোমরা কি ভিখারী নাকি হে যে এই কটা টাকা দেওয়ার কথা বলে এত হৈ হৈ করছ। এই কটা টাকা আবার টাকা নাকি হে ?'

বরযাত্রীদের গাঁয়ের মোড়ল না হলেও মোড়ল মোড়লই তা সে যে গাঁয়েরই হোক। তাই তাদের ভিখিরী বললেও ওরা সহ্য করল। সইতে বাধ্যও তারা। এর বেশি গালা-গালি দিলেও তারা সহ্য করবে। কিন্তু তবু অচ্যুতনের আর একটু কিছু বলার ছিল। তার আগেই মোড়ল চেম্পনকুঞ্জকে বলল :

'চেম্পনকুঞ্জ তোমার মেয়ের জন্যে পঁচাত্তরটা টাকা দেবার ক্ষমতা যে লোকের

নেই তার হাতে তুমি মেয়েকে তুলে দিচ্ছ !'

মোড়লের এই কথাগুলো মেয়েদের খুব মনঃপূত হল। তাদেরই সকলেরই মনে হল মোড়লের উত্তরটা ঠিক জুতসই হয়েছে। অমন একটা সুন্দর মেয়েকে একটা বাউণ্ডুলে হাঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে গাঁয়ের সবারই খারাপ লেগেছে। সকলেই আড়ালে চেম্পনকুঞ্জকে দোষ দিচ্ছিল। এখন মোড়ল চেম্পনকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি এই কথা জিজ্ঞেস করাতে সকলের খুব ভালো লাগল। আর কেউ তো এমন ভাবে চেম্পনকুঞ্জকে সোজাসুজি একথাটাও জিজ্ঞেস করেনি।

চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু একটাও কথা বলল না। বরকর্তা অচ্যুতন সুযোগ খুঁজছিল। সে আগের কথার খেই ধরে বলল :

'আমি ঠিকই বলছি মোড়ল মশাই। পালানির কেউ নেই। আমরাও ওর নিজের লোক নই, পাড়াপড়শী। তাই বলছিলাম টাকাটা ঠিক করার আগে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আপনাদের।'

তারপর অচ্যুতন পালানির আদিঅন্ত ইতিহাস শোনাতে শুরু করল। সে সব শুনে মেয়েদের মধ্যে কারুতাম্মার জন্য হাহুতাশের পালা পড়ে গেল। কেউ কেউ বলল :

'আহা—হা, মেয়েটাকে এর চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে না কেন গা।'

মোড়ল কিন্তু অচ্যুতনকে ছাড়ল না। বলল, 'আচ্ছা ধরলাম না হয় তুমি সবকথা ঠিকই বলেছ। কিন্তু বাপু ছেলের অবস্থা দেখে তারপর টাকাটা ঠিক করব নাকি হে?'

'তা নয়।'

মোড়ল বলল, 'মেয়েটা ভালো। ভালো মেয়ে পেতে হলে ভালো দাম দিতে হবে।'

মোড়লের কথা শুনে বরযাত্রীদের মধ্যে কে একজন যেন বিড়বিড় করে কী বলল। মোড়লের কথাবার্তা তার একটুও ভালো লাগেনি তাই ও আপনার মনে বিড়বিড় করে কি সব বকে যাচ্ছিল। মোড়ল ওর বিড়বিড়ানি শুনে এক ধমক দিয়ে বলল :

'কিরে তুই আবার কি গজর গজর করছিস?'

লোকটা কোনও উত্তর দিল না দেখে মোড়ল তাকে আর একচোট ধমক দিল। লোকটা ধমক খেয়ে বেশ একটু রেগে গেল। ওর মনের মধ্যে যা

গজ্‌গজ্‌ করছিল তা বলেই ফেলবে ঠিক করল, কেননা এই বিয়েটা ওর একেবারেই পছন্দ ছিল না। তাই দ্বিতীয়বার মোড়ল ধমক দিতেই লোকটা মোড়লের মুখোমুখি জবাব দিল:

'ভালো মেয়ে ভালো মেয়ে বলে আর অত বড়াই করবেন না।'

'কেন হে বাপু!'

'গাঁয়ের সর্বনাশ যাতে না হয় তার জন্যেই তো এ বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আমাদের গাঁয়ের সর্বনাশ হোক্‌। আর তারই জন্যে ছেলেকে এত টাকা দিতে হবে। বেশ যা হোক। এত টাকা আমাদের সমাজে কেউ কখনও দেয়নি।'

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। লোকটা বলছে কি? চাকী ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে সবকথা শুনছিল—শুনে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কারুতাম্মা 'মাগো' বলে চীৎকার করে মাকে এসে জড়িয়ে ধরল। ওর চীৎকার শুনে বাইরের লোকজন সবাই ছুটে ঘরের মধ্যে এল। এসে দেখে চাকী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

চেম্পনকুঞ্জ চাকীর অবস্থা দেখে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগল। চাকী হয়তো মরতে বসেছে, এই ভেবে ও যে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। বিয়ের সব জোগাড়যন্তর তালগোল পাকিয়ে গেল।

কেন যে ঐ লোকটা এই সব কেচ্ছা রটিয়ে সমস্ত গোলমাল করে দিতে চাইছে তা কেউ বুঝতে পারল না। বরযাত্রীদের অনেকেরই লোকটার কথা পছন্দ হয়নি। এমন ভাবে এই সময় এই সব কথা তোলা খুবই খারাপ—সকলেই লোকটাকে ছি ছি করতে লাগল। কিন্তু লোকটা যে খারাপ কিছু একটা করেছে তা ওকে দেখে মনে হল না। বরঞ্চ মাঝে মাঝে গজ্‌গজ্‌ করে বলতে লাগল:

'আরে আমাকে গালাগালি দিলে কি হবে? আমি এই সমুদ্দুরের ধারে অনেকবার যাওয়া আসা করেছি। সকলেরই হাঁড়ির খবর রাখি আমি।'

কারুতাম্মার সম্পর্কে খুব যে খারাপ কিছু একটা ব্যাপার লুকিয়ে আছে তা যেন এবার সবাই আঁচ করতে লাগল। কিন্তু তবু এ সম্বন্ধে আরও বেশি কিছু জানার জন্য বরযাত্রীদের আর কেউ কোন কৌতূহল দেখাল না। উপরন্তু তারা ভাবছিল যে লোক্‌টা মুখ বন্ধ করলে বাঁচা যায়। ওরা এসেছে অন্য গাঁয়ে, ওদের মানসম্ভ্রম বলে একটা পদার্থ আছে।

অচ্যুতন আর সহ্য করতে পারল না। দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল,

'এই তুই চুপ করবি, না, এমনি করে বক্ বক্ করবি।'

ঘরের মধ্যে তখন নাল্লপেন্ন আর কালিকুঞ্জ চাকীকে নিয়ে ব্যস্ত। একটু পরে চাকী চোখ খুলল। তারপর পাশে-বসা কারুতাম্মার গলা জড়িয়ে ধরে 'খুকীরে' বলে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

কারুতাম্মা মায়ের অবস্থা দেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। মেয়েরা তখন একদিকে কারুতাম্মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল আর অন্যদিকে চাকীর মুখে' চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

একটু পরে চাকী চোখ খুলবার পর চেম্পনকুঞ্জ অচ্যুতন আর পালানিকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল। পালানির কাছে টাকা না থাকলেও পঁচাত্তর টাকা দিতে রাজী আছে। তাই নিয়ে পালানি এখন মোড়লের টাকাটা দিক। পালানি আর বেশি কিছু বলল না। রাজী হয়ে গেল। অচ্যুতনও এবার কিছু গণ্ডগোল না করে রাজী হয়ে গেল।

পণের টাকাটা নিয়ে পালানি বিয়ের আসরে ঢুকল। ততক্ষণে গণ্ডগোল ছুটোছুটি কিছুটা কমে এসেছে। চাকীও একটু সুস্থ হয়েছে। তাই পাপু বলে যে লোকটা এত সব গণ্ডগোলের সৃষ্টি করল তার কথা আর কারুর মনেই রইল না।

পালানি টাকাটা দেবার পর ওদের সমাজের নিয়মানুযায়ী টাকার একভাগ মোড়ল নিল। বাকীটা চেম্পনকুঞ্জকে দিল। এতসব গণ্ডগোল হলেও বিয়ের সময় তখনও পার হয়ে যায়নি।

চাকী উঠে বসলেও তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। মাথাটা তখনও ওর ঘুরছিল। কাণের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছিল। কোনরকমে উঠে বসলেও দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ওর ছিল না!

বিয়ের কনেকে সামিয়ানার নীচে আনা হল। মেয়ের গলায় তালি (বিয়ের চিহ্ন) পরানো হল, কাপড় দেওয়া হল, তারপর পালানির হাত কারুতাম্মার হাতের ওপর রাখা হল। কারুতাম্মার হাতটা ধরে যখন পালানির হাতের ওপর রাখা হচ্ছিল তখন কারুতাম্মা হাত সরিয়ে নিতে চাইছে বলে চেম্পনকুঞ্জের মনে হল। কারুতাম্মার হাতে যেন প্রাণ নেই, কোনরকমে পালানির হাতের ওপর তার হাত রাখা হয়েছে মাত্র।

কারুতাম্মার মনের মধ্যে তখন কি হচ্ছিল কে জানে? কি যে ভাবছিল ও তার খবর কেউ রাখল না! তাকে যা বলা হচ্ছিল ঠিক যেন যন্ত্রের মতো সে তাই করে যাচ্ছিল।

মেয়েরা ধরাধরি করে চাকীকে বিয়ের আসরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

কিন্তু ঠিক বিয়ের সময়টা চাকী আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মেয়েদের মনে হতে লাগল এসব খুবই অলুক্ষুণে ব্যাপার। সত্যিই তো, অলুক্ষুণে ব্যাপার ছাড়া আর কি! এর মধ্যে চাকী আবার জ্ঞান পেয়ে চোখ খুলেছে। কে একজন বলল, 'দিদি গিয়ে শুয়ে পড় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' চাকী গিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিয়েটা তো শেষ হল। কিন্তু খাওয়ার সময় আবার গণ্ডগোল আরম্ভ হল। মেয়েরা কেউ কেউ না খেয়ে চলে গেল। পালানি আসলে কোন্ জাতের লোক, তা কে জানে? খাওয়ার দরকার কি—বলে তারা চলে গেল। পাপু বলে সেই বরযাত্রীটাও না খেয়ে সরে পড়ল।

চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু এসবে গা দিল না। তবে সে মোড়লের পা ধরে তাকে একটা অনুরোধ করল। চাকীর অবস্থা খুব খারাপ, কারুতাম্মা আজ পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় নি। এখন একা-একা সম্পূর্ণ নতুন একটা গাঁয়ে যেতে হবে, বরের সঙ্গে কোন মেয়েছেলেও আসেনি। এরকম অবস্থায় মেয়েকে ও দুদিন পরে পাঠাতে চায়। পালানিরও না গেলেই ভাল হয়—না হয় পালানি ওর বাড়িতে থাকুক। কারুতাম্মা চলে গেলে ওর বাড়ি একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। বাড়িতে ওর রুগ্ন মাকে একফোঁটা জল দেওয়ার লোকও নেই।

চেম্পনকুঞ্জ কেমন যেন পাগলের মত কথাবার্তা বলছিল। তাই দেখে মোড়লের সহানুভূতি জাগল। সে বলল, 'তা তুমি ঠিকই বলছ, তবে ওরা বিয়ের কনেকে নিয়ে যেতে চাইলে আমরা কি করে না বলি বল।'

চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'বাবা, আপনি বললে ওরা শুনবে।'

মোড়ল একটু হাসল, 'ওরা সব ত্রিকুন্নপুরার লোক। একটু দেমাকে। তুমিও তো নিজের চোখে সেটা দেখলে।'

মোড়ল ছাড়া চেম্পনকুঞ্জের আর কেউ নেই যে ওকে সাহায্য করে। তাই সে আবার বলল, 'বাবা' মেয়েটা আজই চলে গেলে বড্ড কষ্টে পড়ব আমি। আপনি একটু শক্ত করে চেপে ধরলে আপনায় কথা ওরা ঠিক শুনবে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বরযাত্রীদের পানটান খাওয়া হলে পর তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে বরকর্তা অচ্যুতন বলল। কারুতাম্মা মার পাশে বসে অঝোর ধারে কেঁদে চলেছে। চেম্পনকুঞ্জ খুব ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। অচ্যুতনের কথা কেউ গায়ে মাখল না দেখে ও আবার ওদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলল। কিন্তু কে কার কথা শুনছে। অচ্যুতন তিনবারের বার যাওয়ার

কথা বললে পর চেম্পনকুঞ্জ আর ব্যস্ততার ভান করতে পারল না। তখন মোড়ল অচ্যুতনকে জিজ্ঞেস করল :

'বলি এত তাড়াতাড়ির কি আছে? আজকে কি কনে না নিয়ে গেলেই নয়?'

এমনভাবে প্রশ্ন করাটা খুবই অস্বাভাবিক। বরযাত্রীদের কেউ ভাবতেও পারে না যে বিয়ের পরে মেয়ের দিক থেকে কেউ এমনি প্রশ্ন তুলতে পারে। অচ্যুতন কি যে উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেল না। মোড়ল জবাবের জন্য ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বলল, 'এ আপনি কি বলছেন?'

মোড়ল বলল, 'খারাপটা কি বলেছি?'

'বিয়ের পর নতুন কনেকে কি কেউ তার বাপের বাড়ি রেখে যায়?' মোড়লের এরকমভাবে বলাটা যে ঠিক হয়নি তা সে নিজেও জানে। তাই সে বেশি জোর খাটাতেও পারে না। তাই মোড়ল আস্তে আস্তে মেয়ের বাড়ির অবস্থাটা অচ্যুতনকে বুঝিয়ে বলতে লাগল। সে কথা ত বরপক্ষের লোকেরাও জানে।

মোড়ল আবার বলল :

'মেয়ের মা একটু ভাল হয়ে উঠলে পর মেয়েকে পাঠানর কথাই আমি বলেছি।'

অচ্যুতন বলল, 'মেয়ের যাওয়া না যাওয়া ঠিক করবে ছেলের বাড়ির লোকেরা।'

মোড়ল ওর কথা শুনে একটু রেগে গিয়ে বলল :

'মেয়েকে গায়ের জোরে নিয়ে যেতে তোমরা পার না।'

'তার মানে?'

'মানে আবার কি? বরযাত্রীদের সঙ্গে একজন মেয়ে তোমাদের আনা উচিত ছিল, এটাই আমাদের সমাজের নিয়ম।'

একথার জবাব দিল অচ্যুতন। জিজ্ঞেস করল :

'বরযাত্রীদের সঙ্গে একটা মেয়ে আনার ক্ষ্যামতা যে ছেলের নেই তাতো আপনারা জানতেন, তবু দেখে শুনে তার হাতে মেয়ে দিলেন কেন?'

মোড়ল তখন রেগে গিয়ে বলল, 'কি হে তুমি যে দেখছি খুব লম্বা লম্বা কথা বলছ। তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাও নাকি হে?'

তখন অচ্যুতন চুপ করে গেল। এখন কি ঠিক করবে না করবে বরই করুক। ও আর মাথা ঘামাবে না। অচ্যুতনকে চুপ করতে দেখে মোড়ল ভাবল পালানি নিশ্চয় তার কথাগুলো বিবেচনা করবে।

এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু বলছে না দেখে অচ্যুতন তাড়া দিল। মোড়ল তখন বলল :

'পালানিও আপাততঃ এইখানেই থাক, পরে দেখা যাবে।'

বরপক্ষ থেকে তাতে কেউ কিছু বলল না। পালানি উত্তর দিক। সে যা বলবে তাই হবে। অচ্যুতন পালানিকে জিজ্ঞেস করল :

'কি হে বাপু, কি ঠিক করলে? আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই—যেতে হবে যে।'

পালানি খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। কি যে বলবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। এতক্ষণ ধরে এত কথাবার্তা হল সবই ও শুনেছে তবু কিছু একটা ঠিক করে ফেলতে পারেনি। সাহস হয়নি না অন্য কিছু তা কে জানে? যাই হোক, এটা যে খুব বড় একটা কিছু সমস্যার ব্যাপার পালানির কিন্তু তা মনে হলনা। ও তাই অচ্যুতনের প্রশ্নে একটাও কথা না বলে চুপ করে রইল।

অচ্যুতন ওর এই নীরবতায় খুব রেগে গেল। বেশ একটু ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'কি হে, কিছু বলছ না যে? মিছিমিছি আমাদের এই ভোগান্তি কেন বাপু? তোমাদের মতো লোকের উপকার করতে এসে লাভ হল তো ভারি! কেবল আপনার জনেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে হল!'

পালানি কি বলে তাই শোনার জন্য চেম্পনকুঞ্জ মুখিয়ে আছে। পালানি খুবই সাদাসিদে ছেলে, ও নিশ্চয়ই ওর কথাগুলো ভেবে দেখবে। আর পালানির তার বাড়িতে থাকতেই বা অসুবিধেটা কি? ছোটবেলা থেকে সে নানা জায়গায় কাটিয়েছে। এই দুনিয়ার সব জায়গায়ই তার ঘরবাড়ি। তাই বরযাত্রীদের পাঠিয়ে দিয়ে পালানির ওর বাড়িতে থেকে যাওয়ায় খুব আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই।

অচ্যুতন আবার জিজ্ঞেস করল :

'কি হে, একেবারে যে মিইয়ে গেলে, কিছু বলছ না কেন?'

পালানি তখন একবার অচ্যুতনের মুখের দিকে আরেকবার বরযাত্রীদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারল না। তখন ওর মুখ দিয়ে ফট্ করে কথাটা বেরিয়ে গেল :

'আমি মেয়েকে এক্ষুনি নিয়ে যেতে চাই।'

চেম্পনকুঞ্জ পালানির কথা শুনে থ বনে গেল। পালানির মুখে এই ধরনের কথা সে একেবারেই আশা করেনি। পালানি যে এইরকম সাফ জবাব দেবে তা ও ভাবতেই পারেনি। চেম্পনকুঞ্জ তখন কাতর ভাবে

পালানিকে বলল :

'বাবা, তুমি ওর মায়ের অবস্থাটা একবার নিজের চোখে দেখে এস, তারপর যা করার কর।'

'তুমিও তো মায়েরই ছেলে', বললে কথাটা পুরো হতো কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ তা বলল না।

পালানির মনে চেম্পনকুঞ্জের কথাগুলো ঘা দিল কিনা কে জানে। হয়তো দিল, ও তাই আবার অচ্যুতনের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু অচ্যুতনের মুখ একেবারে পাথরের মতো শক্ত। তবু পালানির মনে হল যে অচ্যুতনের মনের ভাব হচ্ছে যে মেয়েকে আজই নিয়ে যাওয়া উচিত। তাই পালানি আবার বলল :

'আমি মেয়েকে আজই নিয়ে যেতে চাই—আপনারা শুধু নিজের দিকটা দেখছেন। আমার কথাটা কেউ ভাবছেন না। আমার ঘরবাড়ি নেই, ঘর সংসার গুছিয়ে দেবার কেউ নেই। বিয়ে করা তো সংসার পাতার জন্য। বিয়ে করে যদি বউকে এখানেই রেখে গেলাম তাহলে বিয়ে করলামই বা কেন? সংসার পাততে হলে বউকে একদিনের জন্যেও এখানে রাখলে চলবে না। আজকেই ওকে নিয়ে যেতে চাই।'

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা পালানি বলে গেল। ও যে এত কথা এমন ভাবে বলতে পারে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। এমন জোর দিয়ে কথা বলতে পালানিকে আগে কেউ শোনেনি। পালানির কিন্তু মনে হতে লাগল যে ওর এই ভাবে বলায় ওর বন্ধুবান্ধবেরা খুব খুশি হয়েছে। কিন্তু পালানির কথাগুলো চেম্পনকুঞ্জের কাছে কেমন লাগল তা নিয়ে কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না। চেম্পন-কুঞ্জ তখন সকাতরে বলল :

'বাবা, যে মেয়েকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি তার বাবা হয়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। বুঝে দেখো তুমিও তো একদিন ছেলেপুলের বাবা হবে।'

চেম্পনকুঞ্জ এমন কাতরভাবে কথাগুলো বলল যে তাতে যে কোন লোকেরই মন গলত, পালানি কিন্তু চুপ করে রইল। তবে যদি অচ্যুতন বা বরপক্ষের কেউ মেয়েকে কয়েকদিন বাপের বাড়ি রেখে যেতে বলত তাহলে হয়তো ও আপত্তি করত না।

মোড়লের মন চেম্পনকুঞ্জের জন্য অনুকম্পায় ভরে গেল। অচ্যুতনের মনও হয়তো গলেছে। ওর বাইরের ভাব দেখে তা কিন্তু বোঝবার জো নেই। কাউকে

কিছু না বলতে দেখে মোড়লের রাগ হয়ে গেল। সে বলল :

'চেম্পনকুঞ্জ, এ তুমি অরণ্যে রোদন করছ বাবা। তোমার জামাই ছোট্ট বেলা থেকেই বাড়িঘর ছাড়া। মা-বাপের ভালবাসা কি তা সে জানেনা। স্নেহ ভালবাসা দয়া-মায়া এ সব লোক বাড়িতেই শেখে। যার বাড়িঘর মা-বাপ নেই সে এসবের অর্থ কি বুঝবে? সাত সমুদ্দুরে ভবঘুরের মতো যে ঘুরে বেড়িয়েছে তার কাছে এসব কথা বলা বৃথা। তুমিও যেমন, আর ছেলে পেলে না। এখন বলে আর কি হবে? দোষ তোমারই।'

চেম্পনকুঞ্জ মোড়লের কথায় কিছু বলল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও বুঝতে পারল মোড়ল যা বলছে তা একরকম ঠিকই। পালানিকে দেখে সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে সে এই ধরনের ছেলে। কোনও সংসারে বড় না হয়ে মা-বাপের স্নেহ না পেয়ে সে এইরকমটি হয়েছে। মোড়ল ঠিকই বলেছে। এখনি যদি পালানির কথাবার্তা এমনি হয় তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে। মেয়ের বিয়েটা যেন এর সঙ্গে দেওয়াটা একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। কি দুর্ভাগ্য! একটু আগে জানতে পারলে এই ভুলটা করত না। পালানির আসল মূর্তিটা ও দেখতে পেল দুচার দিন পরে নয় ঠিক বিয়ের দিনই। সত্যিই ছেলেটার দয়া-মায়া বলে কিছু নেই, এখন থেকেই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নইলে মেয়ের বাবা এত করে বলবার পরেও কোন ছেলে না শোনে।

অচ্যুতন তখন পালানিকে বলল :

'তুমিও বাছা আচ্ছা মেনিমুখো। বসে বসে এদের শাপমণ্যি গিলছ। আমাদের সঙ্গে যাবে তো ঐ মেয়েটা। তাকেই জিজ্ঞেস কর না যাবে কি যাবে না। দেখাই যাক্ না ও কি বলে।'

অচ্যুতনের এই কথায় চেম্পনকুঞ্জ আশ্বস্ত হল। পালানিও যেন একটু স্বস্তি পেল। এত বাক্‌বিতণ্ডা ঝগড়াঝাটি ওরও ভাল লাগছিল না। মোড়লও অচ্যুতনের এই কথায় খুশি হল। বলল :

'তা ঠিকই। মেয়েই বলুক যাবে কি যাবে না। ডাকো দেখি ওকে।'

চেম্পনকুঞ্জ তখন কারুত্তাম্মাকে ডাকল। কারুত্তাম্মা মার কাছে বসেছিল। কেঁদে কেঁদে ওর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। ভিজে চোখমুখ নিয়ে ও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। মোড়ল নিজেই ওকে জিজ্ঞেস করল :

"দেখ্ মেয়ে, তোর মাকে এই অবস্থায় ফেলে কি তুই যেতে চাস! তোর বাপকে এক ঘটি জল গড়িয়ে দেবার লোক নেই। মাকেও সেবাযত্ন করার কেউ নেই। মা-বাপকে এমনি ভাবে ফেলে তুই যেতে চাস কি না বল্।' তারপর

একটু থেমে বলল, 'বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু তোর বাপের বাড়ির অবস্থা তোর একবার ভেবে দেখা উচিত। কি করবি না করবি তুইই বল্।'

কারুতাম্মা কি যে বলবে ঠিক করে উঠতে পারল না। একটা কিছু ঠিক করার শক্তি বা সাহস এখন ওর একেবারে নেই। কতদিন আগে থেকেই তো সে এই গাঁয়ের সবকিছুর কাছ থেকে মনে মনে বিদায় নিয়েছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে যত তাড়াতাড়ি পারে সে এই সমুদ্রের ধার ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। অপেক্ষিত সেই দিনটিও এল। কিন্তু মা ঠিক সেই দিনই অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাবাকে দেখাশোনা করার কেউ নেই সবই ঠিক। কিন্তু ও কি করবে? কি যে ও বলবে—কিছুই বলার সাহস বা শক্তি ওর নেই। ও চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

ও কি বলে তা শোনার জন্য সকলেই হাঁ করে রইল।

মোড়ল বলল, 'আহা বেচারী! মেয়েটাকে দেখলে দুঃখু হয়। কি করে যে ও মুখ খুলে বলবে। তবু তোকেই বলতে হবে মা। তোর মতই সকলে শুনতে চায়।'

কারুতাম্মা আর দাঁড়াতে পারল না। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চাকীও কাঁদতে লাগল। কারুতাম্মা মাকে কি যেন জিজ্ঞেস করল চাকী বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছিস মা?'

কারুতাম্মা চট্ করে কিছু বলতে পারল না। একটু পরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—'আমি···আমি···যাব না মা।'

চাকী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল:

'লক্ষ্মী মা আমার, অমন কথা মুখে আনিসনি। তোকে যেতেই হবে। যদি না যাস তাহলে'···এর বেশি চাকী আর কিছু বলতে পারল না। মেয়ে যদি শ্বশুর বাড়ি না যায় তাহলে তার পরিণাম যে কি হবে চাকীর তা জানা আছে। কারুতাম্মার মনে সে ভয় আছে। সেই ভয়াবহ ছবি চাকী স্পষ্ট তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। বাড়িতে তাকে এক ফোঁটা জল দেওয়ার কেউ না থাকলেও সহ্য হবে, বিছানায় পড়ে পড়েও কাতরাবে তাও ভালো তবু কারুতাম্মা এখানে থাকলে যে কেলেঙ্কারীটা হবে সেটা ও কল্পনাই করতে পারে না। যত তাড়াতাড়ি পারে মেয়েকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারলে চাকী বাঁচে মেয়ে না গেলে রক্ষে নেই, তাকে যেতেই হবে। মেয়েকে তাই সে বলল:

'খুকী, ওদের গিয়ে বল্ যে তুই আজই ওদের সঙ্গে যাবি।'

কারুতাম্মা কোন কথা বলল না বা উঠল না দেখে চাকী মেয়েকে গায়ের

থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর অনেক কিছু বলল, গালিগালাজও করল তবু মেয়ের ওঠার কোন লক্ষণ না দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোর বুঝি সেই মোছলমান ছোঁড়াটাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না ?'

এবার কারুতাম্মা মনকে শক্ত করল। ও দরজার কাছে এসে বলল, 'বাবা আমি আজই যাব।' তারপর ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। মাও আর চোখের জল চেপে রাখতে পারল না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। মা-মেয়ের চোখের জল নিঃশব্দে ঝরতে লাগল।

যাওয়ার সময় হল। কারুতাম্মা বাবার সামনে গিয়ে পা জড়িয়ে একেবারে সটান্ হয়ে শুয়ে পড়ল। চেম্পনকুঞ্জ পা ছাড়িয়ে সরে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ ঐভাবে পড়ে থেকে—কারুতাম্মা উঠে দাঁড়াল। তারপব মার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মা ওকে আশীর্বাদ করে বলল, 'সব কিছু বুঝে শুনে ভেবে চিন্তে কাজ করবি।'

পালানি যখন শ্বশুরের কাছে বিদায় চাইল তখন চেম্পনকুঞ্জ একটা কথাও বলল না। চেম্পনকুঞ্জ তখন আর আগেকার চেম্পনকুঞ্জতে ছিল না ও একেবারে বদলে গেছে। চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ছে না। মুখ ফুলে লাল থম্‌থম্ করছে। মেয়ে-জামাই-এর হাতে এমনিভাবে অপমানটা সহ্য করতে হবে তা সে কল্পনাই করতে পাবেনি।

দশ-পনের জন বরযাত্রীর পেছন পেছন কারুতাম্মা বাড়ি থেকে রওনা দিল। মেয়ের যাওযা দেখতে দেখতে চাকী হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। নাল্লপেন্ন চোখের জল ফেলতে ফেলতে চাকীকে তুলে ধবল। চেম্পনকুঞ্জ তখন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আজ থেকে কারুতাম্মা আমাব মেয়ে নয়।'

বাবার কথা শুনে পঞ্চমী 'ওরে দিদিবে' বলে চীৎকাব কবে কেঁদে উঠল। নাল্লপেন্ন আর কালিকুঞ্জ চাকীর চোখে মুখে জল দিতে লাগল।

এমনিভাবে বাড়ির সকলের মনে দুঃখ দিয়ে কারুতাম্মা তার ভাবী জীবনের পথে পা বাড়াল। সে জীবন কেমন হবে তা কে জানে। অনেক কলঙ্ক, অনেক বিপদের হাত থেকে বাঁচতেই না সে এই জীবন বেছে নিয়েছে।

কারুতাম্মার মঙ্গলের জন্য কেউ সেদিন প্রার্থনা করল না। নিজের জন্যেও কারুতাম্মা প্রার্থনা করল না। কিন্তু আর কেউ না করুক পারীকুট্টি কারুতাম্মার জন্যে নিশ্চয়ই প্রার্থনা করেছে।

এমনিভাবে ঐ সমুদ্র ধারের সেই গাঁ থেকে সকলের জানাশোনা মেয়েটি বিদায় নিল।

ছেলেবেলার সাথী, ভালবাসার সাথী চলে যাওয়ায় এখনও কি সেই সমুদ্রের হাওয়ায় হাওয়ায় একজনের গান উড়ে বেড়াবে? হ্যাঁ হয়তো উড়ে বেড়াবে—নারকেল গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে চরার বালুকারাশিকে উড়িয়ে দেওয়া হাওয়ায় সেই গান হয়তো উড়ে বেড়াবে কিন্তু যার জন্য এ গান তা শোনার লোক আর থাকবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাপের বাড়ি ছেড়ে তার নতুন জীবন গড়তে কারুতাম্মা ত্রিকুন্নপুড়ায় এল। এখানকার সমুদ্রকে ওদের গাঁয়ের সমুদ্রের থেকে অনেক আলাদা বলে মনে হল ওর। সমুদ্রের জলেই এর তফাৎটা ও দেখতে পেল। এখানকার সমুদ্র ওর গাঁয়ের সমুদ্রের মতো শান্ত নয়। সবসময় সমুদ্র থেকে বিরাট বিরাট ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে—মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের ভেতর এই রকম অজস্র ঢেউ হাজারে হাজারে লুকিয়ে আছে আর একটার পর একটা বের হয়ে আসছে। এখানকার বালির রঙ্ও কেমন যেন আলাদা।

পালানির নতুন বউ দেখতে পাড়াপড়শীরা সব ওর বাড়িতে এল। কেমনভাবে তাদের সঙ্গে আলাপ করবে, কি রকম ব্যবহার করলে তারা খুশি হবে তা কারুতাম্মার জানা নেই। যারা ওকে দেখতে এসেছিল তাদের সবাইকে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখে কারুতাম্মা কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেল।

তবু সকলে যাতে তাকে ভালবাসে, ভালো মেয়ে বলে, এমন ব্যবহারটা করা উচিত তা সে জানে, কিন্তু ঠিক কেমন ব্যবহারটি করলে তা সম্ভব হবে তা ওর জানা নেই।

পালানি খুব ভোরে মাছ ধরতে গেছে। আজকাল মাতি মাছ খুব ভাল উঠছিল বলে পালানির এক মিনিটও নষ্ট করার জো ছিল না। ঘরে নতুন বউকে ফেলে রেখেই তাকে যেতে হল। কারুতাম্মা স্বামীর ঘরে ঠিক নতুন বউ হয়ে আসেনি। শ্বশুর-শাশুড়ী না থাকায় একেবারে গিন্নী হয়ে বসল। সংসারে এখন অনেক কাজ কিন্তু ঘরে কিছু নেই। থাকবার মধ্যে আছে শুধু একটা মাটির হাঁড়ি আর একটা হাতা। ব্যস! এখন সংসার পাততে কত কি জিনিসের যে দরকার তার কি ইয়ত্তা আছে। পালানি একটা ঝুড়িতে কিছু চাল, নুন আর লঙ্কা কিনে রেখে দিয়েছিল। বিয়ের আগে পর্যন্ত পালানি সংসারী ছিল না। একটা সংসার পাততে হলে কি কি জিনিস লাগে তা বলে দেবার একটা লোকও

ছিল না তার বাড়িতে। এখন কারুতাম্মাকেই দেখে শুনে সব ব্যবস্থা করতে হবে।

কারুতাম্মা ভাত রেঁধে ফেন গালল। তারপর পেঁয়াজ দিয়ে একটা তরকারী রাঁধল। তরকারী রাঁধার বাসন সে পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এল। মসলাও পাশের বাড়ি থেকে বেটে আনল। পাশের বাড়ি মসলা বাটার সময় বাড়ির বুড়ি মা বলল :

'নতুন বউ ভালোই মনে হচ্ছে। তা দেখ মা, আমাদের ছেলেকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি এখন তোমাকেই সব দেখে-শুনে জোগাড়-যন্তর করে নিতে হবে।'

দু-একদিনের মধ্যেই কারুতাম্মা অনেক কথাই শুনতে পেল। ওর বাপের বাড়ির গাঁয়ে যে গল্প সে শুনত তা এখানেও শুনতে পেল। এই গল্প শুনতে পেয়ে কারুতাম্মা ভাবছিল যে সব জায়গাতেই কি এইধরনের গল্প শুনতেপাওয়া যায়, না, পাড়ার মেয়েরা শুধু তার কাছে এই ধরনের গল্প পাড়ছে! এখানকার জেলেনীরা যে ভাবে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাতে কারুতাম্মার কেমন যেন ভয় হয়। ওর বুকটা ঠক্‌ঠক্ করে ওঠে! কেন এরা ওর দিকে এমন ভাবে তাকায়? ওরা কি তার গোপন কথা জানতে পেরেছে?

প্রথম দিন থেকেই ওখানকার জেলেনীরা কারুতাম্মাকে নিয়ে জটলা শুরু করল। তাদেরই বা দোষ কি? কারুতাম্মাকে নিয়ে অনেক কিছুই বলার আছে। ওর বাপের দু-দুটো নৌকো আছে। সে কি করে এমনি একটা চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে ছেলের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিল!

একটা জেলেনী বলল, 'আরে এসব গুজব—তোরাও যেমন সব বিশ্বেস করিস্! ওর বাপের সত্যিসত্যিই নৌকো আছে কিনা তা কে জানে?'

কোচ্চাকি জেলেনী তখন বলল, 'আরে না না। আমার মিনসে যে মরসুমের সময় নীরকুন্নাথে মাছ ধরতে গিয়েছিল, তখন নিজের চোখে দেখে এসেছে। লোকটার জাল আর নৌকো তো আছেই—হাতে এক কাঁড়ি টাকাও আছে।'

বাবাকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল, 'তাই যদি হয় তাহলে মেয়েকে এমন হাবাতের ঘরে বিয়ে দিল কেন গা?'

কোচ্চাকি বলল, 'তা ছেলে আর এমন কি খারাপ দিদি।'

তখন কোড়া জেলেনী বলল, 'আমার মনে হয় কি জানো, মেয়েটার নিশ্চয় কোনও দোষ আছে।'

সকলেরই কান খাড়া হয়ে উঠল। কোড়া এমন কথা বলল কেন তাই নিয়ে ওদের আর কৌতূহলের সীমা রইল না।

কোড়া তখন বলল, 'আরে মেয়েটার রীতভীতের ঠিক নেই বলেই না কোন-রকমে তাকে বিদেয় করেছে।'

একটা বুড়ী জেলেনী একথা শুনে আঁতকে উঠে গালে হাত দিয়ে বলল, 'আই গো সাগর মা! কি সব্বনেশে কথা গো! এ মেয়ে যে তাহলে আমাদের সমুদ্দুর শুকনো করে ছাড়বে।'

জেলেনীরা তখন কোড়াকে আরও অনেক প্রশ্ন করতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কোথায়—? কার সঙ্গে···? কবে···? ইত্যাদি কিন্তু কোড়া খানিকটা বলে বাকিটা আর বলল না।

একটা ভাত আর তরকারী রাঁধার পর কারুতাম্মার কাজ যখন শেষ হল তখনও পাড়ার মেয়েদের ওকে নিয়ে গল্পগুজব শেষ হয়নি। ওর মার অসুখের কথা সকলেই জেনেছে। মাকে এই রকম অবস্থায় ফেলে কোন্ মেয়ে চলে আসে? এই কথাটাই সকলে বলাবলি করতে লাগল—বলি সোয়ামী আর কদ্দিনের? মাই কি সবার বড় নয়? তার ওপর মার যখন ঐ অবস্থা। ব্যাপারটা যে সত্যি করে কি তা জানার জন্যে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছু একটা ভেতরে না থাকলে কি এমন ভাবে কোন মেয়ে চলে আসে। দুপুরের মধ্যে কারুতাম্মার কথা ঘরে ঘরে আলোচনা হতে লাগল। মেয়েটার নিশ্চয়ই রীতভীতের ঠিক নেই। মা-বাপ মেয়েটাকে কোনও রকমে বিদেয় করে বেঁচেছে। যদি কথাটা সত্যি হয়—তা হলে? তাহলে যে কি হবে তাই ভেবে জেলেনীরা খুব ভয় পেয়ে গেল।

কারুতাম্মাকে নিয়ে যখন পাড়ার জেলেনীদের মধ্যে এইরকম গল্পগুজব চলছে, ও তখন কাজকর্ম সেরে চুপ করে বসে মার কথা ভাবছে। মা এখন কেমন আছে তা ও জানে না। মাকে ঐ অবস্থায় ফেলে ওর চলে আসাটা ঠিক হয়েছে কিনা কে জানে। বাবা তাকে ত্যাগ করেছে চিরকালের জন্যে। বাবার সেই কথাগুলো এখনও তার কানে বাজছে—'ও আমার মেয়ে নয়।' কারুতাম্মা ওর বাবাকে খুব ভাল করেই জানে। একবার যখন বলেছে তখন আর তাকে মেয়ে বলে স্বীকার সে কিছুতেই করবে না। কারুতাম্মা ভাবতে লাগল সত্যি এমনি ভাবে চলে এসে ও বোকামিই করেছে। বাপের কথা না শুনে এমনি ভাবে চলে আসাটা তার পক্ষে খুবই দুঃসাহসের কাজ হয়েছে। ওর মত এমন মেয়ে হয়তো ওদের গাঁয়ে আর একটিও নেই। এখন বোধহয় সকলেই তাকে

গালমন্দ, শাপমন্যি করছে। তা করুক, ওর মা তো ওকে আশীর্বাদ করেছে। এখানে আসার অনুমতি মাই দিয়েছে। তাহলে আর ভয়টা কিসের!

বেচারী মা! ওর নিরীহ গোবেচারী মা ওর জন্যে কত না সহ্য করছে। মেয়ের জন্যে মাকে সহ্য করতেই হয় কিন্তু তার মা যেন একটু বেশিই করেছে। বিছানায় পড়ে থাকলে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেওয়ার কেউ না থাকলেও ওর মা ওর কথাই ভেবেই জোর করে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন মাকে কত গালমন্দ করবে। মাকে সে সব সহ্য করতে হবে। তার জন্যে না জানি মাকে আরও কত সহ্য করতে হবে। বাবা তো আর কোনদিনই তাকে ক্ষমা করবে না হয়তো বাড়িতেও ঢুকতে দেবে না। সেই দুঃখটা মার বুকে শেল হয়ে বাজবে।

মার চিন্তার পর এবার ওর ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা ওকে পেয়ে বসল। ওর মা-বাপ ভাই-বোন আছে, মা-বাপ কষ্ট করে পয়সা জমিয়েছিল, মেয়ে দুটিকে কিন্তু তারা খুব যত্ন করেই বড় করে তুলেছিল। মা-বাপের স্নেহচ্ছায়ায় বসে ওর গায়ে আজ পর্যন্ত একটি আঁচড়ও লাগেনি। ওর অবশ্য প্রয়োজন বা চাহিদা কম ছিল, কিন্তু যেটুকু ছিল তা সব ওর মা-বাপ মিটিয়েছে। দিনগুলো তার ভালোই কেটেছে, দুঃখ বা অভাব কাকে বলে সে জানতে পারেনি। আজ সেই আরামের জীবন পেছনে ফেলে সে এক নতুন জীবনে পা দিয়েছে, একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে। সেই জীবন কেমন হবে কে জানে?

ভালভাবে খাওয়া জুটবে কি? পরবার কাপড় জুটবে কি? মাথায় তেল কিনতে পয়সা জুটবে কি? খিদে কাকে বলে এতদিন পর্যন্ত সে জানত না, আজ খিদে পেলে তা মিটাবার জিনিস সে পাবে কিনা তাও তো ঠিকমত জানা নেই। এখন কি আর সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারবে—পারবে কি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে? সমস্ত কিছুই অনিশ্চিত। হঠাৎ ওর মনে হল ও যেন এই বিশাল পৃথিবীতে বড় একা। ওর ক্ষিধে-তেষ্টা মেটানোর, ওকে আগলে রাখার কেউই নেই।

ও এক পুরুষের ভালবাসা পেয়েছিল। ভালবাসা যে কি বস্তু তা ও জানে। এখন যে পুরুষের ঘর করতে ও এসেছে সেকি ওকে তেমনি ভালবাসবে? এই লোকটার ভালবাসা পাবে কি না পাবে এটা ওর কাছে একটা খুব বড় প্রশ্ন হয়ে দেখাদিল। পালানির সম্বন্ধে কতটুকুই বা সে জানে।

ওর মা যখন বিছানা নিয়েছিল তখন সব দেখেশুনে সেই লোকটার মনে একটুও দয়া জাগেনি। নিজের গোঁ ধরে ছিল সে। যদি সে একবার বলত

যে 'মেয়েকে এখন নিয়ে যাব না' তাহলে এত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হত না। দুটো দিন ওদের বাড়িতে থাকলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যেত না। কিন্তু সেই যে নিজের গোঁ ধরে রইল তার থেকে এক পাও নড়ল না সে। এই লোকের ভালবাসা কি সে পাবে? পেলেও কতদিন টিকবে কে জানে? অমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকটার কাছ থেকে সেদিনের মত ব্যবহার যে ভবিষ্যতেও পাবে না তা কি কিছু ঠিক করে বলা যায়। কেমন ব্যবহার করলে লোকটা খুশি হয়, কারুতাম্মা তার কাছ থেকে চিরকাল ভালবাসা পায় তার কিছুই ওর জানা নেই, কিন্তু এখন ওর পালানি ছাড়া আর কেহই বা আছে? কেউ নেই···কেউনা শুধু ঐ একটি লোক ছাড়া। তার ভালো লাগা-না-লাগার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু কি তার ভাল লাগে আর কি না লাগে সে বিষয়ে কারুতাম্মা তো কিছুই জানে না।

তবে কারুতাম্মার আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব কিছু একটা বড় নয়। সে একটা সাধারণ জেলেনীর মতই স্বামীপুত্তুর নিয়ে সুখে ঘর করতে চায়। তার জন্য সে সব কিছু সহ্য করতে রাজী আছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যারা দিনের পর দিন সব মুখ বুজে সহ্য করে আর আপনার কাজ চলে সে তাদেরই একজন হতে চায়। ওর জীবন সাদাসিধে ভাবে কেটে গেলেই হল কিছু যেন অস্বাভাবিক না ঘটে। কিন্তু সাদাসিধে এক জেলেনীর মত জীবনটা ভালভাবে কাটিয়ে দেওয়া কি সম্ভব হবে?

এখানেই কারুতাম্মার ভয়। কে যেন ওর ভেতর থেকে প্রায়ই বলে— 'পারবিনা তুই সাধারণ জেলেনীর মতো খাঁটি থাকতে, পারবি না।' মনের এই চিন্তা কিন্তু আজ শুরু হয়নি। অনেক দিন আগে থেকেই সে এং ভাবে ভাবতে শুরু করেছে। ওর জীবন যে আর অন্য জেলে-মেয়েদের মত নয়। ওর জীবনে এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গেছে যা আর কারুর জীবনেই ঘটে নি। শুধু যে ঘটে গেছে তাও নয় আরও অনেক কিছু হয়তো ঘটতেও পারে। আর সত্যিই যদি কিছু ঘটে তাহলে তার সমস্ত জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। জীবনে সে সুখের মুখ দেখতে পাবে না। তার জীবনে যে কিছু একটা ঘটবে এরকম একটা চিন্তা তার মনে প্রায়ই আসে। আজ যেন এই চিন্তাটা বেশী করে তার মনকে বিচলিত করছে। সত্যিই যেন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানের কাছে ওর এই প্রার্থনাই করার আছে যে ও আর কিছুই চায় না চায় শুধু ওর স্বামীর ভালবাসা। তাইই ওর যথেষ্ট। ওর জীবনে যেন অস্বাভাবিক কিছু না ঘটে।

কিন্তু মনে মনে যা ভাবছে তার যথার্থতা সম্বন্ধে নিজের মনেই সংশয় জাগছে। ওর জেলের ভালবাসা ও চায় তার জন্যে ও সব কিছু সহ্য করতে রাজী আছে। আবার অন্যদিকে তার এই আগ্রহ, তার এই ইচ্ছে যে কতটা সত্যি তাই নিয়ে তার মনে সন্দেহ জাগছে। নিজের মনকেও ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছে না।

প্রত্যেক মেয়েরই বিয়ের পর জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ যে তার স্বামী তাকে সম্পূর্ণরূপে ভালবাসুক। এই ভালবাসা যে কি সে সম্বন্ধে প্রথমে তাদের ধারণা বা অভিজ্ঞতা এতটুকুও থাকে না। কিন্তু কারুতাম্মার কথা আলাদা। সে জানে ভালবাসা কি। সে জানে ভালবাসার মধ্যেও কত ব্যথা, কত বেদনা লুকিয়ে আছে। তাই তো ঠিক মতো ভালবাসা সে এ জীবনে আবার পাবে কিনা তার সন্দেহ।

কারুতাম্মার কেমন যেন একটা ধারণা মনে গেঁথে গেছে যে পালানি ভালবাসতে পারবে না। যদি ওর অনুমান সত্যি হয় তাহলে কেন সে তার ঘরবাড়ি ছেড়ে সম্পূর্ণ এক অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে চলে এসেছে? এটা কি একটা খুব বড় পরীক্ষা নয়? কিন্তু বাপের বাড়িতে থাকলেও কি এই পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি ছিল? হয়তো এর চেয়ে আরও অনেক বড় পরীক্ষার সামনে তাকে দাঁড়াতে হতো।

এমনি সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে দুপুর হয়ে এল। দুপুরের দিকে পালানি সমুদ্র থেকে ফিরে এল। কারুতাম্মা খুব যত্ন করে তাকে ভাত বেড়ে দিল। এই প্রথম সে একজনকে ভাত বেড়ে খাওয়াচ্ছে। তরকারী তার ভাল লাগবে কিনা কে জানে? ওর রান্না ভাল হয়েছে কিনা কে জানে? মানুষটা পেট ভরে খাবে কিনা তাই বা কে জানে? সবই অনিশ্চিত। পালানি খেতে শুরু করল, খুব তৃপ্তি করেই পালানি ভাতের গ্রাস মুখে তুলছিল। তাই দেখে কারুতাম্মার মনের আশঙ্কা কিছুটা কমল। দরজার আড়ালে ও দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও পালানিকে কতকগুলো কথা বলল। পালানিকে ও ভালবাসে কিনা বা পালানি ওকে ভালবাসবে কিনা এ সব কিছু নয়। ও বলল:

'তরকারী রাঁধার বাসন একটাও নেই। ভাতে হয়তো কাঁকর থাকতে পারে কেননা চাল চেলে নেওয়ারও কোন বাসন নেই। হাতা আছে একটা মাত্র। তরকারী বোধহয় ভাল রান্না করতে পারিনি। মসলা ভাজার কড়া পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছি, পাশের বাড়ি থেকে মসলাও বেটে এনেছি।' তারপর শেষে বললে, 'আমাদেরও হাঁড়ি, কড়া, হাতা, খুন্তি এসব কিনতে হবে।'

‘আরে কিনব কিনব। তবে সব একসঙ্গে পারব না।’

‘একসঙ্গে কেনার দরকার নেই। একটা একটা করে কিনলেই হবে।’

কথা বলা শেষ করে চেয়ে দেখে পালানির পাত খালি। তক্ষুনি রান্নাঘর থেকে আবার ভাত এনে পাতে দিল। ‘বাস বাস’—পালানি বলার পরও, ও আরও একহাতা ভাত দিল। এইটাই নিয়ম তা সে জানে। পালানি বলল :

‘আরে ভাত যে বড্ড বেশি হয়ে গেল।’

‘না না, কোথায় বেশি? ঐটুকু খেয়ে ফেল।’

তারপর একটু নির্ভয়েই বলল, ‘তরকারীটা বোধহয় খারাপ হয়েছে। তোমার হয়তো খাওয়া ভাল লাগল না।’

‘আরে না না, তরকারী খুব ভাল হয়েছে। দেখলে না আমি এত ভাত খেলাম।’

‘বাঃ, এইটুকু খেয়েই বলছ খুব বেশি খাওয়া হয়ে গেল!’

‘বাপরে, আমি এত বেশি ভাত কক্ষণও খাইনি।’

ঠিক নতুন বউএর মতো মিষ্টি হেসে কারুতাম্মা বলল :

‘এখন থেকে আরও বেশি করে খাবে, নইলে আমি হাতে করে খাওয়াব।’

পালানি ওর কথা শুনে হাসল। ওর সেই হাসির মধ্যেই যেন ওর ভালবাসা মিশে ছিল।

কারুতাম্মার মনের মধ্যে এতক্ষণ যে প্রশ্নগুলো তোলপাড় করছিল তার যেন কিছু সমাধান হল। পালানির স্বভাব ভালোই। ওকে পালানির মনে ধরেছে বলেই মনে হচ্ছে। তার ওপরে ওর চাউনির মধ্যে কি যেন একটা লুকিয়ে আছে। সেই চাউনিই তাকে বলে দিল যে স্বামীর ভালবাসা সে পাবে। আর কি চাই? শুরুতে এই কি যথেষ্ট নয়?

কারুতাম্মা বেশ খুশি মনে স্বামীর খাওয়া থালায় দুটি ভাত বেড়ে খেতে বসল। মুখ হাত ধুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে পালানিও রান্নাঘরে ঢুকে কারুতাম্মার পাশে গিয়ে বসল।

‘আমি তোমাকে ভাত বেড়ে দিই।’

কারুতাম্মা কিছু বলল না কিন্তু আনন্দে তার সারা মন ভরে গেল। মনে হল যেন তার হৃদয়মুকুলের পাপড়িগুলো এই ভালবাসার আলোয় থরথর করে কাঁপছে।

পালানি বলল, ‘আরে তুমি ভাত এত কম খেলে যে!’

‘আমার পেট ভরে গেছে।’

পালানি তখন ভাতের হাঁড়ি দেখিয়ে বলল, 'হাঁড়িতে ভাত নেই ?'

'আছে, আমার আর চাই না।'

কিন্তু পালানি এক হাতা ভাত তুলে কারুতাম্মাকে দিল। 'বাস বাস'—বলে কারুতাম্মা ভাতে হাত চাপা দিল কিন্তু স্বামীর দেওয়া ভাতগুলো সে খেল।

কারুতাম্মা এবার ওর সংসারে পুরোপুরি গিন্নী হয়েই বসল। আগেকার সেই চঞ্চল প্রেমিকা আর সে নয়। ভাত খাওয়ার পর বাসন মেজে কারুতাম্মা ঘরে এসে পালানির কাছে বসল।

পালানি জিজ্ঞেস করল, 'কি কি কিনতে হবে বল!'

'সবকিছু কেনার মত পয়সা আছে ?'

পালানি উঠে তার গেঁজেটা খুলে দেখল তাতে চারটে টাকা রয়েছে। সেদিনকার আয়ব্যয়ের হিসেব ও বউকে দিল। মাছ ভাল ওঠেনি। বিয়ের জন্য ধার করতে হয়েছিল তার কিছু শোধ করতে হল। বাকি এই চার টাকা আছে।

কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এখানে তোমরা মাছের ভাগ কত করে পাও ?'

'শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।'

'আমাদের ওখানে কিন্তু ষাট ভাগ।'

তারপর বলল, 'তোমাদের পাশের গাঁয়ে যেমন ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় তেমনি এখানেও করতে বল না কেন ?'

পালানি ওর এই কথায় বেশি কান না দিয়ে বলল, 'এখানে এইটাই চালু।'

কারুতাম্মা তখন ওর বাবা কি ভাবে সকলকে নিয়ে জোট পাকিয়ে ভাগের হিসেব ষাট করেছে সে গল্প পালানিকে শোনাল। পালানি বলল :

'আমাদের এখানে ঐরকম কিছু একটা করা মুশকিল। থাকগে ওসব কথা। কি কি জিনিস আনতে হবে বলল।'

কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'এক্ষুণি কিনতে যাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'না, একটু জিরিয়ে নাও। এই কাজ থেকে এলে এক্ষুনি আবার হাঁড়ি কড়া কিনতে গেলে লোকে আমাকে দুষবে। বলবে, মানুষটা এই কাজ থেকে এল আর বউটা তাকে ছুটোছুটি করাচ্ছে। শুয়ে একটু কোমর সোজা করে নাও। বিকেলের দিকে গেলেই হবে।'

পালানিরও তাই ইচ্ছে। ও একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে বউকে কাছে

ডাকল। কারুতাম্মা হয়তো এই ডাকেরই প্রতীক্ষা করছিল। ও স্বামীর ডাকে সাড়া দিল। পালানি বলল, 'এদিকে এসো।'

ও সলজ্জভাবে স্বামীর কাছে এগিয়ে গেল। মনে মনে কারুতাম্মা ঠিক করেছিল ভালভাবেই জীবন কাটাবে। ওর দেহে যত দিন প্রাণ আছে তত দিন সতী সাধ্বী স্ত্রীর মতই ব্যবহার করবে। তাই স্বামী ডাকতেই ও খুশি মনেই এগিয়ে এল।

পালানি ওকে নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে দুটো সবল হাতে খুব জোরে জড়িয়ে ধরল। কারুতাম্মার যেন দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়। দুচোখ ওর আবেশে মুদে গেল। সে প্রায় অর্ধচেতন হয়ে মাদুরের ওপর পড়ে গেল।

এক দিন ও এক পুরুষকে ভালবেসেছিল তার ভালবাসা পেয়েও ছিল কিন্তু এর আগে কোনও পুরুষের স্পর্শ সে তার দেহে অনুভব করেনি। সেই স্পর্শ পাবার জন্য মন তার ছট্‌ফট্‌ করত নিশ্চয়ই, কিন্তু কারুতাম্মা ওদের গাঁয়ের পবিত্রতা রক্ষা করতে চেয়েছিল তাই ইচ্ছে থাকলেও অন্য পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দেয়নি। এখন ওর বিয়ে হয়েছে। অধিকারের দাবীতে ওর স্বামী ওকে আজ নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। এই আলিঙ্গনে সে বাধা দেয়নি বরঞ্চ স্বেচ্ছায় নিজেকে স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে।

ও অন্য একজন পুরুষের ভালবাসা পেলেও সে পুরুষের স্পর্শ পায়নি—পায়নি নিবিড় আলিঙ্গনে বন্ধ হয়ে থাকার রোমাঞ্চকর অনুভূতি। এই অনুভূতি পাচ্ছে সে আর এক পুরুষের কাছ থেকে, এখন সে এই পুরুষটির হাতের মুঠোয়। তার শরীর এই পুরুষটির জন্যেই। এরই জন্যে এত দিন সে নিজের দেহের শুচিতা বজায় রেখেছিল। এখন থেকে আজীবন সে তা রাখবেও।

কতক্ষণে যে এইভাবে কারুতাম্মা স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে ছিল তা সে জানে না। যৌবনের জ্বালা কি সে যেন তা আজ তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতে লাগল। কি এক রকম নেশায় ও যেন বুঁদ্‌ হয়ে পড়েছিল। বাঁধ ভেঙে যাওয়া একটা প্রবল উচ্ছ্বাসের জোয়ারে সমস্ত দেহমন ঢেউএর মতো ফুলে ফুলে উঠছিল। ভেতরের সব কিছু তাতে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ এমনি ভাবে থাকার পর হঠাৎ ও যখন আবার নিজেকে ফিরে পেল তখন এক দারুণ লজ্জা ওকে ছেয়ে ফেলল। শুধু লজ্জা নয়, এক ধরনের ভয়ও। এ ভয়ের থৈ পাচ্ছেনা ও, অথচ এই ভয়ের স্পষ্ট কিছু একটা রূপ নেই। পাগলের মতো আপনার মনে ও কি সব আবোল তাবোল বকতে লাগল বিড়বিড় করে। এসব কি পাগলামি ও করল। লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়েছে কি ও?

ওর মতো মেয়ের মধ্যে যে এতটা বেহায়াপনা থাকতে পারে তা ও এতদিন কি ভাবতে পেরেছিল ? ওর স্বামী ওকে এখন কি ভাবছে কে জানে। ছি ছি ছি !

কারুতাম্মার হঠাৎ কেমন যেন একটা ভয় করতে লাগল যে ও একটা ভীষণ ভুল করে ফেলেছে। ওর যত গোপনীয়তা সব প্রকাশ হয়ে গেছে। ও সব জেনে গেল। পালানি তার স্বামী হলেও একজন অপরিচিত পুরুষ। কারুতাম্মা তার স্ত্রী হলেও সে একটি মেয়ে। এমনি ভাবে লজ্জা বিসর্জন দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে ? না জানি ওর স্বামী ওকে কি ভাবছে।

কেমন করে এত সহজে ও তার লাজলজ্জা বিসর্জন দিল ? আগে তো ও খুবই লাজুক, খুবই আটঘাট বাঁধা মেয়ে ছিল। কোনও দিন সে এমন ভাবে এক পুরুষের কাছে তার সব লজ্জাবরণ খুলে দেবে তা কি সে ভাবতে পেরেছিল ? এখন একটা ভয়ানক প্রশ্ন তার মনে তোলপাড় করছে ! সেই প্রশ্নের সম্ভাবনায় ওর মন ভয়ে ছেয়ে রয়েছে। যদি…যদি ওর স্বামী জিজ্ঞেস করে—

'ওঃ তুমি তাহলে আগের থেকেই সব জানতে ?'

'নাঃ, সত্যি বলছি বিশ্বাস কর আমি এ সবের কিছুই জানতাম না—' এই উত্তরই দেবে সে। কিন্তু ওর বর কি তা বিশ্বাস করবে ? আর যদি ওকে বিশ্বাস না করাতে পারে তাহলে তাদের দুজনের এই মিলিত জীবন যে অশান্তি আর অবিশ্বাসে মলিন হয়ে উঠবে।

এই ধরনের প্রশ্ন ওঠার আগেই ও ওর বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে কিন্তু কি বলবে ? কেমন ভাবে ক্ষমা চাইবে ?

আচ্ছা সব মেয়েরাই কি তাহলে তাদের বিয়ের পর এমনি একজন অপরিচিত পুরুষের সামনে রাতারাতি সব লজ্জা বিসর্জন দেয় ? কে জানে ? ও এসব জানবেই বা কি করে ? কিন্তু…কি…এই আবেগ এই কামনা ওর মধ্যে এল কি করে ? ও কি তাহলে আরও পাঁচটা মেয়ের মতোই !

যে সব অসাধারণ মেয়েরা ওদের গাঁয়ে একদিন জন্মেছিল যাদের নিয়ে বাঁধা গান আজও সমুদ্রের হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় ও ভেবেছিল ও বুঝি তাদেরই মত একজন। হ্যাঁ সে তাদেরই একজন, তার জীবন অন্য আর পাঁচটা জেলেনীর মত নয়।

কারুতাম্মার ভেতর থেকে কে যেন ওকে বলতে লাগল— 'তুই এক পুরুষকে ভালবেসেছিলি।' সেই কথা যখনই তার মনে পড়ত তখন কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। সে লোকটি কাছে এলে যে আবেশ যে

অনুভূতি ওর মনে জাগার কথা তা ইতিমধ্যে ওর মনে আস্তে আস্তে শেকড় গাড়ছিল।

তাই ও যখন আর এক পুরুষের একান্ত নিকটে এল তখন অতি সহজেই ও তার লাজ-লজ্জা সমস্তই বিসর্জন দিয়ে দিল। ও যেন কেমন পাগল হয়ে গিয়েছিল। সকলের নিশ্চয়ই ওর মতো অনুভূতি জাগে না। এমনি সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কারুতাম্মা সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। পালানির ডাকে ওর চমক ভাঙল।

পালানি বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। কি কি জিনিস আনতে হবে জিজ্ঞেস করল। কারুতাম্মা পালানিকে পয়সা বুঝে জিনিস কিনতে বলল। তারপর কি কি জিনিস আগে দরকার তার একটা ফিরিস্তি দিল।

পালানি চলে গেলে একা বসে থাকতে থাকতে কারুতাম্মার পারীকুট্টির কথা মনে পড়ল। পারীকুট্টি এখন কেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছে কে জানে। হয়তো তার মন হতাশায় ভেঙে পড়েছে। তার টাকাটা আজও ফেরত দেওয়া হয়নি। মা বিছানায় পড়ে, আর হয়তো ওর টাকাটা ফেরত দেওয়ার কথা কেউ ভাববেও না। এদিক দিয়েও পারীকুট্টি দেউলে হয়ে গেল।

কি যে করবে ও! পারীকুট্টির চিন্তা মন থেকে ও একেবারেই মুছে ফেলতে পারছে না। কিন্তু এটা তো একটা মস্ত বড় পাপ। ও একজনের বউ হয়ে অপর এক পুরুষের কথা চিন্তা করছে। সত্যিই এটা পাপ কিন্তু তবু ওর ভেতর থেকে কে যেন বলছে—'পারীকুট্টিকে ভোলা তোমার সম্ভব হবে না কারুতাম্মা—আজীবন তার স্মৃতি তোমার মনে গভীর ভাবে আঁকা থাকবে।'

কারুতাম্মা নিশ্চয়ই জানে যে ওদের সমুদ্রের ধারে পারীকুট্টির গান আজও হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। সে গান কারুতাম্মা যেন এখানে বসেও শুনতে পাচ্ছে। কারুতাম্মার মনটা হঠাৎ খুব দমে গেল। কেমন করে ও আবার ওর মনের সেই নিশ্চিন্ত ভাবটি ফিরে পাবে? কেমন করে ও সহজ সরল মন নিয়ে বাঁচতে পারবে। হয়তো চিরদিনের জন্যেই ওর মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। চিরকালই ওকে দুঃখ পেতে হবে, তাই হয়তো ওর কপালের লিখন।

সন্ধের দিকে পালানি বাজার থেকে হাঁড়ি, কড়া, ঘড়া সব কিনে আনল। রাস্তায় ওর বন্ধুবান্ধবেরা বাসনপত্তর দেখে ওকে ঠাট্টা ইয়ার্কি করল খুব। বাড়িতে আসার পর কারুতাম্মা বলল, 'হাঁড়ি তোমার একেবারেই ভালো হয়নি। কড়াটাও বড্ড ফিনফিনে হয়ে গেছে।' কারুতাম্মা যেন জিনিসপত্র কি ভাবে কিনতে হবে না হবে তা ভালোভাবেই জানে, অন্ততঃ পালানির চেয়ে যে জানে

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পালানি ওর কথা মেনে নিয়ে বলল :

'আমি কি আর বাসনকোসন কোনদিন কিনেছি যে এসব বুঝব !'

কারুতাম্মা হাসল। ও এমনি এমনিই কথাগুলো বলেছিল।

সেদিন রাতে কারুতাম্মা জেগেই কাটিয়ে দিল। ওদের দুজনের দুজনকে অনেক কথা বলার ছিল। কথা আর ফুরোয় না। কি ভাবে ওরা ওদের সংসার সাজিয়ে-গুছিয়ে ভাল করে তুলবে তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা। ভবিষ্যতে তারা কি করবে এই নিয়ে অনেক গালগল্প। এমনি ভাবে গল্প করতে করতে কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল :

'মা অমন অবস্থায় পড়ে আছে দেখেও কেন তুমি আমাকে নিয়ে চলে এলে গো ?'

এমনি ভাবে প্রশ্ন করার সাহস এখন কারুতাম্মার হয়েছে। এ কথাটা জিজ্ঞেস করায় পালানির মনে একটু লাগল। তবুও বলল :

'বিয়ের পর বউকে বাপের বাড়ি রেখে আসাটা কোন মরদের কাজ নয়, ঠিকও নয়।'

কারুতাম্মা মনে করেছিল বিয়ের পর বউকে বাপের বাড়ি ফেলে আসাটা ঠিক নয় বলেই পালানি তাকে নিয়ে এসেছে, কিন্তু পালানি এখন তাকে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বলল। ওব গাঁয়ের লোকেরা চায়নি যে ও কারু-তাম্মাকে বিয়ের পর বাপের বাড়ি রেখে আসে। তাদের কেউই নতুন কনের বাপের বাড়ি থাকাটা পছন্দ করেনি তাই ও অমন ভাবে বলেছে। তারপর একটু সঙ্কোচের সঙ্গে পালানি জিজ্ঞেস করল :

'তোমার কি আমার সঙ্গে আসার ইচ্ছে ছিল না।"

কারুতাম্মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ ছিল।'

এই সময় কারুতাম্মা তার বাবার সম্পর্কে একটু দুঃখের সঙ্গেই বলল :

'বাবা তো এখন থেকেও নেই। অমন ভাবে চলে আসাতে আমার ওপর ভাষণ রেগে গেছে। হয়তো আমাকে আর বাড়িই ঢুকতে দেবে না। বাবার ঐ রকম স্বভাব, ঐ রকম গোঁ।'

পালানি ওর কথাতে বেশি গা লাগাল না। বলল, 'বেশতো, তোমার বাবা যদি ভাবে তার মেয়ে নেই তাহলে তুমিও ভাব তোমার বাবা নেই।'

পালানির এই কথায় কারুতাম্মার মনে হল আজ আর ও একা নয়। ওকে আগলে, রাখার কেউ রয়েছে। এই কথাগুলো যেন তারই প্রতিধ্বনি অর্থাৎ 'তোমার বাবা না থাকলেও কিছু যায় আসে না আমি তো আছি—ভয় কিসের ?'

তারপর পালানি খোলাখুলি বলল :

'দেখ, খোলাখুলিই বলি, তোমার বাবা খুব খারাপ লোক—খুবই লোভী। ঠিক তেমনি তোমাদের গাঁয়ের মোড়ল। সে আমাদের অপমান করেছে।' তারপর একটু আত্মাভিমানের সঙ্গে বলল :

'আমার মা-বাপ ভাই-বোন নেই বটে কিন্তু আমিও সাগর-মার ছেলে। এই যে সামনে অপার সমুদ্দুর পড়ে রয়েছে তা সবই আমার সম্পত্তি। আমার অভাবটা কিসের? এখানকার জেলেদের মত আমিও একজন জেলে কিন্তু আমার ওদের চেয়েও বেশি গুণ আছে। আমি আমার কাজ খুব ভাল করেই শিখেছি। যে কোনও জোয়ারে আমি নৌকো নামাতে পারি, যে কোন ঘুর্ণির মধ্যে পড়লেও আমি নৌকোকে খুব সহজেই বার করে নিয়ে আসতে পারি, আমি ঝড় তুফানকে ভয় করিনা, বড় বড় ঢেউএর সঙ্গে যুদ্ধ করে নৌকোকে সামলে রাখতে পারি, আমাকে কেউ যেন হেঁজিপেঁজি না ভাবে।'

কারুতাম্মা একটাও কথা না বলে চুপচাপ পালানির কথা শুনে যাচ্ছিল। এসব বিষয়ে তার কিছু না বলাই ভালো। ওর বর ওর বাপের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করছে। বাবার সম্বন্ধে তার ধারণা ভাল নয়। শুধু ওদের গাঁয়ের মোড়ল নয়, পালানির গাঁয়ের মোড়লকেও দরকার হলে সে দুকথা শুনিয়ে দিতে পারে।

পালানি বলে চলল, 'আমি কেন শুধু শুধু তোমার বাবার কাছে মাথা হেঁট করব?'

কারুতাম্মা চুপ করে শুনছিল এখন বলল, 'আমার মা কিন্তু বড় ভালোমানুষ।'

পালানি এ কথার কোন উত্তর দিল না। ও তখন অন্য কথা ভাবছিল। বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তোমার বাবা যদি এখানে না আসে আমিও তাহলে ওদিকে যাব না।'

বাবার মত ওর বরও জেদী। এই যে গোঁ ধরল তা আর ভাঙবে না।

তারপর কারুতাম্মা আপনার কথা বলল :

'এখন আমার মা বাবা নেই বললেই চলে। এখন তুমিই আমার সব। তোমার ভালবাসাই আমার সম্বল। আমি তোমার কথামতই চলব। সব কিছু দায়িত্ব মাথায় পেতে নেব। তোমার জন্যে আমি সব কিছুই সহ্য করব, যা বলবে তাই শুনব শুধু আমাকে একটু ভালবাসলেই যথেষ্ট।'

পালানি চুপ করে শুনল। কিন্তু সে তাকে ভালবাসবে কি না বাসবে সে

সম্বন্ধে কিছুই বলল না। 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভাল-বাসব'—এমন কোন কথা কারুতাম্মাকে দেওয়া দরকার নেই বলেই হয়তো পালানি চুপ করে রইল।

কিন্তু কারুতাম্মার মনে হল কোথায় যেন কিছু বাকি রয়ে গেল। একদিক থেকে একজন ভালবাসা পাওয়ার আবেদন জানাচ্ছে আর এক দিক থেকে আর একজন সে আবেদনে সাড়া দিচ্ছে না—সমস্ত ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন লাগল কারুতাম্মার। ও খাঁটি এক জেলেনীর মতোই স্বামীকে ভালবেসে তার সেবা করে জীবনটা কাটাতে চায় তাই পালানি তাকে ভালবাসার কথা না বললেও সেও কি তাকে ভালবাসার কথা বলবে না? অবশ্য ভালবাসার কথা না বললেও ওর স্বামীকে ও নিশ্চয়ই ভালবাসবে। কিন্তু পালানি যদি ওকে একবার জিজ্ঞেস করত যে তুমি কি আমাকে ভালবাসবে—তাহলে সে বলত যে আজীবন সে তাকে ভালবাসবে। কিন্তু সে দিক দিয়ে সে পালানির কাছ থেকে কোন সাড়া পেল না।

এমনি ভাবে সেই প্রথম রাতে তারা পরস্পরকে ভালবাসার বাগ্‌দান দিল না বটে কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা এক মত হল। তাদের একটা ছোটখাটো বাড়ি তুলতে হবে। এই চালাঘরে বেশিদিন কাটালে চলবে না। তারপর কারুতাম্মা হাসতে হাসতে বলল:

'আমারও আত্মীয়কুটুম বন্ধুবান্ধব ঘরবাড়ি কিছুই নেই।'

সেদিনকার মত তারা কথা বন্ধ করে চোখ বুজল। রাত তিনটের সময় সমুদ্রের ধার থেকে মাছ ধরতে যাওয়ার চীৎকার শোনা গেল। পালানিও যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। কারুতাম্মার বিয়ের আগে ওর গাঁয়ের জেলেনীরা ওকে কতকগুলো নিয়ম আচার শিখিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে একটা আচার ওর খুব ভাল করেই মনে আছে। তাই পালানি ঘর থেকে বেরোতেই কারুতাম্মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কি সোজা নৌকোতে যাচ্ছ?'

পালানি ওর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না। বলল, 'হ্যাঁ কেন?'

'ঘুম থেকে উঠেই সোজা এ ভাবে নৌকোয় যাওয়াটা ঠিক নয়।'

'তবে কি ভাবে যেতে হবে?'

'সমুদ্দুর থেকে যাদের রুজিরোজগার তাদের নিজেদের শুদ্ধ রাখতে হয়।'

তবুও পালানি বুঝতে পারল না। বলল, 'কি বলছ খুলেই বল না বাপু।'

কারুতাম্মা তখন লজ্জায় মুখটা নামিয়ে বলল, 'চান করে গেলে ভাল হয়।' পালানি ওর কথা মতো স্নান করল, কারুতাম্মাও স্নান করল। পালানি সমুদ্রের ধারে যেতেই একজন মাতব্বর গোছের জেলে জিজ্ঞেস করল :

'কি হে, চান করে এসেছ তো ?'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাপের বাড়ি থাকতেই সংসার কেমন ভাবে চালাতে হয় সে সম্বন্ধে কারুতাম্মার কিছু কিছু জ্ঞান হয়েছিল। মা আর বাবা তাদের ঐ সংসারের জন্য কত কষ্ট করেছে তা সে নিজের চোখেই দেখেছে। একটা সংসারের উন্নতির জন্য কেমন ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় তা বাবার কাছ থেকেই সে শিখেছিল। পয়সা হাতে পেলেই যা-তা খরচ করে বাবা উড়িয়ে দেয়নি। খুব সামলে-সুমলে গুছিয়ে-গাছিয়ে চালিয়েছে বলেই একটা নৌকো আর জাল বাবা কিনতে পেরেছিল।

তাই একা যখন ও বসে থাকে তখন ওর এই ছোট্ট সংসারের কী ভাবে উন্নতি হয় তারই কথা ভাবে। হাতের কাছে তার বাপের বাড়ির উদাহরণ রয়েছে। মনে মনে ভাবে ঠিক অমনি ভাবে তার সংসারটাকেও গুছোবে।

সেদিন চানটান করিয়ে পালানিকে বেশ পরিষ্কার ভাবে কাজে পাঠালেও যতক্ষণ না নৌকো তীরে ফিরে আসে ততক্ষণ কারুতাম্মার উৎকণ্ঠার সীমা রইল না। একদিনের মধ্যেই তার মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। কাল যে পালানিকে সে অপরিচিত পুরুষ বলে ভাবছিল আজ সেই পালানি তার কত কাছে। তার জন্য ভাবতে, তার সেবা করতে তার ভালো লাগছে। তার ভালমন্দের জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে সে বসে আছে। তাকে ভালভাবে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াবার জন্যে তার মন ব্যগ্র হয়ে আছে। আজকে সে তাই একটা নয়, দুটো তরকারী রাঁধল। তারপর সব গুছিয়ে-গাছিয়ে পালানির প্রতীক্ষায় বসে রইল।

অনেকদিন পরে সেদিন মাতি মাছ উঠল প্রচুর। পালানি প্রায় তিরিশ টাকার ভাগ পেল। জাল ধুয়ে শুকোতে দিয়ে চান করার সময় আইয়াপ্পা ওর বন্ধু-বান্ধবদের জিজ্ঞেস করল, 'কি হে, আজ আরীপাট শহরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আসলে কেমন হয় ?'

কারুরই তাতে অমত ছিল না। সাগর-মার আশীর্বাদে হাতে আজ প্রচুর পয়সা। একটু ফুর্তি করলে ক্ষতিটা কি ? সকলেই আইয়াপ্পনের কথায় সায় দিল শুধু পালানিই কিছু বলল না। ভেলুতকুঞ্জ বলল, 'আরে পালানি, তুই যে কিছু বলছিস না।'

আন্টীকুঞ্জ ঠাট্টা করে বলল, 'আরে ভাই তোরাও ত দেখি আচ্ছা। ওর ঘরে ওর নতুন বউ ভাত-তরকারী রেঁধে পথ চেয়ে বসে আছে। তার কাছে বসে ভাত খাওয়ার জন্য ওর মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে, আর তোরা ওকে বলছিস কিনা শহরে গিয়ে হোটেলে খেতে।'

কোচ্চুয়াপ্পন বলল, 'তাতে দোষের কি হল শুনি? আরে এখন ছোকরা বয়েস, ওদের তো এখন ওইই ভাল লাগবে।'

জেলেদের এই দলটায় যারা ছিল তাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। ভেলায়ুধন বিয়ে করার পর অনেক পোড় খেয়েছে। তাই পোড়খাওয়া লোকের মত ভারিক্কী চালে বলল, 'আরে ঐ মজা দুদিন, তারপর দেখবে ঘরে ভাত রাঁধা হচ্ছে না ঠিক মত—হলেও তা বিস্বাদ।'

এমনি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে করতে সকলের স্নান শেষ হল। ভেলুতকুঞ্জ আবার জিজ্ঞেস করল :

'কিরে পালানি, আসছিস নাকি আমাদের সঙ্গে?'

পালানি বলল, 'হ্যাঁ আসছি।'

বলল বটে কিন্তু মনটা কেমন যেন খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগল। কারুতাম্মা হয়তো পথ চেয়ে বসে আছে। যা হোক্ সকলে মিলে বাসে চড়ে আরীপাট শহরে স্ফূর্তি করতে চলল।

এদিকে কারুতাম্মা অনেক্ষণ পালানির পথ চেয়ে বসে রইল। দুপুর প্রায় শেষ হতে চলল তখনও পালানি ফিরল না দেখে ও সমুদ্রের ধারে এসে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। নৌকোগুলো সব তীরে বাঁধা রয়েছে। একটা নৌকোও সমুদ্রে নেই, একটা লোকও ধারে কাছে নেই।

তখন আন্টীকুঞ্জের বউ পারু সেখানে কি কাজে যেন এসেছিল। কারুতাম্মাকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল :

'কিগো নতুন বউ, সমুদ্দুর দেখছ নাকি?'

কারুতাম্মা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না না, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।'

পারু ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে। বলল, 'তুমি তোমার জেলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছ—না? তা ওরা তো সব এক সঙ্গে আরীপাট শহরে গেল। আজ যে হাতে কিছু পয়সা হয়েছে গো!'

কারুতাম্মার বাপের বাড়ির জেলেরাও ঠিক এই একই কাজ করে। যে দিনই হাতে পয়সা বেশি হয় সেদিন সব আলেপ্পী শহরে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে। কিন্তু তা বলে ওকে এমনি ভাবে অপেক্ষা করিয়ে আজই

যে পালানি যেতে পারে তা ও ভাবতে পারেনি। কারুতাম্মা মনে একটু দুঃখ পেল।

পারু আর কারুতাম্মা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ গল্প করতে লাগল কিন্তু কারুতাম্মার দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল। পালানির এই সব চালচলন না বদলালে তো চলবে না। আজ আরীপাটে গিয়ে যে পয়সাগুলো বাজে খরচ করবে সেই পয়সায় বাড়ির কত কি কাজ হত। এসব ভাবতে ভাবতে ওর মনটা খুবই দমে গেল।

পারু বলল, 'তা শুধু ফুর্তি করেই উড়োবে না সিল্কের 'নেরীদ'*ও কিনে আনবে।'

কারুতাম্মা কিন্তু এ কথায় খুশি হল না। বলল, 'দিদি, ঘরে জল গড়িয়ে খাওয়ার গেলাস নেই আছে মোটে দুটো মাটির হাঁড়ি। সিল্কের 'নেরীদ' দিয়ে করবটা কি?'

পারু বলল, 'কার ঘরেই বা বাসনকোসন আছে, বল। মরসুমের সময়ই এসব জিনিস কিনে রাখা হয়, তারপর অকালে এসব বিক্রী করলে পেটে দুমুঠো পড়ে।'

একটা কুকুর ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় কারুতাম্মার ঘরের চারদিকে ঘুর ঘুর করছিল। কারুতাম্মা তা দেখতে পেয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়ি গিয়ে কারুতাম্মা পালানির প্রতীক্ষায় বসে রইল। রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটার সময় পালানি বাড়ি এল। ওর হাতে একটা ছোট কাগজের প্যাকেট। কারুতাম্মা ভাবল মিছিমিছি রাগ দেখিয়ে কথা না বললে কেমন হয় কিন্তু তা নিয়েও ভয়, যদি পালানি পছন্দ না করে। তাই রাগ না করে একটু মিষ্টিহাসি হেসে ও বলল, 'কিগো, নৌকো কি এতক্ষণে ফিরল?' কথাটা যে ব্যঙ্গ করে বলা হল পালানি তা বুঝল না।

'না, এখন কেন ফিরবে? এই দেখ তোমার জন্য কি এনেছি—' বলে প্যাকেটটা কারুতাম্মার হাতে দিল। প্যাকেটটা খুলতে খুলতে কারুতাম্মা বলল:

'এখানকার সমুদ্দুরে জাল ফেললে সিল্কের 'নেরীদ' পাওয়া যায় নাকি গো?' ওর কথা শুনে পালানি হো হো করে হেসে উঠল, কারুতাম্মাও প্রাণ খুলে হাসল।

---

* অর্ধেক শাড়ি—মুণ্ডুর ওপর পরা হয়। লম্বায় আড়াই গজ থেকে তিনগজ হয়।

সুন্দর একটা সিল্কের 'নেরীদ'। কারুতাম্মা গোটা কাপড়টা মেলে দেখছিল। পালানি কাপড়ের দামটা ওকে জানিয়ে দিল। তারপর বলল :

'পাঁচটা 'নেরীদ' কিনেছি আমরা। আমি, ভেলুতকুঞ্জ, ভেলায়ুধন, কোচ্চুরামন আর আইয়াপ্পন। ভেলায়ুধনের ছোট ছেলেটার অসুখ, ওষুধ কেনার টাকা নেই। আইয়াপ্পনের অবস্থাও ভালো নয় কিন্তু তারাও নতুন কাপড় কিনেছে।'

কারুতাম্মা তখন মিষ্টি হেসে বলল, 'জল গড়িয়ে খাবার একটা গেলাস নেই ঘরে আর এত দাম দিয়ে কাপড় কিনলে কেন গো ?'

পালানি কারুতাম্মার হাসির আড়ালে ওর কথার গুরুত্বটা বুঝল না। হো হো করে হেসে বলল, 'কেন কাপড় কিনেছি জানো ?'

'কেন ?'

'মাম্মারশালায় মেলা এসেছে সেখানে পরে যাবার জন্যে। তুমি একবার এটা পরে এস তো দেখি কেমন লাগে !'

পালানির চোখদুটো জ্বলছে। তাদের দৃষ্টি গিয়ে সটান কারুতাম্মার পীবর বুকের ওপর পড়ল। কারুতাম্মা তা দেখে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ভেতরে সায়া পরেনি কারুতাম্মা। পাতলা মুণ্টুর ভেতর থেকে ওর নিতম্বের সবখানি পালানির চোখে পড়ল। পালানি ওর দিকে দুপা এগিয়ে এল। কারুতাম্মা বলল :

'ধ্যেৎ, ঘামে আর ধুলোয় তোমার গা চট্ চট্ করছে।'

পালানি ভাবল জল খাবার গেলাস না কিনে কাপড় কিনে ও ঠিকই করেছে। ওর খুবই ইচ্ছে বউকে ভালোভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে প্রাণভরে দেখে। জীবন কি শুধু খেটে মরার জন্য না শুধু বাড়ির জিনিসপত্র কেনার জন্যে না টাকা জমানোর জন্যে ? এ ছাড়াও জীবনে আরও অন্য কিছু আছে।

কারুতাম্মা বাপের বাড়িতে এমন কখন দেখেনি। তাই এই ভাবে কাপড় কিনে পয়সা নষ্ট করাটা একেবারেই অনাবশ্যক বলে ওর মনে হল। তবু ওর বর ওকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেখতে চায় এটা কি আর ওর ভালো লাগেনি ? নিশ্চয়ই লেগেছে। কাপড়টা খামোখা কেনার জন্য বরকে এ নিয়ে বেশ কিছু বলবে ও ঠিক করেছিল কিন্তু এখন সে কথা ভুলে গেল। হঠাৎ পালানি এক-টানে কারুতাম্মাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট মিলে গেল। দুজনে যেন এক হয়ে গেছে। এক সুখানুভূতির আবেশে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল যেন অনন্ত কাল

এমনি ভাবে তারা দাঁড়িয়ে আছে। হাত নড়ছে না, পা নড়ছে না, পরস্পরের আলিঙ্গন থেকে পরস্পরকে মুক্ত করারও যেন আবশ্যক নেই। পালানির বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কারুতাম্মা মনে মনে ভাবতে লাগল এমনি একটা সিল্কের কাপড়ের দরকার জীবনে নিশ্চয়ই আছে। জীবন শুধু কড়া চাটু হাঁড়ি হাতা নৌকো জাল নয়। এর মধ্যে মান্নারশালার মেলাও আছে, সিল্কের 'নেরীদ'-এরও জায়গা আছে।

সে দিন রাত্রে তুজনে এক থালা থেকে ভাত খেল। ভাত খাওয়ার সময় কারুতাম্মার চোখতুটো নেশায় যেন বুজে আসছিল। মুখটা ওর কেমন যেন টল্‌টল্ করছিল। পালানি এক গ্রাস ভাত কারুতাম্মার মুখের মধ্যে গুঁজে দিল।

'সর্বনাশ, এত ভাত আমি একসঙ্গে খাব কি করে?'

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে দাঁড় টেনে যুদ্ধ করে যে বলিষ্ঠ হাতত্নটি—সেই হাতের গ্রাস কারুতাম্মার মুখে ধরবে কি করে তা ঠিকই! পালানি তখন গ্রাসটা ছোট করে ওর মুখে পুরে দিল। তারপর কারুতাম্মা একদলা ভাত হাতের মুঠোয় নিয়ে ওর মুখে পুরে দিল। তখন পালানি বলল, 'আরে ধ্যেৎ অতটুকু গেরাসে আমার কি হবে? মুখের মধ্যে যে মিলিয়ে গেল।'

এমনি ভাবে হাসতে হাসতে তারা ভাত খাওয়া শেষ করল। আগে কাপড় কেনার জন্য কারুতাম্মা স্বামীর দোষ দিচ্ছিল কিন্তু এখন বলল, 'আমার একটা সিল্কের ব্লাউজও চাই কিন্তু।'

আসক্তির প্রবল উত্তেজনা একটু থিতিয়ে এলে কারুতাম্মা আবার ওর নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবনাতে ফিরে গেল। জীবনে যদি গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিকমত চলতে হয় তাহলে ও যেমন ভাবে সংসার চালাতে চায় তেমনিভাবে চলতে হবে নইলে আর কোন উপায়ই নেই।

সেদিন পালানি কত টাকা পেয়েছে তা জানার অধিকার তার আছে। কি ভাবে টাকাটার খরচ হয়েছে তাও জিজ্ঞেস করতে হবে।

কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'আজ কত টাকা ভাগে পেলে?'

'তিরিশ টাকা।'

'তা হাতে এখন তোমার কত আছে?'

পালানি বেহিসেবীর মতো বলল, 'বাকি টাকা ঐ গেঁজেটার মধ্যে আছে, গুনে দেখ।'

কারুতাম্মা গেঁজেটা খুলে দেখল ত্নটো টাকা মাত্র পড়ে রয়েছে। আঠাশ টাকা

খরচ হয়ে গেছে। এই টাকাগুলো এমনি ভাবে খরচ না করলে কত কি করা যেত। কিন্তু এখন একথা বলতে ওর একটু সঙ্কোচ হল।

পালানির বুকে হেলান দিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'শোয়ার ঘরের ভেতর রান্নার কাজ কতদিন আর চলবে?'

'না আর চলেনা'—পালানি যেন যন্ত্রের মত বলল, 'আমাদের এখন কত কি দরকার।'

একথার গুরুত্ব কারুতাম্মা বুঝল। ও তাই খুবই মিষ্টি হেসে বলল, 'তোমার বাড়িঘর আত্মীয়কুটুম জিনিসপত্তর কিচ্ছু না থাকলেও আমি ত আছি।'

পালানিকে একটু বেশি করে যত্ন করার কথাও ও মনে মনে ঠিক করল। এসব কথা বলার স্বাধীনতা ও এখন পেয়ে গেছে। ওর বর যে ওকে ভালবাসে সে বিষয়ে এখন আর ওর কোন সন্দেহ নেই।

কারুতাম্মা যদি সংসারের উন্নতি করতে পারে, শ্রী ফেরাতে পারে, তবে পালানির কোনও আপত্তি নেই একথা সে জানে। কিন্তু তার জন্যে তাকে কারুতাম্মার কতকগুলো কথা শুনে চলতে হবে। ও তাই হেসে সোহাগের সুরে বলল, 'যে টাকা ভাগে পাবে তা এভাবে খরচ করে ফেল না লক্ষ্মীটি।' তারপর স্বামীর গাল দুহাতের তেলো দিযে চেপে ধরে বলল, 'আমি কিন্তু তোমাকে এমনি ভাবে বাজে খরচ করতে দেব না।'

তার উত্তরে পালানি বলল, 'দোকানে গিয়ে এক কাপ চা খেলে বা হোটেলে গিয়ে এক-আধ দিন ভাত খেলে কি বাজে খবচ করা হল নাকি?'

'ছেলেপুলে হলে কি করবে?'

পালানি একথার অর্থ বুঝল না। ছেলেপুলে হলে আবার করবেটা কি? ও বলল:

'তারা আপনা আপনিই বাড়বে।'

'ধ্যেৎ, তুমি দেখছি কিছুই জান না, একেবারে কচি ছেলের মতো। সংসারধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাও নেই কোন ভাবনাও নেই।'

তারপর পোড়খাওয়া মেয়ের মতো পালানিকে ও বলল, 'সবার আগে তোমার একটা নৌকো আর জাল চাই। যে কোনও জেলের সবচেয়ে বড সাধ হল নৌকো আর জাল কেনা। তোমারও কি একটা নৌকো আর জাল কেনার সাধ হয় না— নিশ্চয়ই হয়!'

তখন পালানি জিজ্ঞেস করল:

'যদি আমাদের এই সমুদ্দুরের ধারের সব জেলেরাই এমনি ভাবে ভাবতে শুরু

করে তাহলে সকলেই তো বাবু হয়ে বসতে পারে। সকলে তাহলে তা ভাবে না কেন?'

এর উত্তর দিল কারুতাম্মা আর এক প্রশ্নে:

'হ্যাঁ, সেভাবে ভাবলে ক্ষেতিটা কি?'

তখন পালানি জেলেদের যুগযুগ ধরে সংস্কারের কথা ভাব-ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলল, 'দেখ, জেলেরা টাকা জমাতে পারবে না কোনদিন—কারণ খুব সোজা। তারা কি ভাবে টাকা কামায় তা একবার ভেবে দেখ। কত লক্ষ লক্ষ অবোলা জীবের পরাণ নষ্ট করে এই টাকা তারা রোজগার করে। মাছগুলো কেমন আনন্দে জলে ঘুরে বেড়ায়। তারা তো কারুর কিছু ক্ষতি করেনি। কিন্তু তাদের ধোঁকা দিয়ে ধরে জেলেরা টাকা কামায়। সেই লক্ষকোটি জীবগুলো যখন দমবন্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে তাদের লক্ষকোটি চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে মরতে থাকে তখন কি তারা আমাদের শাপ দেয় না? এমনি ভাবে জীব হত্যে করে যে টাকা রোজগার হয় সেই টাকা কি জমিয়ে রাখা যায়? আর এই অসহায় জীবগুলোর অভিশাপেই তো জেলেদের আদ্দেক দিন উপোস দিতে হয়।'

পালানি যা বলছে তা সত্যি। যুগযুগ ধরে বংশের পর বংশ জেলেরা ঠিক এই একই কথা শুনে আসছে, শিখে আসছে, বিশ্বাস করে আসছে। কারুতাম্মাও এই কথা শুনেছে কিন্তু এই বিশ্বাসের পিঠে যুক্তি দেখানোর একটি লোক ছিল সে হচ্ছে ওর বাবা। সেদিন ওর বাবা এই নিয়ে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো সে তখন ঠিক বুঝতে পারেনি! আজই যে বুঝতে পারে তা নয়। কথাগুলোর অর্থ খুব গভীর কিন্তু তাহলেও বাপের সেই কথাগুলো এখানে এখন আর ও তুলল না। স্বামীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করার সাহস ওর এখনও হয়নি।

পালানি আবার বলল, 'তা ছাড়া জেলেরা টাকা জমাবেই বা কেন? এই যে সামনে বিরাট সমুদ্দুর পড়ে রয়েছে তা ওদের সম্পত্তি। এখানে নেই কি? কিছু না জমালেও সাগর-মার আশীর্বাদে আমাদের কিছুর অভাব হবে না।'

কারুতাম্মা তখন জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ভালো মাছ না উঠলে জেলেদের না খেয়ে শুকোতে হয় কেন?'

'তা সে তোমার কপালের ভোগ আছে বলে।'

কারুতাম্মার তখন তার বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ল। কেমন ভাবে তারা জাল আর নৌকো কিনেছিল—ঠিক তক্ষুনি তার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করে উঠল,

মনে হল একটা আগুনের হল্কা যেন তার বুক ছুঁয়ে গেল। সেই জ্বালা সারা দেহের মধ্যে দিয়ে মাথার ওপর উঠল···হ্যাঁ কি ভাবে তারা জাল আর নৌকো কিনেছিল। বেচারী পারীকুট্টি একেবারে দেউলে হয়ে গেল।

পালানি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিশ্চয় তোমার মা-বাবার কথা ভেবে একথা বলছ—না?' তার কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা চোয়াড়ে ভাব। আবার সে বলল, 'তুমি তোমার মা-বাপের মতোই লোভী হয়ে উঠছ।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে হঠাৎ বলল :

'আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করছিল কবে শ্বশুরবাড়ি থেকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে।'

বাপের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ করে কবে নিয়ে যাচ্ছে তা অন্য জেলেনীরাও কারুতাম্মাকে জিজ্ঞেস করেছে। কারুতাম্মা একথার কোনও উত্তর দিতে পারেনি। বিয়ের পর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক দিয়ে না নিয়ে যাওয়াটা খুবই একটা লজ্জার কথা। কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে লোক পাঠাবে কিনা সে সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ও বলল, 'মাকে তো বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। মার এই অবস্থায় ওখান থেকে কেইই বা আসবে।' তারপর গলায় অভিমানের সুর নিয়ে মুখে মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে বলল :

'বিয়ের পর এখানে আসা অবধি তোমার লোকজন কেই বা আমাকে নেমন্তন্ন করেছে। এটাও তো একটা নিয়ম।'

কারুতাম্মা হেসে হেসে বললেও কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা খোঁচা ছিল। সেটা গিয়ে পালানিকে খচ্ করে বিঁধল। কারুতাম্মা যে ঠাট্টা করে বলছে তা ওর মনে হল না। ও চট্ করে রেগে উঠে বলল :

'এটা কি আগেই জানতে না যে আমার দিক থেকে নেমন্তন্ন করার কেউ নেই। জেনে শুনেই তো তোমার মা-বাবা তোমাকে আমার হাতে দিয়েছে।'

পালানির কথা শুনে কারুতাম্মার মুখ শুকিয়ে গেল। কি বলতে কি হল। ওর স্বামী রেগে গেছে, এ রকমটা সে আশা করেনি। পালানি কিন্তু তখনও থামেনি। বলল :

'আমার চালচুলো নেই, আমি একটা বাউণ্ডুলে হতভাগা। আমার জন্যে দুঃখু করার কেউ নেই, আনন্দ করবারও কেউ নেই। গাঁয়ের একটা খারাপ মেয়েকে আমার গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি সমুদ্দুরে ডুবে

মরলেও আমার জন্যে বুক চাপড়ে কাঁদার কেউ নেই। সেটা আমার কপালের লেখন।'

পালানির কথাগুলো শুনে কারুতাম্মা ভীষণ চমকে উঠল। গাঁয়ের একটা খারাপ মেয়ে! কি করে এই কলঙ্ক সে সহ্য করবে? কিন্তু এটা কি আংশিক সত্য নয়? ওর মনের মধ্যে যে অপরাধবোধ লুকিয়ে ছিল তা যেন পালানির এই কয়টি কথায় রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু ওর স্বামী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিয়ের এত অল্প দিনের মধ্যেই এই কথা বলছে?

কারুতাম্মা দুহাতে মুখ চেপে ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই কান্নার ধমকে ওর শরীরটা থর থর করে কাঁপছিল। পালানি ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কিছুক্ষণ ধরে কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কারুতাম্মার সেই ফুলে ফুলে কান্না দেখে পালানির মনে কোনও সহানুভূতি উদ্রেক হচ্ছিল কিনা কে জানে?

কান্নার মধ্যে অস্ফুট কয়েকটা কথা কারুতাম্মার কানে ঢুকল, 'একথা শুধু আমি কেন সবাই বলছে।'

পালানির মন নিশ্চয়ই কারুতাম্মার কান্না দেখে গলেছে। নইলে এমন ভাবে কথা বলবে কেন? একটু পরে পালানি বললে, 'ঐ পাপুই তো সব বলেছে।'

এমনি ভাবে বিয়ের পর এই প্রথম ঐ সংসারে একজনের চোখের জল পড়ল। পালানি যে একেবারে চুপচাপ বসে ওর কান্না দেখছিল তা নয়—থামাবার চেষ্টা করেছিল। এতক্ষণ যে হাসাহাসির মধ্যে তারা কাটাচ্ছিল হঠাৎ একটা কালো মেঘ এসে যেন সে সব ঢেকে দিল। এখন চারিদিক যেন থমথম্ করছে। সারা রাতেও এই গুমোট ভাবটা কাটল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কারুতাম্মা বলছিল, 'আমি···আমি কোনওদিন গাঁয়েব খারাপ মেয়ে ছিলাম না খারাপ হওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেইও।'

ওর বর ওকে বিশ্বাস করুক কারুতাম্মা তাই চাইছিল। জেলে সমুদ্রে গেলে তার উপকূলে ফিরে না আসার মত খারাপ কাজও করবে না। ওর কোনও অপরাধে পাহাড সমান বড বড ঢেউ তীরে আছড়ে পডবে না, বিষাক্ত সাপগুলো তীরে উঠে চলাফেরা করবে না, ভয়ানক সব সমুদ্রের জন্তুগুলো হাঁ করে গিলতে আসবে না, ঝড় তুফান উঠে সমস্ত কিছু নষ্ট হবে না। সে একজন খাঁটি জেলেনীর মতোই জীবন কাটাবে। কতবার যে কারুতাম্মা পালানিকে জিজ্ঞেস করল যে সে তাকে বিশ্বাস করে কিনা। পালানি কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কথাও বলল না। পালানির বিশাল বুকে মাথা রেখে শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া কারুতাম্মার আর

করার কিছুই রইল না।

পালানি শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল :

'তুমি কেন এতবার বিশ্বাস করি কিনা, বিশ্বাস করি কিনা জিজ্ঞেস করছ। মনে হচ্ছে যেন আমার কথাটা শুনে তুমি নিজেকেই নিজে সন্দেহ করছ।'

একথা শোনার পর কারুতাম্মার বুকটা আবার ধক্ করে উঠল। তাহলে কি ওর গোপন কথা পালানি কিছু জানতে পেরেছে। কোন পাজী লোক হয়তো কি সব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লাগিয়েছে—কে জানে?

এর পর সেই রাতে ও আর একটাও কথা বলল না। ওর কথা ওর বর জানুক বা না জানুক তাকে সব সত্যি কথা জানানোই ভাল। যদি ও সব খুলে বলে তাহলে ওর বর নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করবে। কিন্তু কি করে বলবে? কেমন ভাবে শুরু করবে? তবে বাইরের কেউ যদি যা তা বলে কেলেঙ্কারি রটায় তার চেয়ে ও যদি সব সত্যি কথা পালানিকে খুলে বলে তাই কি ভাল নয়?

কারুতাম্মার কেমন যেন মনে হতে লাগল একটা খারাপ কিছু ঘটবে। একটা কিছু ঠিক করতেই হবে, এখন আর দেরী করা উচিত নয়। কয়েকবার সে চেষ্টাও করল বলতে কিন্তু পারল না। কি করে বলবে? কি করে আরম্ভ করবে? বলবে কি আমি একজনকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু এতটা শোনার ধৈর্য কি কোন স্বামীর থাকে? তাহলে কি আরম্ভ করবে—'ছোট্টবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল?' না, তাও ঠিক নয়। এমনি ভাবে যদি কথা শুরু করে তাহলে সেই মধুর স্মৃতির কথা স্মরণ করে বেফাঁস কিছু বলে ফেলবে। হয়তো পারীকুট্টির প্রশংসা করে ফেলবে। তাহলে ওর স্বামী নিশ্চয়ই ভাববে যে পারীকুট্টির ওপর ওর টান এখনও আছে। না—তাও নয়। তাহলে কি বলবে? বলবে কি, সমুদ্রের ধারে এক মুসলমান ওকে জাদু করার চেষ্টা করেছিল; না, না, ছিঃ, একথাও সে বলতে পারবে না। তাহলে পারীকুট্টিকে খুবই একজন খারাপ লোক বলে ওর স্বামী ধরে নেবে। একজন নীচ লোক বলে ওকে ভাববে। না কারুতাম্মা তা পারবে না। পারীকুট্টি নীচ নয়। পারীকুট্টি ওকে জাদু করার চেষ্টাও করেনি। তক্ষুনি ওর চোখের সামনে পারীকুট্টির ছবি ভেসে উঠল। অশ্রুভরা চোখ আর অন্তহীন নিরাশা নিয়ে পারীকুট্টি দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্ধকারেও এ যেন পারী-কুট্টিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওর হৃদয়কে দুই পা দিয়ে দলে পিষে কারুতাম্মা এখানে একজনের বউ হয়ে এসেছে। সবদিক দিয়েই পারীকুট্টিকে পথে বসিয়েছে। জীবন এখন পারীকুট্টির কাছে শূন্য আর অর্থহীন। হয়তো এখন সে ছন্নছাড়ার মতো সমুদ্রের ধারে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গান গাইছে। সত্তর

পঁচাত্তর বছর হলেও সে ঐ সমুদ্রের ধারে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াবে। গাইতে গাইতে ও গলা চিরে মরবে একদিন। সেই কথাই তো সেদিন রাতে ও বলেছিল। কারুতাম্মা পারীকুট্টিকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

কি যেন বলার জন্য কারুতাম্মার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। ও ভুলে গেল কোথায় আছে। পালানি পাশেই শুয়ে আছে সে দিকে তার খেয়াল নেই। তার সমস্ত নারীত্ব হাহাকার করে বলে উঠল—'আমি তোমায় ভালবাসি।' পারীকুট্টির কাছে কারুতাম্মা ভালোবাসা জানাচ্ছে। কিন্তু তার নিজের শব্দ নিজের কানে যেতেই ও চমকে উঠল। পালানি জিজ্ঞেস করল:

'বিড বিড করে কি বকছিস? কাকে ভালোবাসিস?'

কারুতাম্মা যেন নিজেতে ফিরে এল। কে জানে হয়তো অনেক কিছু বলে ফেলেছে। যা হোক তবু ও বলল:

'হ্যাঁ ভালোবাসি।'

'কাকে?

ও একটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলল, 'আমার জেলেকে।'

রাত সাড়ে তিনটে বাজাব সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ধার থেকে হাঁকডাকের আওয়াজ শোনা গেল। সমুদ্রে যাবার সময় হযেছে। পালানি উঠে পড়ল। স্নান করে যাওয়ার জন্য কারুতাম্মা জেদাজেদি করতে লাগল। তারপর ও নিজেই স্বামীকে স্নান কবিয়ে দিল।

সেদিন পালানি একটু দেরী করেই নৌকোয় পৌঁছাল। কোনদিন সে এমন ভাবে দেরী করেনি। সেদিন নৌকোর অন্য জেলেদের ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ভেলাযুধন ইযার্কি করে বলল:

'আরে হয় হয়। নতুন বিয়ের পর ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয় বৈকি!'

এটা একটা অতি সাধারণ রসিকতা—এর মধ্যে খোঁচা কোথাও ছিল না কিন্তু পালানির এই ঠাট্টা একেবারেই ভালো লাগল না। বলল:

'ভেলাযুধন দাদা বেশি বাজে বকো না।'

ভেলাযুধন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল:

'কি এমন বলেছি যার জন্যে তুমি রেগে গেলে?'

পালানির ভয় হল হয়তো ভেলাযুধনের আরও কিছু বলার আছে। ভেলাযুধন কি কারুতাম্মার বিষয় কিছু জানে? ও কি কিছু বলতে চায়? যদি বলে? তাহলে?

নৌকো সমুদ্রে নেমে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল। পালানি হালে বসেছে।

কোথাও মাছ আছে বলে মনে হচ্ছে না। এখানে ওখানে আরও অনেক নৌকো ঘুরছে, জাল ফেলা হচ্ছে। পালানি কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা পশ্চিম দিকে ওর নৌকো চালিয়ে নিয়ে চলল। কোথায় যে এমনি ভাবে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা ওর জানা নেই। দাঁড় টানার সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন এই সমুদ্র আরও বিরাট আরও বিশাল হলে ভাল হত। হালে যেন কোন ভার নেই। ও যখন হালটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছিল নৌকোও সেই দিকে নুয়ে নুয়ে পড়ছিল। দূর চক্রবাল রেখার ওপারে যাওয়া যায় কিনা পালানি তাই দেখছিল। ওর সমস্ত শক্তি আর সাহস যেন আজ জেগে উঠেছে। শুধু একটা কেন সাতটা সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সাহস ও রাখে আজ।

নৌকো এতদূর চলে গেছে যে দুইকূলের তীর দেখা যাচ্ছে না। আণ্টিকুঞ্জ জিজ্ঞেস করল :

'কিরে পালানি, নৌকো কোথায় নিয়ে চলেছিস ?'

সকলেই দাঁড় গুটিয়ে দিল কিন্তু একা পালানির চালানোর ফলে নৌকো খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। পালানিকে যেন ভূতে পেয়েছে। চোখমুখের ভাব বদলে গেছে। ও যেন দিগন্তের ঐ অপর পারে যাবেই।

কুমারু খুব ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'আরে এই হারামজাদা, বলি তোর না হয় মরলে কাঁদার কেউ নেই'...বলে পালানির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বলল :

'মরতে চাস্ তো তুই একা মর। যেমনি নষ্টা একটা মেয়েকে ঘরে এনেছিস্ তেমনি তুই ডুবে মর্। তোর কপালে তাই লেখা আছে, কিন্তু আমাদের সর্বনাশ করছিস কেন ? আমাদের ছেলেপিলে আছে।'

ভেলায়ুধন তখন পালানির হাত থেকে হাল কেড়ে নিল তারপর পালানিকে ধরে আণ্টিকুঞ্জের কাছে বসিয়ে নৌকো ঘুরাল।

অতক্ষণ ধরে অত তাড়াতাড়ি নৌকো চালানোর জন্যে পালানি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সে। তারপর আবার আস্তে আস্তে দাঁড় টানতে লাগল। তারপর অন্য নৌকোগুলোর কাছে এসে তারা জাল ফেলতে আরম্ভ করল।

সে দিন তারা কিছুই পেল না। অন্য জেলেরাও ভালো মাছ পায়নি। কিছু কিছু কুঁচো মাছ পালানির নৌকোয় উঠেছিল। মাথাপিছু দেড়টাকা করে তারা পেল।

বাড়ি ফেরার আগে স্নান করতে করতে ভেলায়ুধন জিজ্ঞেস করল :

'কিরে পালানি তোর আজ হয়েছিল কি ? মাথায় ভূত চেপেছিল নাকি ?'

সকলেরই উত্তরটা শোনার ইচ্ছে। আজকে ওর মনুষ্যত্ব সব যেন লোপ পেয়েছিল। পালানি খুব পাকা মাঝি। কিন্তু এভাবে ইয়ার্কি মারাটা মোটেই ভাল নয়। কখন কি হয় বলা যায় না।

পালানি বলল, 'কি জানি কি হয়েছিল—সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।'

আণ্টিকুঞ্জ বলল, 'অমন ভুল হলে কি চলে ? আমাদের সব ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়।'

কুমারু বলল, 'এবার থেকে পালানিকে কোনদিনও হালে বসতে দেওয়া হবে না। ও আমাদের মাঝ-সমুদ্দুরে ডুবিয়ে মারবে।'

সকলে ওর কথায় সায় দিল। পালানিকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছিল… নিশ্চয়ই !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের পর চার দিনের দিন মেয়ে-জামাইকে বাপের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার নিয়ম, কিন্তু কারুতাম্মাকে নিয়ে আসার জন্য চেম্পনকুঞ্জ কোনও লোক পাঠাল না।

চাকী সেই যে মেয়ের বিয়ের দিন বিছানা নিয়েছিল তারপর আর উঠতে পারেনি। চাকীকে দেখতে শুনতে আসে নাল্লপেন্ন, সেবাশুশ্রূষাও করে। ঘরের সব কাজ করে পঞ্চমী। চেম্পনকুঞ্জ বউএর কোনও খোঁজখবর নেয় না। বউটা মরে গেছে কি বেঁচে আছে সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। 'চাকীর অবস্থা ভালো নয়—একজন কবিরাজ ডেকে না দেখালে নয়' বলে নাল্লপেন্ন দুচারবার তাগাদা দিল। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ সে কথার কোন জবাব দিল না।

মেয়ের বিয়ের পরও যেন চেম্পনকুঞ্জের কাজ কিছু কমেনি। সব সময় ও ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করে আর ফাঁকে ফাঁকে চাকীর ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে চলে যায়। কাছে এসে বসেও না একবার। এমনি ভাবে একদিন ও যখন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন চাকী বলল :

'দেখ, ত্রিকুন্নপুরায় গিয়ে মেয়ে-জামাইকে একবার নিয়ে এস।'

কথাটা শুনে চেম্পনকুঞ্জ রাগে যেন নিজেকেই ভুলে গেল। প্রচণ্ড এক অট্টহাসি হেসে ওঠে, 'মেয়েকে আনতে যাব আমি? হা-হা-হা, বললে বেশ! ওকে তো আনতে যাবই না, বরঞ্চ আমার বাড়িতে যাতে না আসতে পারে তারই ব্যবস্থা করব।'

চাকী এই নিয়ে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে দুচারটে কথা কাটাকাটি করল যার ফলে উত্তেজিত হয়ে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সেইদিন প্রথম চেম্পনকুঞ্জ একজন কবিরাজকে ডেকে আনল।

বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে আনল না দেখে পাড়াপড়শীরা এসে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে লাগল। চেম্পনকুঞ্জ এই সব প্রশ্নের জন্যে তাদের ওপর খুব রেগে গেল। কিন্তু পাড়াপড়শীরা ছাড়বে কেন? তারা কি কারণ…কি ব্যাপার জানার জন্য প্রায়ই চেম্পনকুঞ্জকে কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করতে লাগল। তাতে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে সকলের একচোট ঝগড়াও হয়ে গেল।

চেম্পনকুঞ্জের এই ব্যস্তভাব কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেল। আজকাল ও বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ে না। ওর দুটো নৌকোই মাছ ধরতে যায় কিন্তু মাছ তেমন ভালো উঠছে না আজকাল। এই নিয়েও নৌকোর জেলেদের সঙ্গে তার রাতদিন খেঁচাখেঁচি বাধতে লাগল।

এদিকে ত্রিকুন্নপুরায় কারুতাম্মাকে নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চলছিল। বিয়ের পর ওর বাপের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে গেল না দেখে জেলেনীদের মধ্যে কথার আর অন্ত ছিলনা। জেলেদের সমাজের নিয়ম অনুসারে মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারুতাম্মার মা-বাপ আত্মীয়স্বজন সব আছে অথচ মেয়েটাকে নিতে লোক পাঠাল না। এ কেমন কথা! কে জানে কি ব্যাপার! মা-বাপ হয়তো মেয়েটাকে বিদেয় করে বেঁচেছে। নাহলে যত গরীবই হোক্ বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে নিতে লোক আসত।

আর ওদিকে কারুতাম্মাও উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত গুণছিল—এই বুঝি বাপের বাড়ি থেকে কেউ এল। বাবা যে ওকে এমনি ভাবে বাদ দেবে তা ও একবারও ভাবতে পারেনি। বাপের বাড়ি থেকে কেউ না আসার জন্যে মার অবস্থা ভালো নেই ভেবে ও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ নিয়ে পালানির কাছে কিছু বলতে ওর সাহস হচ্ছিল না। কি জানি শুনে রাগ করবে কিনা। যাহোক অনেক ভেবে ও ঠিক করল যে পালানিকে এ নিয়ে কিছু বলবে।

একদিন তাই ভাত খাওয়ার পর পালানি যখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল কারুতাম্মা দেখল এইটাই অবসর। ও আপন মনে বলে ওঠে, 'মা-টা বেঁচে আছে কিনা কে জানে।'

পালানি কিছু বলল না। কারুতাম্মা ওর মুখের দিকে বেশ ভাল করে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে একটু তা-না-না-না করে বলল, 'চলনা আমরা একবার নীরকুন্নাথ যাই।'

ওর মুখে ঠাস করে একটা চড় মারার মতো পালানির কাছ থেকে জবাব এল, 'অত পীরিতে আর কাজ নেই।'

ও যে এমনি রূঢ়ভাবে ওর কথার উত্তর দেবে কারুতাম্মা তা ভাবতে পারেনি। পালানির চোখমুখের ভাব দেখে সত্যি বলতে কি কারুতাম্মা ভয় পেয়ে গেল। তবু একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'এমনি ভাবে বলছ কেন গো?'

পালানি খুব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন ভাবে?'

'আমাদের একটা মেয়ে হলে তার বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি

এমনি ব্যাভার করে ?—মেয়েটাকে যদি তারা আমাদের কাছে আসতে না দেয় তাহলে আমাদের কি রকম লাগবে বলত ?'

'সে যখনকার কথা তখন দেখা যাবে।'

এরপর আর কি বলা যায়। কারুতাম্মা তখনকার মত চুপ করে গেল। এরপর আর একদিন সুযোগ পেয়ে ও বলল, 'তা তুমি যদি যেতে না চাও যেও না। আমি একবার আমার মাকে দেখে আসি কি বল ?'

'হ্যাঁ যেতে পার তবে এক শর্তে—এখানে আর ফিরে এস না।'

কারুতাম্মার এই কথা শুনে একটু রাগ ধরল। ও বলল, 'বাবাঃ! তোমার মন কি পাষাণ গো।' বলেই ও একটু হাসল। মনে ভয় ছিল যদি আবার পালানি রাগ করে।

নীরকুন্নাথে মার মন আর ত্রিকুন্নপুরায় মেয়ের মনের খবর কেউ রাখল না। দুজন দুজনকে দেখার জন্যে যে কি রকম ছট্‌ফট্‌ করছে তা কেউ বুঝল না। দুজনের মন দুজনের জন্য কাঁদতে লাগল। এমনিভাবে একটার পর একটা দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। কারুতাম্মা আব কিছু না করতে পেরে নির্জন অবসরে একা একা কাঁদতে থাকে। চাকীর মনও মেয়ের জন্যে বেদনায় আকুল হঠে উঠছে কিন্তু মা কিম্বা মেয়ে কেউই পরস্পরের মনের কথা জানতে পারল না।

চাকীর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে জানতে পেরে পারীকুট্টি একদিন চাকীকে দেখতে এল। চেম্পনকুঞ্জ তখন সেখানে ছিল না। পারীকুট্টিকে দেখে চাকী কেঁদে ফেলল। ওর সেই গুনগুন করে কান্না দেখে পারীকুট্টির খুব খারাপ লাগল।

পারীকুট্টি অনেক বদলে গেছে। আগেকার সেই পারীকুট্টি আর নেই, আনন্দ উৎসাহ কিছুই যেন ওর নেই। তেমনিভাবে কাঁদতে কাঁদতে চাকী বলল, 'আমি···আমি···চললাম বাবা।'

চাকীর অবস্থা যে খুবই খারাপ হয়ে এসেছে পারীকুট্টি তা দেখতে পেল। তবু বলল, 'কি বলছ তুমি চাকী জেলেনী ? তোমার এমন কিছুই হয়নি যে যার জন্য তুমি এসব কথা বলছ।'

চাকী তখন পারীকুট্টিকে ওর বিছানার কাছে ডাকল। পারীকুট্টি চাকীর বিছানার পাশে গিয়ে বসল। চাকী পারীকুট্টির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল। পারীকুট্টি যে ওকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না।

কাঁদতে কাঁদতে চাকী বলল, 'বাবা—তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে!'

পারীকুট্টি বলল, 'তোমার যা কিছু বলার আছে তা সব আমাকে বলতে পার। আমার কাছে কোন লজ্জা করো না।'

প্রথমেই চাকীর পারীকুট্টির টাকার কথাটা বলার ছিল। সেকথার আভাস দিতেই পারীকুট্টি তাকে এই নিয়ে মনে কষ্ট পেতে বারণ করল। চাকী তখন চেম্পনকুঞ্জকে খানিকটা গালাগালি করল—

'বুঝলে বাবা! মিনসে খুব খারাপ আর লোভী। আমি আর কারুতাম্মা কত চেষ্টা করলাম তোমার টাকাটা ফেরত দিতে কিন্তু মুখপোড়া মিনসে তোমার টাকাটা ফেরত না দিলে আমরা কি করে ফেরত দিই বল?'

পারীকুট্টি বলল, 'চাকী জেলেনী, আমি তো তোমায় আগেই বলেছি এ নিয়ে বেশি ভেবে তোমার অসুখ আর বাড়িয়ে তুলো না।'

তারপর চাকী কি যেন পারীকুট্টিকে বলতে গিয়েও পারল না। আমতা আমতা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বলল:

'আমার মেয়েটাকেও দেখেশুনে বিয়ে দিল না। ওর কপালেও সারা জীবন দুঃখু লেখা আছে।'

এ নিয়ে পারীকুট্টির কিছুই বলার ছিল না কারণ কথাটা কারুতাম্মার বিষয়ে। চাকী বলে চলল, 'দেখছ তো বাবা আমি এমনিভাবে বিছানায় পড়ে আছি আর আমার মেয়েটাকে একবার আনতে পর্যন্ত পাঠালে না।'

চাকীর মনে মেয়ের জন্য যত উৎকণ্ঠা যত ভাবনা ছিল সব যেন এক সঙ্গে এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ও ভাবতে লাগল কারুতাম্মার কথা। বেচারী একজনকে ভালবেসেছিল। তারপর তাকে আর একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। ঠিক করে কি এখন বলা যায় যে মেয়ে তার সেই ভালবাসার লোকটিকে সম্পূর্ণ ভুলতে পেরেছে? শুধু তাই নয় শাশুড়ী ননদ আত্মীয় স্বজনহীন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে প্রথম প্রথম তার হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে। এখন তো আর সেই আগেকার স্বাধীনতা নেই তাই কিছু কষ্ট হলেও হয়তো সে তা মুখ ফুটে বলতে পারবে না। চিরদিনের ভবঘুরে ছন্নছাড়া ছেলে পালানি। সে যে কারুতাম্মাকে ভালবাসবে, আদর যত্ন করবে তাই বা কে জানে? চাকী বলল, 'মনে হচ্ছে মেয়েটাকে যেন হাত-পা বেঁধে সমুদ্দুরে ভাসিয়ে দিয়েছি বাবা।'

পারীকুট্টি চাকীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আরে না-না, পালানি ছেলে ভাল। নিজের কাজকর্ম বেশ ভালভাবেই জানে। কারুতাম্মা ওর কাছে সুখেই থাকবে।'

পারীকুট্টির কথা চাকীর বিশ্বাস হল না। ও ঘাড় নাড়তে নাড়তে কেমন

যেন আবেগের সঙ্গে বলল :

'তোমরা দুজনে এই সমুদ্দুরের ধারে একসঙ্গে খেলা করে ঘুরে বেড়াতে।'

চাকীর কথাগুলো পারীকুট্টির হৃদয়ের সবচেয়ে নরমতন্ত্রীতে গিয়ে ঘা দিল। কতদিনকার ভুলে-যাওয়া স্মৃতি আজ আবার জেগে উঠল। চাকী পারীকুট্টির মুখ দেখে তা বুঝতে পারল। চাকী তো জানে তার মেয়ের ভালবাসার কাহিনী। ভালবাসার শক্তি যে কত তাও হয়তো সে জানে। দুটো জীবনকে ভালবাসা ছাড়া আর কোন কিছুই এমন করে নাড়া দিতে পারে না। চাকী তাই মায়ের মতো বলল, 'বাবা, আমি ছেলে পেটে ধরিনি বটে কিন্তু আমার একটি ছেলে আছে।'

সেই ছেলেটা কে জানার জন্য পারীকুট্টি চাকীর মুখের দিকে তাকাল। সেই ছেলেটা কে জানানোর জন্যও যেন চাকী পারীকুট্টির মুখের দিকে তাকাল। তার-পর হঠাৎ ও পারীকুট্টির হাতদুটো জোর করে আঁকড়ে ধরে বলল, 'বাবা, সে ছেলে আমার তুমি।'

কথাটা শুনে পারীকুট্টির তপ্তহৃদয়ের এক কোণে যেন একটা সান্ত্বনার শীতল বাতাস বয়ে গেল। ও যাকে ভালবেসেছিল তাকে হারিয়েছে। এখনও যেন সে তার কত কাছে, সে যেন তার কেউ হয় আর সেও যেন তার। তাদের মধ্যে যেন আবার একটা নূতন সম্বন্ধ গড়ে উঠতে চলেছে।

পারীকুট্টির মন তখন চাকীর কথায় তোলপাড় করছিল, সে ভাবছিল কারুতাম্মার এই রকম বিয়ে হওয়ায় চাকীর খুব একটা আশা ভঙ্গ হয়েছে। চাকী মনে করছে কারুতাম্মার আর তার এই সমুদ্রের ধারে একসঙ্গে খেলে বেড়ানোর কথা আর তাই নিয়ে সে দুঃখও ভোগ করছে। চাকী তাকে আজ ছেলে বলে ডেকেছে। তাহলে…তাহলে? পারীকুট্টির শুকিয়ে-যাওয়া আশামুকুল আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠল। আবার কি কারুতাম্মা তার হবে? যদি তাই না হয় তাহলে চাকী এমনভাবে কথাবার্তা বলছে কেন? পারীকুট্টির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, ও কিছু না বলে চুপ করে রইল।

চাকী তখন বলল, 'বাবা, তোমাকে ছেলে বলে ডেকেছি, তাই মায়ের মতো উপদেশ দিচ্ছি বলে কিছু মনে করো না। দেখেশুনে একটা বিয়ে করে সংসারী হও আর ব্যবসাপত্তর ভালভাবে দেখাশোনা কর।'

চাকীর এই কথাগুলো পারীকুট্টির কানে গিয়ে ঝিম্‌ঝিম্ করে বাজতে লাগল যেন কোনকালেই এই কথাগুলো তার মন থেকে মুছে যাবে না। ঠিক এই

কথাগুলোই কারুতাম্মা সেদিন রাতে তাকে বলেছিল। কিন্তু সেদিন যে উত্তর সে কারুতাম্মাকে দিয়েছিল আজ আর চাকীকে সে উত্তর দিল না।

'বাবা, তুমি এমনি ছন্নছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কারুতাম্মার মনে আর কষ্ট দিও না। তার এখন বিয়ে হয়েছে। সোয়ামী-পুত্তুর নিয়ে সে সুখে ঘর করুক। তার সুখের পথে তুমি কাঁটা হয়ে বিঁধো না।'

পারীকুট্টি চাকীর কথাগুলো শুনে চমকে উঠল যেন কোন্ অশরীরী লোক থেকে শব্দগুলো তার কানে ভেসে এল। নিজের কানকেও সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। যেন মনে হচ্ছিল তার নিয়তি তাকে আদেশ করছে—'তুই আর তার জীবনের কষ্টের ভাগী হোস্ না।' সত্যি সত্যিই কি একথা শুনেছে না এটা অনুমান। না, অনুমান নয়, সে তো তার নিজের কানেই এক্ষুনি শুনতে পেল।

'পারীকুট্টি বাবা তুমি কারুতাম্মার ভাই। ওর নিজের কোনও ভাই নেই। তোমাকে আমি ছেলে বলে ডেকেছি তুমি এখন ওর ভাই।'

পারীকুট্টির কোন সন্দেহ ছিল না যে চাকী নিজে এই কথাগুলো বলেছে। এর পরেও চাকী অনেক কিছু বলল। কারুতাম্মার বাবা ওকে ত্যাগ করেছে বললেই চলে। চাকী এখন মরতে বসেছে। চালচুলোহীন এক বাউণ্ডুলে ছেলের দয়ার ওপর কারুতাম্মাকে ওর বাবা ছেড়ে দিয়েছে। এই পৃথিবীতে আপনার বলতে ওর কেউ নেই—এক পারীকুট্টি ছাড়া। চাকী ওদের এই নতুন সম্পর্কের কথা বারবার বলল—সহোদর-বন্ধন।

চাকী বলল, 'বাবা, তুমি কারুতাম্মার ভাই হয়ে থেকো চিরকাল। শুধু ভাই—কেমন বাবা মনে থাকবে তো?'

এবার পারীকুট্টির চোখদুটো জলে ভরে এল। চাকী দেখতে পেল ওর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। চাকী এর অর্থ বুঝতে পারল। কিসের জন্য তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে চাকী তা খুব ভালো করেই বুঝতে পারল।

চাকী তখন তাদের সেই প্রেমের অন্য রূপ দিল। সে বলল:

তুমি আমার কারুতাম্মাকে ভালবাসতে, এখন থেকে তোমাদের সম্পর্ক ভাইবোনের। ভালবাসার লক্ষণই হচ্ছে একটা কোন সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া। তোমাদের সম্বন্ধ হোক্ ভাইবোনের—কি বল বাবা?'

পারীকুট্টি সঙ্গে সঙ্গে একথার জবাব দিতে পারল না। ওর গলা কান্নায় বুজে এসেছিল। ও মনে মনে ভাবছিল যদি তাকে ভালবাসি তাহলে বোনের

মতো ভালবাসতে হবে! হয়তো তাইই ঠিক।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। পারীকুট্টি কিছু বলছে না দেখে চাকী জিজ্ঞেস করল :

'কি বাবা তাই নয় কি? তুমি কি তার ভাই নও?'

যন্ত্রের মত পারীকুট্টি উত্তর দিল—'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার মেয়ে তোমার বোন হল।' তারপর একমুহূর্ত থেমে বলল,

'আহা, কারুতাম্মা যদি আজ এখানে থাকত তাহলে মরার আগে এই কথাটা তাকে আমি বলে যেতে পারতাম।'

তারপর চাকী কেমন যেন বিকারগ্রস্তের মত পারীকুট্টিকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল যেন সে কারুতাম্মাকে বোনের মত দেখে। ওকে কেউ না দেখার থাকলে পারীকুট্টি যেন তাকে দেখে। কারুতাম্মা যদি তার মার মরার আগে না আসতে পারে তো তাকে জানাতে হবে যে তার একটি ভাই আছে। পারীকুট্টি চাকীর কথায় রাজী হল কিন্তু তবু চাকীর কেমন যেন মনে হল পারীকুট্টি মন খুলে রাজী হল না। তাই সে আবার সে কথা বলে ওর কাছ থেকে কথা আদায় করল। ও যে কারুতাম্মার ভাই তা আবার ওকে দিয়ে বলিয়ে নিল।

সেদিন রাতে অনেকদিন পরে চাকী সমুদ্রের ধার থেকে পারীকুট্টির গান শুনতে পেল।

সে সময়টা চেম্পনকুঞ্জের ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছিল। নৌকোর সঙ্গে ঠিকমত বেরোতে পারছে না। নিজে বেরোতে পারছে না বলে মাছও ভালভাবে উঠছে না—এই ওর ধারণা। এর ওপর ওর আর একটা বেশ বড় ক্ষতি হয়ে গেল। কাদের মিয়াকে কিছু মাল দিয়েছিল কিন্তু টাকাটা হাতে পায়নি, পরে দেবে বলেছিল। তারপর একদিন রাতে ঝাঁপের মধ্যে যা ছিল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কাদের মিয়া যে কোথায় ভেগে গেল তার কোন পাত্তা ও পেল না। এই ভাবে টাকাটা খোয়া যাওয়ায় চেম্পনকুঞ্জের খুব লোকসান হল।

তাই চেম্পনকুঞ্জ ঠিক করল যে আগের মতই সমুদ্রে যাবে। কতদিন আর এমনিভাবে সমুদ্রের ধারে নৌকো ফেরার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই একদিন এবং তার পরের কয়েক দিনও চেম্পনকুঞ্জকে ওর নৌকোর হালে বসতে দেখা গেল। কিন্তু হালে দাঁড়িয়ে থাকার মত শক্তি ওর ছিল না। দাঁড়িরা দাঁড় বাইছিল, সেই দাঁড়ের সঙ্গে তাল রেখে চেম্পনকুঞ্জ হালে

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, বসে পড়ল। ওর পা দুটো কাঁপছিল। অন্য নৌকোগুলোকে পেছনে ফেলে পাখির মতো সোঁ সোঁ করে উড়ে-আসা আর নৌকোভর্তি মাছ নিয়ে তীরে আগে ফেরার জন্য রেষারেষির দিন চলে গেছে। চেম্পনকুঞ্জের আর সে শক্তিও নেই, সে তেজও নেই আজ। ওর নৌকো অন্য নৌকোগুলোর সঙ্গে এক তালেই চলছে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে না। সেই সকলের আগে তীরের মতো সাঁ সাঁ করে ছুটে আসার দৃশ্য আর সমুদ্রতীরে কাউকে দেখতে হবে না।

সেদিন বাঁধা সময়ের আগেই চেম্পনকুঞ্জ নৌকো তীরে ফিরোতে হুকুম দিল। দাঁড়িরা কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করলে বলল, 'আজ এইই থাক্—'

'থাক্'—কথটা চেম্পনকুঞ্জের মুখে কেউ কোনদিন শোনেনি। তারপর ফেরার সময় হাত থেকে দাঁড় ফস্‌কে গেল তা তুলতে গিয়ে চেম্পনকুঞ্জ নিজেই জলে পড়ে গেল। নৌকোর অন্য জেলেরা তাকে নৌকোতে তুলল। চেম্পনকুঞ্জ এর পর আর হালে বসল না।

সেদিন চেম্পনকুঞ্জ মাছ বিক্রী নিয়ে দর কষাকষি করল না। যে দর মেছোরা চাইল তাইতেই মাছ দিয়ে দিল। ক্লান্ত শ্রান্তভাবে সে বাড়ি ফিরল। তার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু খুইয়ে সে বাড়ি ফিরছে।

চেম্পনকুঞ্জ তার সেই হিসেবী মন হারিয়ে ফেলেছে। আগে টাকা রোজগারের জন্য কত মতলব কত ফন্দিফিকির সে আঁটত এখন সবকিছুতে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে।

বাবার জন্য ভাত আর পছন্দমত তরকারী রেঁধে পঞ্চমী বসে ছিল। ভেতর থেকে ও একটা ক্লান্ত আওয়াজ শুনতে পেল—'খুকী ভাত বাড়,—আমি আসছি।'

পঞ্চমী ভাত বেড়ে দিল। চেম্পনকুঞ্জ অল্প কটা ভাত ফেলে-ছড়িয়ে খেল, মুখে স্বাদ নেই। খানিকটা খেয়ে উঠে পড়ার পর পঞ্চমী ভয় পেয়ে গিয়ে মাকে বলল, 'মা, বাবা আজ ভাত খায়নি ভালো করে।'

হাতমুখ ধুয়ে চেম্পনকুঞ্জ সেদিন চাকীর কাছে এসে বসল। চাকী চেম্পনকুঞ্জকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। চেম্পনকুঞ্জও তার দিকে তাকিয়েছিল, দুজনের চোখই জলে ভরে এল। জীবনে এই প্রথম চেম্পনকুঞ্জের চোখে জল দেখা গেল। চাকী বলল, 'কি আর করবে, সবই কপালের লেখন।'

চেম্পনকুঞ্জ তক্ষুনি তার চোখের জল আটকে ফেলল। এক ফোঁটা জলও ফেলতে দিল না, তখনও পর্যন্ত সে শক্তি তার ছিল। তারপর সে জিজ্ঞেস করল—

'চাকী, তোর কি উঠে বসার ক্ষ্যামতা একেবারেই নেই ?'

'চেষ্টাতো করছি—পারছি না।'

চেম্পনকুঞ্জ একটুখানি চুপ করে থেকে বলল—'এখন আমি কি করি চাকী ?'

চেম্পনকুঞ্জের জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই চাকীর উপদেশে, চাকীর নির্দেশে কেটেছে। চাকীহীন জীবন ওর ভগ্ন অসম্পূর্ণ। চাকী ছাড়া একা একা কিছু করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যৎ জীবনেও ও কি করবে না করবে তা চাকীকে ছাড়া কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে ?

চেম্পনকুঞ্জ চাকীর খাটের ওপর বসল। চাকী এখন পরিষ্কার দেখতে পেল যে চেম্পনকুঞ্জের সেই শক্তি, সেই উৎসাহ সেই তেজের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। চেম্পনকুঞ্জ ওর সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার কথা বলল।

'আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল চাকী।'

সমুদ্রে যে চেম্পনকুঞ্জের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে চাকী তা কল্পনাও করতে পারেনি কিন্তু যদি এমন ব্যাপার একবার ঘটে থাকে তাহলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে কতক্ষণ।

চেম্পনকুঞ্জ আবার বলল, 'আমি কি করব চাকী ?'

একান্ত অসহায়ের মতো চেম্পনকুঞ্জ এই প্রশ্ন করল। কার কাছেই বা করবে ? উত্তর দেবার অধিকার আর কারই বা আছে ? চাকী ওর জীবনের এক অবিভক্ত অংশ ছিল, একদিন তার জীবনের মধ্যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল চাকী। যেই ও শয্যা নিল অমনি জীবনের সব শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। ওর সব শক্তিও আজ শেষ হয়ে গেছে। এখন এই খাটে মাথা নিচু করে যে বসে আছে, সে আগেকার সেই চেম্পনকুঞ্জ নয়, এ হচ্ছে জীবনযুদ্ধে পরাজিত শ্রান্ত ক্লান্ত অসহায় মানুষ।

চাকী চেম্পনকুঞ্জের হাতদুটো ওর বুকের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করল—

'আমি মরে গেলে তুমি কি করবে ?'

চেম্পনকুঞ্জ কথাটা শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

'তুই যদি অমন করে বলিস তাহলে আমি কি করব।'

চাকী আরও জোরে চেম্পনকুঞ্জের হাতটা চেপে ধরল। ও যখন চেম্পনকুঞ্জের হাতটা ওর বুকে চেপে ধরেছিল তখন তার ধকধকানি শব্দে চেম্পনকুঞ্জের হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। চাকী কিছুক্ষণ চেম্পনকুঞ্জের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর তার মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে কতকগুলো কথা বেরিয়ে এল :

'তুমি একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করো।'

হ্যাঁ চাকীই এই কথাগুলো বলেছে! তারপর একটা ভীষণ কাঁপুনি চাকীর সারা শরীরটাকে যেন সজোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। ওর বুকের ধক্‌ধক্‌ শব্দও কমে আসতে লাগল।

চাকী চেম্পনকুঞ্জের মুখের দিকে তাকিয়েই আধবোজা চোখে শুয়েছিল। চেম্পনকুঞ্জ ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কি বললি? একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করতে?'

এ কথার কোন উত্তর পেল না ও।

চাকী বেশ ভালভাবেই জানতো যে সব মানুষই জীবনে এমন একজনকে চায় যে তার সুখেদুঃখে সমান অংশ গ্রহণ করবে। তাই ও সেই পথের নির্দেশই চেম্পনকুঞ্জকে দিয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত এরকম একটা ধারণা চেম্পনকুঞ্জের মনে উদয়ই হয়নি।

'চাকী, ও চাকী তুই কথা বলছিস না কেন? চাকীরে, একবার একটা কথা বল্‌।'

চাকীর চোখের সামনে কি যেন একটা ছায়া এসে ওর চোখ দুটোকে ঢেকে দিল। চেম্পনকুঞ্জ তাই দেখে ভয় পেয়ে ওকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডাকতে লাগল—

'চাকী, ও চাকী—চাকীরে।'

কোনও সাড়া নেই।

'চাকী—চাকীরে সত্যিই কি তুই চলে গেলি—' বলে বুকফাটা চীৎকার করে চেম্পনকুঞ্জ চাকীর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তখনও চেম্পনকুঞ্জের হাত চাকীর হাতের মুঠোয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

চাকী মরার আগে পঞ্চমীর দেখাশোনার ভার নাল্লপেন্নর হাতে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতে কি মায়ের শোক ভোলা যায়? পঞ্চমী তাই 'ওগো মাগো, আমার কেউ নেই গো' বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছিল। নাল্লপেন্ন বেচারী ওকে অনেক মিষ্টি কথা বলে ভুলোতে চেষ্টা করছিল কিন্তু পঞ্চমীর কান্না তাতে থামেনি। 'ওমা তুমি কোথায় গেলে' বলে কেঁদে কেঁদে ও সারা হচ্ছিল।

চাকীর মৃতদেহ তখনও নিয়ে যাওয়া হয়নি। আচ্চকুঞ্জ এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব চেম্পনকুঞ্জকে ধরাধরি করে চাকীর কাছ থেকে সরাল। এখন কাজ অনেক পড়ে আছে শুধু কি কান্নাকাটি করলেই চলবে। মোড়লকে খবর দেওয়া হল। মোড়ল এসে উপস্থিত হল। পাড়াপড়শীরা অনেকে বলাবলি করছিল যে এই সময় অন্ততঃ কারুতাম্মাকে একবার নিয়ে আসা উচিত। কে যেন এর মধ্যে বললে:

'মেয়েকে আনতে লোক পাঠাবে না?'

চেম্পনকুঞ্জের কানে সেই প্রশ্ন গেল। ও এত দুঃখের মধ্যেও চীৎকার করে উঠল, 'না না না, কেউ যাবে না—ঐ হারামজাদীই তার মাকে মেরে ফেলেছে। এ আমি কোন দিনও ভুলব না—ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। হারাম-জাদীর মুখ আমি দেখতে চাই না।'

লোকজন যারা এসেছিল তারা একথা শুনে যেন সব থ হয়ে গেল। কিন্তু তবু চেম্পনকুঞ্জের এমনিভাবে বলাটা যে অন্যায় কিছু হয়নি তা অনেকেই স্বীকার করল। মেয়েটা ঠ্যাকার দেখিয়ে চলে গিয়েছিল, মায়ের কথা একটুও ভাবেনি। সকলে তাই মোড়ল কি বলে তাই শোনার জন্য হাঁ করে ছিল।

মোড়ল বলল, 'মাকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে মেয়েটা চলে গিয়েছিল। মার ওপর একটুও টান নেই বলে সে এমনি ভাবে চলে যেতে পারল। গেছে যাক্। যে মেয়ে এমনিভাবে মাকে ফেলে চলে যেতে পারে তার জন্যে আর লোক পাঠাতে হবে না।'

তখন সকলেরই সেই বিয়ের দিনের কথা আর একবার মনে পড়ল। সত্যিই তো কী পাষাণ মেয়ে! মাকে অমনিভাবে পড়ে থাকতে দেখে একটুও দয়া

হল না গা। গটগটিয়ে চলে গেল।

পঞ্চমী কিন্তু বারবার ওর দিদির নাম নিয়ে কাঁদছিল। দিদি ছাড়া আর কেই বা এখন ওর আপন বলতে আছে। কিন্তু পঞ্চমীর কান্নায় কান দেবার কেউ ছিল না। সকলে তখন মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত। তারপর মৃতদেহ সৎকারের সব আয়োজন শেষ হল।

পারীকুট্টিও এসেছিল কিন্তু অন্য জাত বলে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কারুতাম্মা একবার এসে তার মাকে শেষবারের মতো দেখতে পেল না। ওকে ছাড়াই মৃতদেহ কবর* দেবার সব ব্যবস্থা হল দেখে পারীকুট্টির খুব খারাপ লাগছিল কিন্তু এ নিয়ে অযাচিতভাবে কিছু বলাটা তার পক্ষে ঠিক নয়; তাই সে চুপ করে রইল।

পারীকুট্টি ভাবল কারুতাম্মা কত দুঃখ পাবে। যদি ওর সঙ্গে কোনদিন দেখা হয় তো কারুতাম্মা ওকে বলবে:

'ছোটমিয়া, তুমি তো মার মরার খবর পেয়েছিলে, তুমিও তো একবার জানাতে পারতে।' শুধু তাই নয়—মৃত চাকীই কি তাকে ক্ষমা করবে। চাকী ওকে বলেছে যে সে কারুতাম্মার ভাই। ভাই হয়ে কি বোনের ওপর এতটুকু কর্তব্য করা তার উচিত নয়?

ভাবতে ভাবতে পারীকুট্টি স্থির করল এ বিষয়ে সত্যিই তার কিছু একটা করার আছে। কি যে করার আছে তা ঠিক জানা না থাকলেও এটুকু ও জানে যে ও কারুতাম্মার ভাই। বোনের প্রতি ভাইএর কর্তব্য সে করবে।

তাই সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে এই কথাই সে সারাক্ষণ ভাবতে লাগল। কারুতাম্মাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। সে রাতে চিন্তায় ওর ঘুম এল না। গভীর রাতে ও বিছানায় উঠে বসল তারপর কিছুক্ষণ পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে ও হাঁটতে শুরু করল সমুদ্রের তীর ধরে ধরে। কোনও দিকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুধু ঢেউএর গর্জন আর হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাওয়ায় হাওয়ায় কি সব যেন কথা ভেসে আসছে…যেন ওর সঙ্গে কি কথা বলতে চায়; জিজ্ঞেস করছে—'কোথায় যাচ্ছ? ত্রিকুন্নপুরায়? কেন? কারুতাম্মাকে তার মার খবর দিতে? তা তুমি কেন খবর দেবে—আর কেউ নেই। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তুমি কেন খবর দিতে

* কেরালায় গরীব হিন্দুদের মধ্যে, বিশেষত হরিজনদের মধ্যে, মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় কেননা তাতে খরচ কম।

এলে তাহলে কি জবাব দেবে ? কারুতাম্মার সঙ্গে দেখা হলে তাকে কি বলবে ?'

এই যে এতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন সে হল তারা যেন বারবার তাকে বাধা দিচ্ছে, থামিয়ে দিচ্ছে, এগোতে দিচ্ছে না। কিন্তু তবু ও এগিয়ে চলল, হ্যাঁ এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার শক্তি তার আছে। সে যে কারুতাম্মার ভাই। কারুতাম্মার মা যে তাকে তার ভাই হতে বলেছে। কিন্তু কারুতাম্মা কি তাকে তার ভাই বলে মেনে নিতে পারবে ? কারুতাম্মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সেই দর্শনের ফলাফল যে কি হবে সে সম্বন্ধে কি পারীকুট্টি একবারও ভেবেছে ?

হাঁটতে হাঁটতে যখন প্রায় সবে একটু একটু ভোর হয়ে এসেছে, আকাশে শুকতারা তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে, পারীকুট্টি ত্রিকুন্নপুরার সমুদ্রতীরে এসে পৌছোল। নৌকোয় উঠছিল একজন জেলে তাকে পালানির বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করল। এই জেলেটা মরসুমের সময় অনেকবার নীরকুন্নাথে মাছ ধরতে গিয়েছিল। ও পারীকুট্টিকে দেখেই চিনতে পারল। জিজ্ঞেস করল :

'আরে ছোটমিয়া যে ! পালানির খোঁজে কেন ?' ওর প্রশ্ন শুনে পারীকুট্টি একটু থতমত খেয়ে গেল কিন্তু বলল, 'পালানির জেলেনীর মা মারা গেছে।'

কোচ্চুনাথন নামে সেই জেলেটা খবরটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেল। সেও চেম্পনকুঞ্জ আর চাকীকে চেনে, চাকীর মৃত্যুর খবর শুনে কিছুক্ষণ ও চাকীর গুণগান গাইল কিন্তু তারপর ও একটা বেশ জটিল প্রশ্ন করল।

'তা চাকী জেলেনীর মরার খবরটা তুমি দিতে এলে কেন ? ওখানে কি আর কোন লোক ছিল না ?'

পারীকুট্টি জানতো যে এই প্রশ্ন উঠবে এবং এর একটা জবাবও সে তৈরী করে রেখেছিল কিন্তু সে উত্তরটা ছিল কারুতাম্মার জন্য। অন্য কেউ যে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে পারীকুট্টি তা ভাবেনি। যাহোক্ ও জবাব দিল :

'চেম্পনকুঞ্জের বাড়ি থেকে ঠিক করেছে যে পালানি আর তার জেলেনীকে কিছু খবর দেবে না তাই আমি এসেছি।'

তারপর চাকীর মরার পর সেখানে কারুতাম্মাকে নিয়ে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা পারীকুট্টি সব বলল। তবুও কোচ্চুনাথনের প্রশ্ন শেষ হল না। সে বলল, 'তা এই মাঝরাতে আসার কারণটা কি ?'

তার উত্তরে পারীকুট্টি বলতে পারত যে সে কারুতাম্মার ভাই। তার কাছে সে যখন খুশি আসতে পারে কিন্তু একজন মুসলমান কি করে কারুতাম্মার ভাই হয় সেই প্রশ্নটাই সকলের মনে আগে জাগবে। তার উত্তর দিতে গেলে তার আগের

কথাগুলোও তাহলে বলতে হয়। এক মুসলমানের ছেলে আর এক হিন্দু জেলেনী ভাইবোন কি করে হয়? কারুতাম্মার মার তাকেই বা কারুতাম্মার ভাই বলে অঙ্গীকার করানোর কারণটা কি? এসব প্রশ্নের জবাব এর কাছে কি দেবে। পারীকুট্টি ঠিকমত কোনও উত্তর দিতে না পেরে খুবই মুশকিলে পড়ল। শেষে বলল, 'আরে কি জান ভাই, ওদের ওই রকম খারাপ ব্যবহার দেখে, মার মরার খবর মেয়েটাকে না জানানোর জন্যে মনে মনে খুব কষ্ট হল, তাই না এসে পারলাম না। হাজার হোক্ মেয়েটাকে ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছি।'

কোচ্চুনাথন ওর কথায় বিশ্বাস করল কি না কে জানে। যাহোক্ ও পালানির বাড়ি দেখিয়ে দিল।

কি ভাবে কারুতাম্মার কাছে ওব মৃত্যুর খবরটা বলবে পারীকুট্টি ভাবতে লাগল। সোজাসুজি বলবে না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবে?

জেলেদের নৌকোগুলো তখন সব মাছ ধরতে সমুদ্রে নেমে গেছে। পারীকুট্টি হাঁটতে হাঁটতে পালানির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট্ট বাড়িটার চারিদিকে নিস্তব্ধতা। পালানির বাড়ির সামনে এসে পারীকুট্টির গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোচ্ছে না! বেশ কিছুক্ষণ ও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল তারপর ওর অজান্তে মুখ দিয়ে 'কারুতাম্মা' শব্দটা বেরিয়ে এল। কেউ কিন্তু ওর ডাকে সাড়া দিল না। ও তখন আর একবার ডাক দিল, 'কারুতাম্মা।'

'কে' বলে ভেতর থেকে আওয়াজ এল। কারুতাম্মার গলা পারীকুট্টি বুঝতে পারল।

'কারুতাম্মা, আমি।'

'আমি কে?'

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'না—কে তুমি?'

'অমি···আমি পারীকুট্টি।'

কোনও উত্তর নেই। চারিদিক নিঃশব্দ, নিস্তব্ধতা যেন ভারী হয়ে বিছিয়ে রয়েছে।

'কারুতাম্মা, আমি তোমাকে একটা খুব দরকারী খবর দিতে এসেছি।'

তার উত্তরে ভেতর থেকে কান্নাভাঙা গলায় আওয়াজ এল, 'ওখান থেকে চলে এসেছি, তাও তুমি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না।' তারপর এক মিনিট থেমে আবার বলল, 'না, না আমি দরজা খুলব না, কিছুতেই খুলব

না, তোমাকে আমি দেখতে চাই না—' বলে ও কাঁদতে লাগল।

কারুতাম্মার কথাগুলো পারীকুট্টির বুকে গিয়ে বিঁধল।

হ্যাঁ কারুতাম্মার কথাই ঠিক। কারুতাম্মা তার কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই এখানে চলে এসেছে। এখানে এসেও সে তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না! পারীকুট্টি এক মুহূর্তের জন্যে ভাবল কিছু না বলেই চলে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবল, যখন এসেইছি তখন খবরটা দিয়ে চলে যাই। কিন্তু কেমন ভাবে এই খবরটা দেবে ও? এতখানি দুঃখের খবর বাইরে থেকেই বা চেঁচিয়ে বলবে কি করে? তাই ও দরজা খোলার প্রতীক্ষায় রইল। তারপর আবার বলল, 'কারুতাম্মা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

ভয় উত্তেজনা আর আবেগে বিহ্বল হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কারুতাম্মা বলল, 'চিনতে পেরেছি।'

'তাহলে বাইরে আসছ না কেন?'

কোনও উত্তর নেই।

পারীকুট্টি বলল, 'আমি সেই আগের পারীকুট্টিই আছি কারুতাম্মা। আমি জানি তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

তখন একান্ত অসহায়ভাবে কারুতাম্মা বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না, কিছুতেই পারব না।'

পারীকুট্টির তখন কেমন যেন একটু সাহস হল, 'অমন কথা বল না কারুতাম্মা। আমরা আবার দুজন দুজনের সঙ্গে দেখা করব, দুজন দুজনের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাব, কথা বলব, গল্প করব।'

'ও মা, না না এসব আমি কিছু চাই না। মানুষটা সমুদ্দুরে গেছে—ঝড়-তুফানে ভরা সমুদ্দুর।'

কিছুক্ষণের জন্যে দুজনেই চুপচাপ।

পারীকুট্টি ডাকল, 'কারুতাম্মা।'

কারুতাম্মা এবার আর সাড়া না দিয়ে পারল না।

'কি?'

'আমি তোমার ভাই কারুতাম্মা।'

'ভাই?'

তাদের মধ্যে যে গভীর বন্ধন ছিল সে বন্ধন ছিন্ন না হয়ে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করল। কারুতাম্মার মন পারীকুট্টির কথা শুনে একটা গভীর ভরসা লাভ করল। পারীকুট্টি বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমার ভাই আর তুমি আমার

বোন। তোমার তো নিজের কোন ভাই নেই, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি আমাকে আজ থেকে ভাই বলে ডাকবে। তোমার মা আমাকে বলেছে যে তোমাকে বোনের মতো দেখতে।'

'আমার মা?'

'হ্যাঁ তোমার মা। দরজাটা একবার খোল—আমি সব বলছি।'

কারুতাম্মা ল্যাম্পটা জেলে দরজা খুলল।

কেমনভাবে এই দুঃসংবাদটা ওকে দেবে? ভাবতে ভাবতে ওর মুখ থেকে হঠাৎ কথাটা খুব রুক্ষ হয়ে বেরিয়ে এল, 'কারুতাম্মা, তোমার মা আর নেই।'

কথাটা শুনে কারুতাম্মা ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করে উঠল। পাড়া প্রতি-বেশীরা যখন ওর চীৎকার শুনে ছুটে এল তার আগেই পারীকুট্টি সেখান থেকে চলে গেছে।

অন্য সব জেলেনীরা কারুতাম্মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল কিন্তু তারা কেউ ওর মার মরার খবরটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কে যে এই খবরটা ওকে দিয়েছে সেটা কারুতাম্মা কাউকে বলল না। পাড়াপড়শীরা তাই 'স্বপ্ন দেখে এমনি ভাবে কাঁদছে' বলে বলাবলি করতে লাগল।

আর একটু সকাল হলে পর যখন চোখের জল কমে এসেছে তখন কারুতাম্মার মনে সন্দেহ উঁকি মারল। ও নিজেই এই খবর অবিশ্বাস করতে শুরু করল। হয়তো পারীকুট্টি তাকে দেখতে আসার জন্য এই নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করেছে। পারীকুট্টি এখন হতাশ প্রেমিক। হয়তো ওর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কত কীই হতে পারে। মা যদি মরে যায় তাহলে বাড়ি থেকে কেউ একজনও আসবে না খবর দিতে? এটা কি সম্ভব?

তারপর ওর সংসারের কাজকর্মের কথা মনে পড়ল। মানুষটা সমুদ্রে গেছে। খেতে ফিরবে—রান্নাবান্না করতে হবে। সংসারের আরও অনেক কাজ পড়ে আছে। কারুতাম্মা উঠে পড়ল। ঘরদোর ঝাঁটপাট দিয়ে ভাত আর তরকারী রান্না করল। ঘরের কাজ করতে করতে প্রতিমুহূর্তে সে বাপের বাড়ি থেকে লোক আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সেদিন একটু সকাল সকালই পালানি বাড়ি এল। পালানিকে দেখে কারুতাম্মা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, 'আমার মা আর নেই।'

কারুতাম্মার কথা পালানি শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। কারুতাম্মা দেখতে পেল পালানির মুখ ভয়ানক গম্ভীর। তবুও কাঁদতে লাগল আর বলতে

লাগল, 'আমার মাকে আমিই খুন করেছি গো।'

একটুও দয়া আর সহানুভূতি না দেখিয়ে পালানি জিজ্ঞেস করল, 'কে এসে খবর দিল?'

কারুতাম্মা চট্ করে একথার উত্তর দিতে পারল না। পালানি তখন এক-নজরে কারুতাম্মাকে দেখছিল। কারুতাম্মা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সেই ছোট মিয়া।'

'খবর দিয়ে লোকটা গেল কোথায়?'

'খবরটা বলে কোথায় চলে গেল, দেখতে পাইনি।'

কারুতাম্মা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ওর স্বামী এত গম্ভীর কেন। সেকি পারীকুট্টি এসেছিল বলে না ওর বাপের বাড়ি থেকে এসে কেউ খবর দেয়নি বলে।

পালানি জিজ্ঞেস করল, 'ঐ মুসলমান ছোঁড়াটাকে দিয়ে তোমার বাবা খবর পাঠিয়েছে?'

এর উত্তর কারুতাম্মার জানা ছিল না।

পালানি আবার জিজ্ঞেস করল, 'মার মরার খবরটা দিতে তোমাদের গাঁয়ে কোন জেলের ছেলে ছিল না?'

কি করে যে কারুতাম্মা এ প্রশ্নের জবাব দেবে তাও জানে না। শুধু তাই নয়, সবকিছু খোলাখুলি বলার এখন কি সময়? মানুষটার মনে কিছু একটা সন্দেহ ঢুকেছে। কিন্তু কি সে সন্দেহ ও তা জানে না। তাই ও স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে শুধুমাত্র বলল, 'চল আমরা একবার যাই।'

'কোথায়?'

'নীরকুন্নাথ।'

পালানি ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসল। কারুতাম্মা তখন খুবই কাতরভাবে বলল, 'আমার নিজের মা মরে গেছে আর আমাকে তুমি যেতে দেবে না।'

এতেও পালানি বিচলিত হল না।

'মা তোমাকে তার নিজের ছেলের মতো ভালবেসেছিল, মা কোনও দোষ করেনি। যদি দোষ কিছু থেকে থাকে তো আমার দোষ। শুধু তাই নয়। তুমি জান না সেদিন মা আমাকে জোর করে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলছি বিয়ের দিনই আমার চলে আসার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু আমার মা আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। মা তোমাকেও কত ভালবাসত। চল না গো আমরা একবার নীরকুন্নাথ থেকে ঘুরে আসি।'

এত বলেও যখন কিছু হল না তখন কারুতাম্মা পালানির পাদুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল কিন্তু পালানি ঠিক পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল।

পালানি জানে মা কি বস্তু—চাকীই তাকে জানিয়েছে। মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেয়েছিল যে নারীর কাছ থেকে সে আজ মৃত। পালানিরও কি মন চাইছে না একবার যেতে। হঠাৎ পালানি বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'আমাকে সবাই মিলে তীরে নামিয়ে দিল।'

'নীরকুন্নাথ যাওয়ার জন্যে তো?'

'কি বাজে বকছ।'

'তবে?'

পালানি একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'সেই মুসলমান ছোঁড়াটার সঙ্গে কোচ্চুনাথনের দেখা হয়েছে। আর সেই পাজী পাপুটা সারা গাঁয়ে বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই…তাই…' পালানি আর বলতে পারল না—গলায় যেন কি আটকে গেছে। তারপর কিছুক্ষণ পরে গলাটা ঝেড়ে বলল, 'ওরা বাড়িতে বৌ ছেলেপুলে রেখে বেরিয়েছে, আমাকে তাই তীরে নাবিয়ে দিয়ে চলে গেল।'

এইবার কারুতাম্মা সব বুঝতে পারল। তাব এতবড দুঃখের সময় লোকে কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াচ্ছে। কারুতাম্মাব আর কিছুই বলার নেই শুধু একটি প্রশ্ন ছাড়া। ও ওর স্বামীকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?'

করে কি না করে পালানি কিছুই বলল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'খবর দিয়েই ছোঁড়াটা কোথায় ডুব মারল?'

'জানি না, আমি দেখিনি।'

'ছোঁড়াটাকে এখানে ঢুকতে দিলে কেন?'

এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। সবকিছু বলার সময় কিছু না লুকিয়ে সমস্ত কিছু পালানিকে এখন খুলে বলবে। কিন্তু আশ্চর্য! একটা কথা বলাব ভাষা সে খুঁজে পেল না। পালানি ওকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা এসে কি বলল?'

'মা মারা গেছে।'

কারুতাম্মা আর পালানির মধ্যে এইভাবে কথা কাটাকাটি চলছে আর ওদিকে পারীকুট্টির আসার খবর সারা গাঁয়ে রটে গেছে। এখন এই ছোট্ট পরিবারটির ভাগ্যে কি আছে কে জানে। জেলেরা সব বলাবলি শুরু করেছে—

মা মরেছে সে খবর ঠিকই — চাকী যে বিছানা নিয়েছিল তা সকলেই জানে। ও যে কোনদিন ভাল হয়ে উঠে বসবে সে সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ ছিল। সবই ঠিক—কিন্তু মুসলমান ছোঁড়াটা এ খবর দিতে এল কেন ?

কোচ্চুনাথন বলল, 'লোকটার রকমসকম দেখে কেমন যেন লাগল বাপু।'

পাপু তাতে রস চড়িয়ে বলল, 'আরে আমার সব জানা আছে। নীরকুন্নাথের সমুদ্রের ধারে ঐ মেয়েটা আর ঐ মুসলমান ছোঁড়াটা সব সময়েই একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত। আমি নিজের চোখে দেখেছি। শুধু তাই নয়, রাতে ঐ ছোঁড়াটা গান গাইত আর তখন মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে ওর কাছে যেত। আরে সেই জন্যেই তো আমি বিয়ের দিন অত ঝগড়াঝাঁটি করলাম।'

পাপু যেন একটা যুদ্ধ জয় করেছে এমনি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সকলেই তখন পালানির জন্যে খুব আহা উহু করতে লাগল। বেচারা পালানি। সরল ভালোমানুষ—তার ভাগ্যে জুটল কিনা এইরকম নষ্টা মেয়ে।

আর একজন জেলে তখন প্রশ্ন করল, 'এখন তাহলে পালানিকে নৌকোয় তোলাটা কি ঠিক হবে ?'

এই প্রশ্নের অর্থ কি সে সকলেই জানে। পালানির বউ-এর চরিত্রের ঠিক নেই। একটা নষ্টা মেয়েকে নিয়ে ঘর করছে পালানি, তাকে নৌকোয় উঠতে দেওয়া মানে যেচে বিপদ ডেকে আনা। সমুদ্রে কি না দুর্ঘটনা ঘটতে পারে !

ভেলায়ুধন কিন্তু পালানির পক্ষ নিল। ও এদের কথাবার্তা শুনে রেগে গিয়ে বলল, 'ওর জেলেনী যে নষ্টা মেয়ে তোমাদের তা কে বলল ?'

আন্টিকুঞ্জও ভেলায়ুধনের কথায় সায় দিল। সে কুমারুকে ধরল, 'আরে তুই কি পরিষ্কার করে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারিস ? আর খুব যে পালানির নামে লাগাচ্ছিস, বলি কার বাড়ি একেবারে খাঁটি তা বলতে পারিস ?'

নাঃ, অতখানি এগিয়ে যাওয়ার সাহস কারুরই নেই। জোর গলায় তারা কেউই বলতে পারে না যে তাদের বাড়ি শুদ্ধ আর পালানির বাড়িই খারাপ। কিন্তু না হয় ধরাই গেল পালানির জেলেনীর স্বভাব চরিত্তির ভাল। আজ পর্যন্ত কোন বিপদ তাদের ঘটেনি, তবে একটা সন্দেহ তাদের মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। সেদিন পালানি নৌকোটাকে কেমনভাবে কতদূর নিয়ে গিয়েছিল। এমনি ভাবে সেদিন ও নৌকো চালিয়েছিল তাতে ওর যে মতিভ্রম হয়েছিল তাতো স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। আর পাপু যে কেলেঙ্কারি রটিয়ে বেড়াচ্ছে সেটাও তাদের মনে খচখচ করছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মেয়েটা যে ভাল এমন অভিমতও কেউ কেউ প্রকাশ করল।

কুমারু ছাড়া আর কারুরই পালানির বাড়ির সম্বন্ধে বিশেষ খারাপ কিছু বলার ছিল না। কিন্তু কুমারুর আর একটা প্রশ্ন ছিল সে প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট করে দেবার ক্ষমতাও কারুর ছিল না।

'জেলেরা কি তাদের বাড়িতে কেউ মরলে খবরটা একটা মুসলমানের হাত দিয়ে পাঠায়, তাও আবার মাঝ রাতে ?'

কুমারুর প্রশ্নে আবার সকলের সন্দেহ বেড়ে গেল।

এদিকে পালানির বাড়িতেও শান্তি নেই। কারুতাম্মা বারবার পালানিকে অনুরোধ করতে লাগল যে একবার অন্তত ওকে ওর বাপের বাড়ি যেতে দেওয়া হোক। মার মরা দেহটা একবার সে অন্ততঃ দেখতে চায়। মার মৃত আত্মার কাছে শেষবারের মত ক্ষমা চায়।

'আমি তোমার বউ বলে এ কথা বলছি না। একজন দুঃখিনীর দুঃখের কথা ভেবেও তুমি একবার আমাকে যেতে দাও।' কিন্তু পালানি একটা কথাও বলল না।

কারুতাম্মা তখন খুবই দুঃখের সঙ্গে বলল, 'সত্যি করে বলতো তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছ না ?'

'তোমাকে বিশ্বাস করছি বউ। কিন্তু কতকগুলো কথা আমার তোমাকে জিজ্ঞেস করার আছে।'

'তুমি যা জিজ্ঞেস করবে তার সব উত্তর আমি দেব, যা বলার তা সব খোলা-খুলি বলব। কিছুই লুকিয়ে রাখব না।'

বলল বটে কিন্তু সে সব কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা তার তখন ছিল না। তাই বলতে চেষ্টা করেও সে বলতে পারল না। পালানির কিন্তু ওর মনের অবস্থা বোঝার সাধ্য ছিল না। কারুতাম্মার মা বলে নয়, মা মরার গুরুত্ব যে কতখানি তা হয়তো পালানির বোঝার সাধ্যি নেই।

পালানি তার দুঃখ বুঝল না দেখে কারুতাম্মা আরও বেশি করে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বেশ তুমি না যাও না যাবে, আমাকে যেতে দাও। আমি আজই গিয়ে আজই ফিরে আসব।'

কিন্তু পালানি তারও কোন জবাব দিল না। কারুতাম্মা একবার ভাবল পালানির অনুমতি না নিয়ে গেলে কেমন হয়। কিন্তু তার ফল হবে এই যে আর সে কোনদিনও স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে পারবে না।

নাঃ, এতখানির জন্যে সে প্রস্তুত নয়। ও জেলেনী হয়ে জন্মেছে, জেলেনী হয়েই মরবে। ওর মরা মায়ের এইটাই ছিল সবচেয়ে বড় সাধ। সে জেলের

মেয়ে, স্বামীও তার জেলে, যদি দরকার হয় স্বামীর পা জড়িয়ে ধরেই ও মরবে। যে বাপ তার মরা মায়ের খবর কাউকে দিয়ে মেয়ের কাছে পাঠাতে পারল না সেই বাপ যে তাকে মেনে নেবে সে সম্বন্ধে কোনও বড় আশা তার নেই। সে বাপের কথা না শুনে চিরকালের জন্য আর এক পুরুষের সঙ্গে চলে এসেছে। সেই পুরুষের সঙ্গে এই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরেই সে আমরণ কাটিয়ে দেবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কারুতাম্মার পঞ্চমীর কথা মনে পড়ল। পঞ্চমী হয়তো এখন 'দিদি' 'দিদি' বলে চেঁচিয়ে কাঁদছে। মার মৃতদেহ যখন কবর দেওয়া হবে, তখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই। এরপর বাড়িতে ও একা···একেবারেই একা পড়ে যাবে।

পালানি চুপ করে দূরে একদিকে তাকিয়ে বসেছিল। ওর মনের শান্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে। এতদিন দুঃখকষ্ট কিছুই তার গায়ে লাগেনি। যেমনি ভাবে পেরেছে জীবন কাটিয়েছে, যেখানে থেকেছে সেই তার স্বর্গলোক হয়েছে। কিন্তু আজ বিয়ের পর সুন্দরী বউ পাওয়ার পরও মনে তার একটুও শান্তি নেই। কতরকম কুৎসা কত কেলেঙ্কারির কথা তাকে শুনতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে চোখের জল মুছে কারুতাম্মা ওর কাছে গিয়ে বলল, 'ভাত খাবে না ?'

'আমার ক্ষিদে নেই।'

'কেন ?'

তার উত্তরে পালানি জিজ্ঞেস করল, 'ঐ মুসলমানটা কেন এসেছিল ?'

কারুতাম্মা এবার সত্যি কথাই বলল, 'কেন এসেছিল যদি জিজ্ঞেস কর, তাহলে বলি আমার সর্বনাশ করতেই সে এসেছিল। নইলে আর আসবে কেন বল ?'

এতক্ষণ যে সত্যের সম্মুখীন হতে ও সাহস পাচ্ছিল না এখন সেই সত্যের সম্মুখীন সে হল। এর জন্যে যতটা সাহসের দরকার তা তার আছে। পালানিরও এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সাহস আছে।

'লোকটা তোমার কে, কারুতাম্মা ?'

এ কথার পূর্ণ অর্থ বুঝতে পেরে সমস্ত কথা খুলে বলার জন্য তৈরী হয়ে কারুতাম্মা বসল। কিন্তু কি রকম ভাবে আরম্ভ করবে তাই নিয়ে মনে কতরকম সংশয় রয়েছে। নাঃ, যে করেই হোক আরম্ভ করবে, কেননা যদি সবই বলবে তবে কোনখান থেকে আরম্ভ করবে সে কথা আর ভাবার দরকার কি ?

ও শুরু করল—

'আমরা ছোট্টবেলা থেকে সমুদ্দুরের ধারে একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে খেলা করতুম।'

কোন রকম চাঞ্চল্য কোন রকম উত্তেজনা না দেখিয়ে পালানি শুনে গেল। যে রকম নিশ্চল হয়ে বসে পালানি ওর কথা শুনে যাচ্ছিল তা দেখে কারুতাম্মার ভয় লেগে গেল। কিছুক্ষণ বলার পর ও জিজ্ঞেস করল—

'আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে তো?'

'বিশ্বাস হচ্ছে,' পালানি বলল।

এক মেয়ে তার বিয়ের আগেকার প্রেমের কাহিনী তার স্বামীর কাছে বলে যাচ্ছে—তাতে অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। সে নিজে নিজেকেই কালো ছায়ায় এঁকে তার স্বামীর সামনে তুলে ধরছে। এতে অবিশ্বাসের কি আছে?

কারুতাম্মা কিন্তু সব বলল না—বলল না তার পারীকুট্টির কাছে টাকা চাওয়ার কথা। বলল না সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে পারীকুট্টির গান গাওয়ার কথা। বলল না জ্যোৎস্না রাতে পারীকুট্টির কাছে সেই শেষ বিদায় নেওয়ার কথা। এই কথাগুলো বাদ রেখে বাকি আর সব বলল। কিছু যে রেখে-ঢেকে রাখল তা কি তার স্বামী জানতে পারল? কে জানে!

সব শেষে বলল:

'আমার নিজের ভাই বলতে কেউ নেই। পারীকুট্টিই এখন আমার ভাই।'

কথাটা পালানির মনে লাগল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। সবকিছু শুনে পালানি জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে নীরকুন্নাথ থেকে তোমাকে বিদেয় করে রক্ষে পেয়েছে বলে যে কথা রটেছে তা সব সত্যি বল?'

তার উত্তরে কারুতাম্মার শুধু একটা কথাই বলার ছিল। চিরদিন এই গাঁয়ে তার স্বামীর জেলেনী হয়েই সে খাঁটি ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। এর বেশি আর কিই বা সে বলতে পারে? কি কথাই বা সে দিতে পারে?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কারুতাম্মা সমস্ত সত্যি কথাই খুলে বলল। স্বামীর কাছে সে কিছুই গোপন রাখল না। কারুতাম্মার সব কথা পালানি বিশ্বাস করল কিন্তু তবু মনে মনে সে একটা প্রচণ্ড ঘা খেল। ওর মনের সমস্ত আবেগ সমস্ত উচ্ছ্বাস এই আঘাতে একেবারে পাথর হয়ে গেল। পালানি চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল। পাপুর মুখোমুখি কিসের জোরে সে এখন তর্কাতর্কি করবে? কারুতাম্মার কথা শুনে ও বিশ্বাস করেছে যে কারুতাম্মা নষ্টা মেয়ে নয় কিন্তু পাপু যদি ওর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে—'তোর বউতো তাদের গাঁয়ের একটা খারাপ মেয়ে' তখন তার উচিত মতো জবাব কি ও দিতে পারবে! ও কারুতাম্মাকে তার বাপের কাছ থেকে বিয়ের দিনই জোর করে নিয়ে চলে এসেছে এখন ওকে তাড়িয়ে দেওয়াও যায় না। সেটা অধর্ম হবে। আজ যদি ও কারুতাম্মাকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে। নাঃ, অতখানি অন্যায় সে করতে পারবে না।

কারুতাম্মার প্রতিটি কথা ও বিশ্বাস করেছে। কারুতাম্মা ভুল করেছে। এমনি ভাবে ভালবাসা তার পক্ষে অন্যায় হয়েছে কিন্তু বারবার চোখের জলে ভেসে সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে পুরোনো কথা সব সে ভুলে যাবে। সে খাঁটি জেলেনী হয়ে স্বামীর সেবা করে তার বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। ওর চোখের জলে-ভেজা সেই শপথকে অবিশ্বাস করবে কি করে পালানি?

কিন্তু তবু কোথায় কি যেন একটা বাধা রয়ে গেল। ও কারুতাম্মাকে আর সেই আগের মতো চুমু খেতে পারছে না, প্রাণপণ শক্তিতে ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে টেনে নিতে পারছে না। ঠিক এমনি একটা দূরত্ব পরস্পরের মধ্যে অনুভব করছে কারুতাম্মাও। ও পালানিকে দু হাতে আঁকড়ে ধরল, মনের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় এই বাঁধন বুঝি আলগা হয়ে গেল। জোরে, আরও জোরে সে স্বামীকে চেপে ধরল। কিন্তু মনের মধ্যে অহর্নিশ ভয় জাগতে লাগল যে এক্ষুনি পালানি তার বাঁধন থেকে ছিটকে যাবে দূরে, বহুদূরে।

'আমার সব কথা শুনে তুমি কি আমাকে আর ভালবাসবে না'—এ প্রশ্ন কারুতাম্মা পালানির কাছে করতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে অধিকার যেন

সে হারিয়েছে। তার বদলে বারবার জিজ্ঞেস করছে, 'আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করছ না ?'

কারুতাম্মার কাছে সব কথা শুনে অবধি পালানির মনে শান্তি নেই। যে পালানি কোনও দিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেনি সেই পালানি এখন কারণে অকারণে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল। একদিন পাপু তাকে ঠেস দিয়ে অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিল। ঠিক এই কথাগুলোই সে কারুতাম্মার কাছে শুনেছে কিন্তু অন্য আর একজনের মুখে এই সব কথা পালানি সহ্য করতে পারল না। দুজনের মধ্যে একহাত হয়ে গেল। পাপু পালানির হাতে বেশ কয়েক ঘা খেল।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না—অনেক দূর পর্যন্ত গড়াল। পাপু ওদের গাঁযের এক বড পরিবারের ছেলে। ওর পরিবারের লোকও অনেক। কাজেই এই মারামারি শুধু পাপুতেই আটকে রইল না, ওর বাড়ির লোকেরা সব দল পাকিয়ে পালানিকে মারার জন্য তেড়ে এল, তবে গাঁয়ের লোকের মধ্যস্থতায় খুব বড একটা মারপিট হল না।

আর এদিকে কারুতাম্মার কোন ইচ্ছেই পূর্ণ হল না। তার সংসারের শ্রী ফিরিয়ে আনবে বলে কত কি ভেবে রেখেছিল তার একটাও কাজে পরিণত হল না। শুধু যে ভালভাবে মাছ উঠছে না তা নয় কাজে যাবার উৎসাহও পালানির নেই। রোজ পালানি কত করে ভাগ পাচ্ছে তা জিজ্ঞেস করার সাহস কারুতাম্মার নেই।

মান্নারশালার মেলায় বউকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেই শখ কোথায় গেল পালানির। বাড়িতে একটা মাত্র ঘর; একটা আলাদা রান্নাঘর করার আশা আর নেই। একটা শিলনোড়া কেনা হয়েছে বটে কিন্তু একটা সংসারে আরও কত কি চাই। নৌকো আর জালের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল, তার জন্যে অনেক টাকার দরকার। হতেও পারে নাও হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা চরমে এসে পৌচেছে। রোজকার খাবার চাল কেনার পয়সা নেই, কাপড়-চোপড সব ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার। একটা মুণ্ডু আর ব্লাউজ না হলে আর চলছে না। পালানির শুধু একটা লুঙ্গি মাত্র সম্বল। দিন যখন আর চলে না তখন একদিন কারুতাম্মা পালানিকে বলল, 'আমিও কাল থেকে পুবদিকে মাছ ফেরি করতে বেরোই না কেন ?'

পালানি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। এ নিয়ে কিছুই বিশেষ ভাবার নেই, তবুও ও চট্ করে উত্তর দিল না। মাছ ফিরি করে দুটো পয়সা রোজগার না

করলে সংসার আর চলছে না। ও যদি এই সময় দুটো পয়সা আনতে পারে তাহলে সংসারের কত উপকার হয়। অবশ্য পালানি রাজী হলেই তবে ও মাছ ফিরি করতে যাবে নইলে নয়। কারুতাম্মা অনেক করে বলার পর পালানি বলল, 'আচ্ছা তাহলে যাও।'

দু একদিনের মধ্যেই মাছ ফিরি করার জন্য কারুতাম্মা একটা ঝুড়ি কিনল। তারপর নৌকোগুলো তীরে ফিরে আসার সময় কারুতাম্মাও তার ঝুড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত হল।

নতুন বিয়ের গন্ধ তখনও গায়ে লেগে রয়েছে। এই সময় কারুতাম্মাকে মাছ ফিরি করতে দেখে অন্য মেছুনীরা একটু অবাক হল।

কোচুপেন্ন জিজ্ঞেস করল, 'বলি ও মেয়ে, তোমার কিসের এত অভাব পড়ল যে নতুন বিয়ের দুদিন না পোয়াতে মাছ ফিরি করতে বেরিয়েছ?'

'কেন বেরুব না দিদি? আমিও যে তোমাদের মতো এক মেছুনী গো।'

কিন্তু ওর জবাব সকলের ঠিক মনঃপুত হল না। এই নিয়েও নানাজনে নানাকথা বলতে লাগল।

কারুতাম্মা এইভাবে আগে কখনও মাছ ফিরি করেনি। এমনিভাবে কোনদিন তাকে মাছ বিক্রী করতে বেরোতে হবে তা ও আগে কোনদিনও ভাবতে পারেনি। ওর মা একাজ করেছে কিন্তু ওর মা কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল যে তার মেয়েকেও এমনিভাবে মাথায় ঝুড়ি বয়ে মাছ বিক্রী করতে বেরোতে হবে? মার আশা ছিল মেয়েকে দেখেশুনে বেশ ভাল ঘরেই বিয়ে দেবে। কিন্তু কোনদিন কি ভেবেছিল যে কারুতাম্মার জীবনেও এমন সময় আসবে যখন ওকে এমনি ভাবে পয়সার ধান্দায় ঘুরতে হবে। জানলে কি আর মা তাকে এই কাজ শিখোত না?

নৌকো তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব মেছুনীর সাথে সেও এসে জুটল। একটা লোক একটা নৌকোর সমস্ত মাল কিনল। কারুতাম্মা আর চার পাঁচজন জেলেনী মিলে তার কাছ থেকে ভাগে মাছ নিল।

অন্যান্য মেছুনীরা মাছ কিনেই মাথায় চাপিয়ে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করল। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে তত তাড়াতাড়ি মাছ বিক্রী করতে পারবে। মেছুনীদের রোজকার অভ্যাস এটা। কিন্তু কারুতাম্মা আজ প্রথম এই কাজে বেরিয়েছে, অত ভারী বোঝা মাথায় করে ও এমনি ভাবে ছুটতে পারবে কেন? ও বেচারী তাই সকলের পেছনে পড়ে গেল। অনেক সময় তিনচার মাইল দূর অবধি মাছ ফিরি করতে হয়। এসব জায়গা বা এই মুলুকের লোকের সাথে তার

জানা শোনাও নেই। তাই ও যখন মাছ নিয়ে এক বাড়িতে এসে পৌঁছুল অন্যান্য মেছুনীরা ওর আগেই সে বাড়িতে মাছ পৌঁছে দিয়েছে। নিরাশ না হয়ে ও প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে 'মাছ চাই' কিনা জিজ্ঞেস করল। কোন কোন বাড়িতে মাছ কেনা হয়ে গেছে। কোন কোন বাড়িতে কি মাছ জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কুঁচো মাছ শুনে অনেকেই মুখ ফেরাল। কারো কারো আবার দামে পোষাল না। বেচারী কারুতাম্মা অনেক দূর অবধি মাথায় বোঝা বয়ে একটা পয়সাও পেল না। তখন ওর মনে হল লোকসান হলেও মাছগুলো বিক্রী করতে পারলে বাঁচি। যা মাছ কিনেছিল তাইই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় কি করে? তাই কম দামে মাছ বিক্রী করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ও বাড়ি ফিরল। তবে একেবারে খারাপ-কিছু তার দিন যায় নি। কয়েক ঘর বাঁধা খরিদ্দার সে জোগাড় করেছে। তারা তার কাছ থেকে মাছ কিনবে বলে কথা দিয়েছে।

ক্লান্তিতে পা টানতে টানতে কারুতাম্মা বাড়ি ফিরল। এসে দেখে পালানি বসে বসে বিড়ি টানছে। কারুতাম্মার সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে, মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। বেচারা হাঁটতে পর্যন্ত পারছিল না। ও ভাবছিল যে ওর অবস্থা দেখে পালানি অন্তত দু একটা মিষ্টি কথা বলবে, একটু দরদ দেখাবে, আর তা যদি না হয় একটা নতুন কাজে সে হাত দিয়েছে কেমন কেনাবেচা হল অন্তত তাও জিজ্ঞেস করবে। স্বামীর জন্যেই তো কারুতাম্মা এত কষ্ট করে মাছ বিক্রী করতে বার হয়েছিল। কিন্তু পালানি একটা কথাও বলল না। কারুতাম্মা যেন বাড়িতেই বসে ছিল কোথাও যেন বের হয়নি এমনি ভাবে পালানি বসে বসে বিড়ি টানতে লাগল। এখন আর কারুতাম্মার অভিমান করা সাজে না। ওর কষ্টে স্বামী একটুও সহানুভূতি না দেখালেও এ নিয়ে মান অভিমান করার সব দাবী সব অধিকার যেন ও হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ও পালানির বউ, অধিকার না থাকলেও কর্তব্য তো আছে। তাই শরীর আর মন না বইলেও ও পালানিকে জিজ্ঞেস করল, 'ভাত খেয়েছ?'

'খেয়েছি।'

কারুতাম্মা তখন চান করতে গেল। চান করে কাপড় বদলাবার আর কাপড় নেই তাই ও ভিজে কাপড় পরেই খেতে বসল। তখনও পালানি কিছু বলল না দেখে ও নিজের থেকেই বলল, 'আজ আমি মাছ লাভে বিক্রী করতে পারলুম না। আমার আগেই অন্য মেয়েগুলো সব বাড়ি বাড়ি ঢুকে মাছ বিক্রী করেছে, তাই আমি লাভে বিক্রী করতে পারলুম না। তবে আজ আমাদের লোকসান হলেও কয়েকটা বাড়িতে বাঁধা খরিদ্দার জোগাড় করেছি। আমার

অবশ্য আর একটা কাজ করারও ইচ্ছে আছে। আমি জালটানার কাজ করতে চাই। তুমি যদি কোনও ওয়ালাকারণের সঙ্গে দেখা করে এ নিয়ে কথাবার্তা বল তাহলে বেশ ভালো হয়।'

পালানি চুপ করে সব শুনল তারপর নির্বিকারভাবে বলল, 'আমার দ্বারা এসব কিছু হবে না।'

পরের দিনও কারুতাম্মা ঝুড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে এল। সেদিন আয়লা মাছ খুব উঠেছিল। কারুতাম্মার হাতে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে ও মাছ কিনল। আগের দিনের মতোই ও অন্যান্য মেছুনীদের পেছন পেছন হেঁটে চলল। যাদের বাড়ি ও রোজ মাছ বিক্রী করার ব্যবস্থা করেছিল তারা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। অন্যান্য মেছুনীরা যেখানে আনায় দুটো ক'বে বিক্রী করছিল সেখানে কারুতাম্মা দু আনায় পাঁচটা মাছ বিক্রী করল। লাভ একটু কম হলেও কয়েকটা বাঁধা খরিদ্দার ও পেল। এদের কাছে রোজ মাছ বিক্রী করতে পারবে বলে সে ভরসা পেল। বাড়ির গিন্নীরা কারুতাম্মার মিষ্টি ব্যবহারে খুব খুশি হল। তারা ওকে তার পরের দিন আবার আসতে বলল।

এমনি ভাবে দুচার দিন কাটল তারপর অন্য মেছুনীদের সঙ্গে কারুতাম্মার খুব ঝগড়া বাঁধল। অন্য মেছুনীরা সব একজোট হয়ে কারুতাম্মাকে গালিগালাজ করতে লাগল। কারুতাম্মার অপরাধ ও একটু সস্তায় মাছ দিয়েছে। ওদের একজনের সঙ্গেও পাল্লা দেবার মত জিভের ধার কারুতাম্মার নেই, তারপর আবার ওরা সবাই মিলে পাঁচছয় জনা। ও বেচারী কিছু না বলতে পেরে কাঁদতে লাগল। একটা মেছুনী হিংসেয় জ্বলে গিয়ে বলল, 'কি নচ্ছার মাগী গো। বিয়ের আগে এক মোছলমান ছোঁড়ার সঙ্গে ঢলাঢুলি করে ওদের গাঁয়ের মুখ পুড়িয়েছে এখন এগাঁয়ের সর্বনাশ করতে এসেছে।'

'আরে ও মাগীর কথা আর বলিসনি। ওর মাছ বিক্রী হবে না তো হবে কার? সব বাড়ির লোকগুলো ওর কাছে থেকে মাছ কিনবে বলে বসে থাকে। মাগী ঢং-ঢাঙ তো কম জানে না।'

এই সব কথা ওরা কারুতাম্মার মুখের ওপরই বলল। বেচারী কারুতাম্মা সব কথা শুনে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল—কানে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিল। বেচারীর হয়ে একটা কথা বলারও কেউ ছিল না। ও কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ লাল করে বাড়ি ফিরল। ওর নামে সকলে এমনি ভাবে কলঙ্ক রটালে অন্য মেছুনীদের মত কাজ করে দুটি পয়সা রোজগার করার উপায়ও ওর থাকবে না। এমনি ভাবে যা তা মিথ্যে বদনামে সে কাজ করেই বা কি করে?

সেদিন পালানি সমুদ্র থেকে ফিরে এসে দেখল কারুতাম্মা কাজে যায়নি কিন্তু এ নিয়ে ও কিছুই জিজ্ঞেস করল না। শুধু একবার ওর মুখের দিকে তাকাল। কারুতাম্মার কান্নাভরা মুখ দেখা ওর কাছে একটা নতুন কিছু নয়। আজকাল পালানি ওর কান্নাভরা মুখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু সেদিন কারুতাম্মার মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। ও তাই কারুতাম্মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ কি হয়েছে, মুখ একেবারে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে যে?'

'কি আর হবে? কিছু হয়নি।' কারুতাম্মা জবাব দিল।

বলতে গেলে এখন অনেক কথাই বলতে হয় তাই চুপচাপ থাকাই ভাল।

খাওয়াদাওয়ার পর কারুতাম্মা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল—আচ্ছা, সকলেই যে আমার নামে এমন করে বলছে, তার মানে এখানকার কারুরই কি কোন কেচ্ছা নেই? সব জেলেনী কি তাদের রীতভীত ঠিক রেখে খাঁটি আছে। নীরকুন্নাথে যখন জেলেনীদের মধ্যে ঝগড়া বাধত তখন একজন আর একজনের নামে কত কেচ্ছা রটাত। প্রত্যেকেরই একটা না একটা কেচ্ছা আছে। এখানে অবশ্য আমি কারোর সম্বন্ধেই কিছু জানি না। যদি জানতাম তাহলে ছেড়ে কথা বলতাম না। আমি তো কারোর কাছে কোন অপরাধ করিনি তবু এমনিভাবে আমার নামে বলে বেড়াচ্ছে কেন? তাদের যদি কিছু কেচ্ছা থাকে তাহলে আমিই বা কেন তা বলে বেড়াব না?

এখানেও তো সমুদ্রের ধারে ছেলেরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানেও তো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সমুদ্রের ধারে একসঙ্গে ঝিনুক কুড়োচ্ছে, কুঁচো মাছ কুড়োচ্ছে। বালি দিয়ে ঘর তৈরী করছে, হাসছে খেলছে ছোটাছুটি করছে। আজকের এই জেলেনীগুলোও তো সেদিন এমনি ভাবে অন্য জেলে-ছেলেদের সঙ্গে ছোটাছুটি করেছে। তাদেরও কি তাহলে কোন গোপন কথা নেই? নিশ্চয়ই আছে। কারুতাম্মা ভাবল যে করে হোক এই লুকোনো কেচ্ছা ও জোগাড় করবে তারপর তাদের কেচ্ছাও ও বলে বেড়াবে।

এই সমুদ্রের বাতাসে বাতাসে কোন মেয়ের অতীত প্রেম কাহিনী লুকিয়ে আছে কিনা তা জানার প্রবল একটা ইচ্ছে হল তার। কোন এক কলঙ্কিনী নষ্টা মেয়ের আত্মা চাঁদনী রাতে সমুদ্রের হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে কিনা সেটা জানতে হবে। কিন্তু এখানে আসা অবধি সেই জেলেনীর ব্যর্থ প্রেম নিয়ে রচনা করা কোনও গান সে শুনতে পায়নি আজ পর্যন্ত। তাই এরকম কোন কাহিনী এ গাঁয়ে লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে?

মেছুনীদের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর কারুতাম্মা আর মাছ ফিরি করতে

বেরোল না কিন্তু আর একটা ব্যবস্থা ও আরম্ভ করল। কিছু একটা না করলে সংসার যে চলে না। ও তাই মাছ কিনে নুন মাখিয়ে রোদে শুকোতে লাগল। যখন বাজারে মাছ পাওয়া যাবে না তখন এগুলো বেশ ভালোদামে বিক্রী হবে। খুচরো বিক্রী না হলে পাইকিরী দরে বিক্রী করে দেবে।

যে করেই হোক নিজে আলাদা কিছু রোজগার করতে হবে, স্বামীর ভরসায় থাকলে চলবে না। শুধু কাজকর্মের ভেতরেই নয়। কারুতাম্মার মনে হয় যেন ওর নিজের মধ্যেই একটা নিঃসঙ্গ জীবন গড়ে উঠছে। এমনি একটা নিঃসঙ্গ জীবন তার আগেও তো ছিল। এই জীবনের কথা কাউকেই ও বলতে পারেনি শুধু নিজে নিজেই সেটা অনুভব করেছে। কিন্তু এতো বিয়ের আগেকার কথা। কিন্তু বিয়ের পর ত্রিকন্নাপুড়ায় আসা অবধি ওর একজনও বন্ধু জোটেনি যাকে ও মনের সুখদুঃখের দুচারটা কথা বলতে পারে। পাড়াপড়শী কারোর সঙ্গেই ওর ভাব নেই, মাখামাখি নেই। সঙ্গীহীন নিতান্ত একলা হয়েই তার জীবনটা কেটে যাচ্ছে।

পালানির দিনগুলোও ঠিক কারুতাম্মার মত কাটছে। কাজে যাচ্ছে বটে কিন্তু আগেকার সেই উৎসাহ সেই কর্মক্ষমতা সব যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। পালানির কত বন্ধুবান্ধব ছিল কিন্তু আজকাল ও সকলের সংস্রব ত্যাগ করেছে। আজকাল ও শুধু কাজে যায় আর বাড়ি এসে চুপচাপ বিড়ি টানে। মন খুলে কারুতাম্মার সঙ্গে দুটো ভালোমন্দ কথাও বলে না।

ওদের দুজনেরই জীবন কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। নতুন বিয়ের সেই উন্মাদনা নেই, নেই কোনও মধুর অনুভূতি। আজকাল যখনই পালানি সাগ্রহে কারুতাম্মাকে আলিঙ্গনে বাঁধতে চেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এক নিমিষের মধ্যে সমস্ত আবেগ সমস্ত উচ্ছ্বাস যেন জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। যৌবনের সেই উত্তাপ, সেই তেজ যে এত তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে যাবে তা কে জানত? বিয়ের পর নতুন জীবন গড়ে তোলার সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এখন যেন ঠিক একটা যন্ত্রের মত তাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুজনেরই মনে হয় এমনি ভাবে দাম্পত্য জীবন কি শুধু তারাই কাটাচ্ছে? হয়তো এমন অনেক পরিবারই আছে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর জীবন এমনি নির্বিকার, নিস্তেজ আর এমনি শীতল। কে জানে?

এই জীবনকে মেনে নেওয়া ছাড়া কারুতাম্মার আর কোন উপায়ই নেই, তাই এর মধ্যেই একটু আনন্দ একটু তৃপ্তি খুঁজে বের করতে চায়। পালানির কথা ও জানে না। জানতে চেষ্টা করার সাহস আর উৎসাহ দুইই যেন সে

হারিয়ে ফেলেছে।

কারুতাম্মাকে নিয়ে যখন এখানকার জেলেরা পাঁচ রকম কথা বলাবলি আরম্ভ করল তার থেকে পালানিও বাদ গেল না। আজকাল লোকে ওর পেছনে কি সব কানাঘুষো করে। আবার কেউ কিছু না করলেও পালানির সন্দেহ হয় যেন জেলেরা তাকে নিয়ে কি সব বলাবলি করছে। ওরা নিশ্চয়ই গুজগুজ ফুসফুস করে বলাবলি করছে যে ওর বউএর রীতের ঠিক নেই, একটা নষ্টা মেয়ে সে। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কিই বা হতে পারে?

মাত্র চার-পাঁচ মাস আগেও পালানির চালচলন কত আলাদা ছিল। গাঁয়ের সকলের সঙ্গে মিশত, হাসিঠাট্টা করত, আপনার মা-বাপ আত্মীয়স্বজন না থাকাতে গাঁয়ের লোকেরাই ছিল তার কুটুম্ব। বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না, সকলের মুখেই তখন পালানির সাহস, তেজ আর নিষ্ঠার প্রশংসা। যে কেউ ওকে দেখত, মিষ্টি হেসে ওর ভালমন্দের খোঁজ নিত। গাঁয়ের ভালো ছেলে বলে ওর সুনামও ছিল। কিন্তু দিন কত বদলে গেছে। আজ সেই পালানিকে দেখে মিষ্টি হাসি হাসা তো দূরের কথা তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কি সব বলাবলি করে। পালানি তো কারুর কাছে কোন অপরাধ করেনি। তবে একটা জিনিস ও জানে। সেদিন যখন সে ভূতে পাওয়ার মত নৌকোটাকে দূর-সমুদ্রে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেইদিন থেকেই এই রকম কথাবার্তার শুরু হয়েছিল। জেলেরা যে শুধু ওর হাত থেকে দাঁড় কেড়ে নিয়েছিল তাই নয় ওর নামেও গুজ-গুজ ফুসফুস আরম্ভ করেছিল।

জেলেদের সকলকারই এখন পালানি সম্পর্কে একটা ভয় আর সন্দেহ, বিশেষ করে পালানির নৌকোর মালিকের। তার ভয় যে পালানি ওর নৌকোয় উঠলেই একটা না একটা খারাপ কিছু হবে। শুধু নৌকোর মালিক কেন ওর সঙ্গী জেলেদের পর্যন্ত ওর সঙ্গে কাজ করতে ভয়। সেদিনকার সেই ঘটনার পর সকলেরই কেমন ধারণা হয়েছে যে পালানির ওপর পিশাচ ভর করেছে। শুধু তাই নয় কারুতাম্মার রীত-ভীতের ঠিক নেই, ও নষ্টা মেয়ে। ঐ নষ্টা মেয়ের জেলের সঙ্গে কাজ করে জেলেনীদের সব সময় ভয় কি জানি কখন কি হয়, সমুদ্র রুষে ফুলে উঠে না তাদের জেলেদের ডুবিয়ে মারে। তারা তাই তাদের জেলেদের বারবার বলতে লাগল পালানির সঙ্গে এক নৌকোয় কাজ না করতে। এই নিয়ে তাদের ঘরে অশান্তির সীমা রইল না।

পালানি আর কারুতাম্মা তাই কেমন যেন একঘরে হয়ে গেল। বেচারা

কারুতাম্মার হয়ে একটা কথা বলে এমন একটা প্রাণী পর্যন্ত সেই গাঁয়ে নেই। পালানির হয়েও কেউ একটা কথা বলার নেই। সবাই ওদের নিন্দে করে, একটা মিষ্টি কথা বলার, ওদের দুঃখে একটু আহা উহু করার একটি লোকও গাঁয়ে নেই।

পালানির নৌকোর মালিকের নাম কুঞ্জন। কুঞ্জনের অবস্থা আগে বেশ ভালই ছিল অনেকগুলো জাল আর নৌকোও ছিল। জায়গাজমিও বেশ কিছু ছিল আগে কিন্তু এখন ওর অবস্থা খুব পড়ে গেছে। থাকার মধ্যে আছে একটা জাল আর একটা নৌকো। ওর জমি বাড়ি সব অন্যের কাছে বাঁধা পড়েছে। এই নৌকো আর জালের কিছু হলে ওকে এখন উপোস দিয়ে মরতে হবে। কুঞ্জন গাঁয়ের এক নামকরা পরিবারের ছেলে। অবস্থা পড়ে গেলেও সে অন্যের নৌকোয় গিয়ে কাজ করতে পারবে না কেননা আত্মসম্মানে বাধে। বুড়ো কুঞ্জন লোকটা খুব সরল আর ভালমানুষ।

বুড়োর কানেও কারুতাম্মার গল্প কি ভাবে যেন এসে পৌছাল। শুনে তো বুড়ো একেবারে বসে পড়ল। কি গ্রহের ফের! একেতো এই দুরবস্থা চলছে তার ওপর এক নষ্টা মেয়ের জেলে তার নৌকোয় কাজ করছে। শুনে অবধি বুড়োর মনে আর শান্তি রইল না। রোজ যতক্ষণ না তার নৌকো তীরে ভেড়ে ততক্ষণ বুড়ো ছট্‌ফট্ করতে থাকে। পালানি নৌকোতে থাকলে কত কীই না ঘটতে পারে। নৌকো ডুবে যেতে পারে, ঘূর্ণির মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। নৌকোর কিছু হওয়া মানে তার সর্বনাশ হওয়া। বুড়ো দুচোখে অন্ধকার দেখল।

একদিন তাই সাতপাঁচ ভেবে বুড়ো পালানিকে ছাড়া নৌকোর আর সব লোকজনদের ডাকল। কুঞ্জনের নৌকোর জেলেদের পালানির সঙ্গে কাজ করতে মনে মনে বেশ ভয় ছিল। বাড়িতে জেলেনীরা রোজ এই-সেই বলে তাদের ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই নৌকোর মালিক ওদের ডাকাতে সকলেই বেশ একটা আশ্বাস পেল।

কুমারু বলল, 'আজ্ঞে, আপনার নৌকো যাওয়ার ভয় আমাদের পরাণটা নিয়ে। বলতে নেই আজ যদি আমাদের কিছু হয় তাহলে বারটা পরিবার পথে বসবে।'

আজ ভেলায়ুধন কুমারুর কথার একটুও প্রতিবাদ করল না। মনে মনে তারও ভয়। তখন বুড়ো কুঞ্জন বলল :

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ হে। সমুদ্দুরের নিয়ম কি আর বদলায়,

সে যা শাস্তি দেবার তা ঠিকই দেয়।'

বুড়ো কুঞ্জন যা বলল তা সবই সত্যিই কারণ সাগর-মা কোন অনাচার সহ্য করেন না তিনি তাঁর শাস্তি ঠিকই দিয়ে যান। সময় বদলে গেলেও সমুদ্রের নিয়মের বদল হয় না। আর সেই সমুদ্র-তীরে যুগ যুগ ধরে বাস করে আসছে যে জেলেরা তাদেরও নিয়মকানুন বদলায় না। কুমারু তাই খুব ভয় পেয়ে বলল :

'আমরা যখন সুমুদ্দুরে যাব তখন ঐ মুসলমান ছোঁড়াটা যদি পালানির ঘরে আসে তাহলে উপায় ?'

বুড়ো কুঞ্জন এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল, 'ভয়ানক কথা তো বাপু। এখন উপায়টা কি শুনি ?'

আন্টিকুঞ্জন বলল, 'ঐ ছোঁড়াটা এখনও যাওয়া-আসা করছে শুনতে পেলুম।'

কুঞ্জন জিজ্ঞেস করল, 'আসছে নাকি ? তাহলে একটা কাজ করা যাক না কেন ? ওকে এক ঘায়ে সাবাড় করে দিলে কেমন হয় ?'

ভেলায়ুধন বলল, 'না না, তাতে ব্যাপারটা আরও ঘুলিয়ে উঠবে।'

একেই তো জেলেনীদের মনে শান্তি নেই। নৌকো সমুদ্রে নামতে না নামতে তাদের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে এই বুঝি কিছু হল তারপর আবার মারপিট আরম্ভ হলে যেটুকু শান্তি এখনও পর্য্যন্ত আছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। যতক্ষণ না নৌকোগুলো তীরে ফিরে আসে ততক্ষণ তারা একমনে সাগর-মাকে ডাকতে থাকে।

আন্টিকুঞ্জ বলল 'আগেকার নিয়ম হলে আমরা কবে ডুবে যেতাম। এতদিন যে পালানিকে নিয়ে আমরা বেরিয়েছি তার জন্য আমাদের হাড়গোড় সব ভেঙে চুরে সমুদ্রের তলায় মিশে যেত। আজকাল আর অত সব কেউ বিশ্বেস করে না।

পাপু কিন্তু বলল, 'আরে চার পাঁচদিন আগেও আমি মাঝ রাতে ঐ ছোঁড়াটাকে এখানে দেখেছি।'

ভেলুতকুঞ্জ বলল, 'আমিও দেখেছি। লোকটা গান গাইতে গাইতে রোজই বোধহয় এখানে আসে।'

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও পালানির উপর তাদের সহানুভূতি আছে। আহা অমন চমৎকার ছেলে। তার এমন দুর্দশা হল। কি যে করা যায় ?

বুড়ো কুঞ্জন বলে, 'ভালো ছেলে তো বুঝলুম কিন্তু তা বলে আমাদের নৌকো আর পরাণটা তো দিতে পারি না। এখন উপায় কি করা যায় তাই বল তোমরা।'

কুমারু বলল 'আমি তো শুধু একটা রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি। পালানিকে নৌকোয় না নেওয়া।

কুমারু যা বলেছে ঠিকই। এটাই একমাত্র উপায়, তাছাড়া আর কোন পথই নেই। কুমারু আবার পালানির সেদিনকার সেই ভূতে পাওয়ার গল্প বলল। এই নিয়ে অন্তত একশবার ও এই গল্প করল। তারপর বলল, 'আবার যে ওর মাথায় এই রকম ভূত চাপবে না তার কি কিছু ঠিক আছে? আমি তো রোজই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নৌকোয় বসে থাকি। মুখ চোখের ভাব কেমন হয় দেখার জন্য।'

এবার আর কারুর আপত্তি রইল না। পালানিকে ছাড়াই নৌকো সমুদ্রে নামানো হবে।

কিন্তু এতে রাজী হলেও ওদের পালানির জন্যে খুব কষ্ট হল। পালানি সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে কুঞ্জনের নৌকোয় কাজ করছে। ছোট্ট বয়সে ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে জাল টানতো তারপর দাঁড় ধরতে শিখল। মা-বাপ আত্মীয়স্বজন কেউ না থাকায় ওর টান ছিল না কোথাও, প্রাণেরও ভয় ছিলনা। সমুদ্রের যে কোন জায়গায় যেতে ভয় ছিলনা তার এতটুকু। তারপর সে হালে বসতে শিখছে। ও যখন হালে বসে তখন অন্য সকলের চেয়ে দুটাকা বেশি পায় কারণ ওর মতো ভালো নৌকো চালাতে আর কেউ পারে না।

বুড়ো কুঞ্জন তখন সকলকে বলে, 'আচ্ছা কুমারু, তোমরা বাপু যাই বল না কেন আমার মনে হয় যেদিন থেকে পালানি হালে বসছে না সেদিন থেকে মাছও কম উঠছে।'

কুমারু তা স্বীকার করল কিন্তু বলল, 'আপনি যা বলছেন তা ঠিকই কিন্তু এতবড় বিপদ থেকে বাঁচার আর কি উপায় আছে বলুন। ওকে নৌকোয় উঠতে দিলে আমাদের সর্বনাশ হবে, তাই ওকে ছাড়াই নৌকো জলে নামাতে হবে।'

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কথা পালানির কাছে পাড়বে কে? বুড়ো কুঞ্জন বলতে পারবে না। বলার মত ওর মনের জোর নেই। ও তাই কুমারুকে বলল, 'আমার তো বাপু একথা বলার সাহস একেবারেই নেই। তোমরা কেউ গিয়ে বল।'

কিন্তু কেউই পালানিকে একথা বলতে রাজী হল না। এখন তাহলে কি করা যায়? কারুতো জেলে তখন আর একটা উপায় বার করল।

'এক কাজ করলে কেমন হয়? পালানি তীরে আসার আগেই আমরা নৌকো ছেড়ে দেব। ওকে সোজাসুজি না বলে এমনিভাবে নৌকো ছাড়লেই ও সব বুঝতে পারবে।'

কুঞ্জন যে এই কায়দা না জানে তা নয় কিন্তু এমনিভাবে না জানিয়ে নৌকো

ছেড়ে দিলে সেই জেলের সঙ্গে একটা ঝগড়াঝাঁটি বাধতে পারে। পালানির সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হলে ও যখন ওকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করবে তখন তার মুখোমুখি দাঁড়াবে কি করে?

কিন্তু এছাড়া আর তো কোন উপায়ই দেখা যাচ্ছে না। জেলেরা তাই এইটাই ঠিক করে সব ঘরে গেল। বুড়ো কুঞ্জন পালানির জায়গায় আর একজন জেলেকে ঠিক করল।

পালানি এসব ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানতে পারল না। রোজকার মতো সেদিনও সে ভোর রাতে সমুদ্র-তীরে এল। ওর আসার আগেই নৌকোগুলো সমুদ্রে নেমে গেছে। পালানি তাই দেখতে পেয়ে খুব জোরে হাঁকাহাঁকি করতে লাগল। ও এত জোরে 'কু' দিল মনে হল যেন ওর গলা চিরে একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ বেরিয়ে এল। অত জোর চীৎকার সেই সমুদ্র-তীরে সেদিন পর্যন্ত কেউ শোনেনি। পালানি বুঝতে পারল যে ওর নৌকোর লোকেরা ইচ্ছে করেই ওকে তীরে ফেলে রেখে গেছে; ওকে আর মাছ ধরতে নিয়ে যাওয়া হবে না। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে পালানির সমস্ত দেহমন চাড়া দিয়ে উঠল। ও সমুদ্রের সন্তান—ওকে এমনি ভাবে বঞ্চিত করে কার সাধ্য। ওর সমস্ত আলস্য এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। পুঞ্জীভূত আক্রোশে শরীরের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ও সাগর-মার ছেলে—যতক্ষণ না তিনি কিছু করছেন ততক্ষণ ওর কাজ থেকে ওকে বরখাস্ত করে কে? ও ঝড়-তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বছরের পর বছর প্রকৃতির রোষ ওর এই দেহটার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এতদিন ধরে ও যে কাজ করে আসছে আজ ওকে তার থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। এমনিভাবে ওকে বরবাদ করার সাধ্য কার? ওর যত শক্তি লুকিয়েছিল তা সব একসঙ্গে এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ওর সেই ভয়ঙ্কর চীৎকার হাওয়ায় হাওয়ায় পশ্চিম দিকে উড়ে চলল। হয়তো ওর ডাক ওর নৌকোর অন্য জেলেরা শুনতে পেয়েছে কিন্তু সে ডাক শুনে তারা ফিরবে কিনা সে সম্বন্ধে পালানির সন্দেহ হচ্ছে। হয়তো ফিরবে না। পালানির মনে হল যেন ওরই নৌকো ওকে টিটকারী দিচ্ছে। যে নৌকোকে ও এতদিন ভালোবেসে এসেছে, ছোটবেলা থেকে যে নৌকোয় ও কাজ করে এসেছে, ওর সমস্ত শক্তি যে নৌকোর পেছনে সে নিঃশেষে ব্যয় করেছে সেই নৌকো যেন ধিক্কার দিয়ে তাকে বলছে, 'দুয়ো দুয়ো তুই হেরে গেলি। আমার ওপর আর কোনদিনই তুই চড়তে পারবি না', বলতে বলতে নৌকো যেন হাসতে হাসতে বহুদূরে এগিয়ে যাচ্ছে।

যে শক্তি ওর মনে জেগে উঠেছিল তা এতক্ষণে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল। ও ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল নৌকোটাকে ধরার জন্যে। নৌকোটাকে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ও আবার ওর দাবী ওর অধিকার ফিরে নেবে।

শুশুকের মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও পশ্চিম দিকে সাঁতার দিতে লাগল। পালানি জেলে, সে জেলে হয়েই থাকতে চায় চিরদিন। অন্য আর কোনও কাজ সে করতে চায় না। সাগর-মার ছেলে হয়েই সে থাকতে চায়। সেই একান্ত আগ্রহেই সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল, কিন্তু ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট একটা ঢেউ এসে ওকে গিলে ফেলল আর তার পরেই তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঢেউটা ওকে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পালানি হেরে গেল, এই প্রথম সমুদ্রের কাছে তার হার। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সে বুড়ো কুঞ্জনের বাড়ির দিকে ছুটল। হাঁপাতে হাঁপাতে ও কুঞ্জনকে প্রশ্ন করল, 'আমাকে কি আর নৌকোয় নেওয়া হবে না?'

বুড়ো কুঞ্জন একটু থতমত খেয়ে গেল, 'না না—তা নয়।'

'বুঝেছি আপনি কি বলতে চান। কিন্তু সব মিথ্যে কথা ডাহা মিথ্যে। আমার বউ নষ্ট মেয়ে নয়, আমি জানি—আমি জানি।'

'কিন্তু সকলেই যে বলাবলি করছে।'

পালানি তখন ভীষণ রেগে গিয়ে ভেংচি কেটে বলল, 'আহা, আহা, সকলে বলাবলি করছে!' তারপর আর কিছু না বলে সেখান থেকে ও প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পালানিকে অমনিভাবে শুকনো মুখে অত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে কারুতাম্মা বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। এই তো গেল এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল কি করে? কারুতাম্মা তাই একটু ভয় পেয়ে বলে উঠল:

'কি গো এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?'

পালানি ওর মুখের ওপর রুক্ষস্বরে বলল, 'তুই নষ্ট মেয়ে তাই আমাকে না নিয়েই নৌকো সমুদ্রে নেমেছে।'

এমনি ভাবে পালানিকে কথা বলতে শুনে কারুতাম্মা থ' হয়ে গেল। ওর পাড়াপড়শীদের অবশ্য ও বলতে শুনেছে যে ও নষ্ট মেয়ে, গাঁয়ের একটা খারাপ মেয়ে কিন্তু ওর স্বামী কোনও দিনও ওর মুখের ওপর এমনিভাবে বলেনি। এই প্রথম ও পালানিকে এমনিভাবে বলতে শুনল। অবশ্য পালানি একজনের শোনা কথাই বলেছে, তবু তো এমনিভাবে বলল। ওর জন্যই ওর স্বামীর আজ এই দুর্দশা। তাকে এমনিভাবে ফেলে সকলে পালিয়েছে। পালানিকে নৌকোয় না নিলে ওদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সে কথা ভাবতেও ও ভয় পেয়ে গেল।

পালানি কিছুক্ষণ পরে বলল, 'দোষ কিন্তু তোর। তুই জেলের ঘরে জন্মেছিস সেইরকম থাকবি। তুই ঐ মোছলমান ছোঁড়াটার সঙ্গে ছোট বেলায় অত খেলাধুলো মাখামাখিই বা করতে গিয়েছিলি কেন? লোকে বলতে ছাড়বে কেন। লোকের স্বভাবই তো এই।'

কথাটা ঠিকই। কিন্তু আজ ওর স্বামী যে ভাবে সোজাসুজি ওকে এই কথাটা বলল তেমন ভাবে আর কেউ কোনদিন তাকে বলেনি। ওর মা ওকে এই নিয়ে বকাঝকা করেনি যে তা নয় কিন্তু এমনি রূঢ় স্পষ্টভাবে নয়। পালানির তাই এই সোজা রূঢ় প্রশ্ন শুনে কারুতাম্মা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এই প্রশ্নের পেছনে যে অর্থ লুকিয়ে আছে তা আজ ও সম্পূর্ণ বুঝতে পারল। কিছু একটা উত্তর দেওয়া উচিত কিন্তু কি উত্তর দেবে? নিজের দোষ স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় কি?

ওর চোখ জলে ভরে এল। ও কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ছোট্ট ছিলাম, ভালো

করে কিছুই বুঝতে পারিনি তাই এমনি একটা ভুল করে ফেলেছি তার জন্যে আজ তোমার কাছে মাপ চাইছি।'

পালানির রাগ কিন্তু ওর ওপর নয়, বলল, 'তোর নামে এমনিভাবে যা-তা বললে আমার খারাপ লাগে। তোর দোষটা কোথায় ?'

এবার স্বামীর কথা শুনে কারুতাম্মা একটু আশ্বস্ত হল। ওর স্বামী তাহলে ওকে ক্ষমা করেছে। ও যা বলেছে তা সবই সে বিশ্বাস করেছে। স্বামীর বিশ্বাস হারিয়েছে বলে সন্দেহের যে কাঁটাটা মনকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত করছিল সেই কাঁটাটা হঠাৎ যেন খসে পড়ল। এতদিন পরে ও যেন আবার সহজ ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে।

পালানি আবার বলল, 'সব দোষ তোর মা-বাপের। মুসলমান ছেলের সঙ্গে মেয়েটাকে মিশতে দিয়েছিল ; এখন ফল যা ভোগ করবার তা করুক মেয়ে আর তার বর। ছেলেপুলেদের ঠিকমতো দেখবে তার মা-বাপ, তারাই যদি এমনিভাবে আলগা হয় তাহলে দোষ তো তাদের।'

পালানির রাগ তখনও পড়েনি। ও হঠাৎ কারুতাম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার সন্দেহ হয় যে তোর বাপ নিশ্চয়ই জাল আর নৌকো কেনার জন্যে তোকে দিয়েই মুসলমানটার কাছ থেকে কিছু আদায় করেছে। তাকে ঠকিয়েছে। তা ব্যবস্থাটা মন্দ নয় !'

পালানির সন্দেহের কারণ আছে। কারুতাম্মা আর সব কথা পালানিকে বললেও এই কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল। ও ভেবেছিল একথা বললে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোনোর অবস্থা হবে তাই এটা এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন ওর মানুষটা যে ভাবে বলছে তাতে তো আর কথাটা লুকিয়ে রাখলে চলবে না। সমস্ত কিছু খুলে বলা দরকার।

পালানি তারপর বউকে টিটকিরী মেরে বলল, 'তোর বাপ-মা যেমন তোকে আশকারা দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে, আর ছেলেটার সঙ্গে মিশতে দিয়েছে তুইও তোর পেটের বাচ্চাটাকে তেমনি ভাবেই মানুষ করিস। আর যদি বাচ্চাটা মেয়ে হয় তাহলে অন্য জাতের ছেলের সঙ্গে কি করে ঘুরে বেড়াতে হয় তাও ভালো করে শিখিয়ে দিস্। বুঝলি !'

কারুতাম্মা প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'না না এমনি করে বোলোনা। আমার খুব শিক্ষে হয়েছে। আমাকে যেভাবে ভুগতে হয়েছে আমার বাচ্চাটাকে যেন তেমনি ভাবে ভুগতে না হয়। সাগর-মার দিব্যি দিয়ে বলছি যতক্ষণ আমার দেহে পরাণ থাকবে ততক্ষণ এমনিটি হতে দেবনা। কোন দিনও না।'

কারুতাম্মার মনে আজ একটা খুব বড় সান্ত্বনা যে ওর স্বামী আজ ওর পেটের বাচ্চাটার কথা বলেছে। ওর এতদিন ধারণা হয়েছিল যে ওর পেটে বাচ্চা আসুক বা নাই আসুক তাতে পালানির কিছু আসে যায় না। আরও একটা আশ্বাসের কথা যে পালানি আজ ওর দোষত্রুটি নিয়েও কিছু বলেছে। তার মানে ওর স্বামী ওর এই বদনামে বিশ্বাস করে না। ওঃ এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর কি আছে! স্বামী তাকে বিশ্বাস করে কি না করে এতদিন এই চিন্তা জগদ্দল পাথরের মতো তার বুকে চেপে বসেছিল। এখন সেই পাথরটা যেন সরে গিয়েছে, ও এখন সুস্থভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। আঃ কি আরাম!

এতদিন স্বামী-স্ত্রী-রূপে বসবাস করেও তারা কেমন যেন ছিল ছাড়াছাড়া। পরস্পর পরস্পরের কাছে মন না খুলে পরস্পরকে কেন্দ্র করে এক বৃত্ত রচনা করেছিল সেই বৃত্তের বাইরে পা দিয়ে পরস্পরকে জানার চেষ্টা ছিল না। এখন পালানির এই কথায় সে বৃত্ত যেন মিলিয়ে গেল। ব্যবধান দুর হয়ে গেল। স্বামী তাকে আর অবিশ্বাস করে না। এখন পরস্পর তারা মন খুলে কথা বলতে পারবে। এখন ও দুচারটে কথা খোলাখুলি বললে পালানি তা শুনবে।

কারুতাম্মা অসহায়ের মত পালানির একটুখানি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের এখন চলবে কি করে?'

পালানি কিন্তু সেকথা ভাবছিল না। সংসার যে করেই হোক্ চলবে। ও ভাবছিল অন্য কথা।

কারুতাম্মা তখন জেলেদের গাল দিতে দিতে বলল, 'পাজী হারামজাদা সব। আমাদের হাতে না মেরে ভাতে মারবে। আমি মাছ ফিরি করতে গেলুম তো আমার নামে যা-তা বলতে লাগল। এখন তোমাকেও কাজে না নিয়ে চলে গেল।'

কারুতাম্মার কথা শুনে পালানির সুপ্ত পৌরুষ যেন জেগে উঠল। ও দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আমার কাজ বন্ধ করে কোন্ শালা? আমি জেলে হয়ে জন্মেছি, জেলে হয়েই মরব।'

পালানির কথা শুনে কারুতাম্মা মনে খুব বল পেল, ও লক্ষ্য করল স্বামীর সমস্ত পৌরুষ যেন জেগে উঠেছে। শরীরের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। সেই দিকে তাকিয়ে ওর সমস্ত মন গর্বে ভরে উঠল। ও যে এক জোয়ান মরদের বউ সেই গর্বে আর সুখে ওর মন ভরে গেল।

পালানি দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'আমাকে নৌকোয় উঠতে দিল না বটে কিন্তু আমার মাছধরা ঠেকায় কোন্ শালা? আমি সাগর-মার ছেলে, আমার জন্ম

হয়েছে সমুদ্দুরে কাজ করার জন্যে। সমুদ্দুরে যা আছে তা সব আমার সম্পত্তি। আমাকে তার থেকে ঠকায় কে আমি দেখব!'

সত্যিই তাই। অপার অগাধ এই সমুদ্রের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী সে। নিজের অধিকারের সীমা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার মনে আত্মগর্ব জাগে। ও বউকে বলল, 'তুই ভুলেও ভাবিস না যে দুমুঠো দানার জন্যে পালানি মাটি কোপাতে বা জমি সাফ্ করতে যাবে। সে সব কাজ করার অন্য লোক আছে জেলে নয়। তুই শুধু চুপ করে বসে দেখ সমুদ্দুরে যা আছে তাই দিয়েই আমার সংসার চলবে। জান্ থাকতে এ মিয়া অন্য কিছু করবে না।'

পাঁচ বছর বয়স থেকে পালানি সমুদ্রের কাজ করছে। তখন থেকেই ও জাল টানার কাজে লেগেছিল। একদিনও এমন যায় নি যে যখন মাছ ধরার সময় ও বাড়িতে বসে ছিল। এইই প্রথম যখন তাকে ফেলে অন্য জেলেরা চলে গেল। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা, এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে?

বসে থাকতে থাকতে ওর পশ্চিম দিকে নজর পড়ল, সেখানে মাঝ সমুদ্রে মাছ-ধরা নৌকোগুলো সব হেলছে দুলছে নাচছে। সেদিন আয়লা আর কুরুচি মাছ ওঠার দিন। পালানি বসে বসে ছট্ফট্ করতে লাগল। নিজের হাত-পা নিজেই কামড়াতে ইচ্ছে করছিল, রাগের চোটে ও আপনার মনে গজ গজ করতে লাগল।

এদিকে পালানির কথাগুলো শুনে কারুত্তাম্মার শক্তি যেন নতুন করে জেগে উঠল। ওর স্বামী যদি তাকতওয়ালা জেলে হয় তাহলে ও তো সেই জেলেরই বউ। সাগর-মার সম্পদে তারও অধিকার আছে। জেলে যদি মাটি কোপাতে, জমি সাফ্ করতে না যায় জেলেনীও তাহলে নারকোল ছোবড়া পিটিয়ে দড়ি পাকাতে যাবে না। ও সব কাজ তারও নয়। ও পালানিকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি আবার পুবদিকে মাছ ফিরি করতে বেরোই না কেন?'

পালানি বারণ করলো, 'না। তোকে এখন কোথাও বেরোতে হবে না। তোর এই পেট নিয়ে মাথায় ঝুড়ি বয়ে বাড়ি বাড়ি মাছ ফিরি করতে হবে না।'

'আমার একটুও কষ্ট হবে না—এখনও হতে অনেক দেরী আছে।'

পালানি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখ্ তোকে খেতে পরতে দেবার ক্ষ্যামতা আমার এখনও আছে। তুই বেশী সর্দারি না করে চুপচাপ বসে থাক্। যা করবার আমি করব।'

কারুত্তাম্মা কিন্তু পালানির এই নির্দেশ সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারছিল না। তাদের এই বিপদের দিনে চুপচাপ বসে থাকতে ওর মন চাইছিল না কিন্তু

পালানির কথায় একটা খুব বড় আশ্বাস ও পেল। ওর মনে ভয় ছিল যে ওর অতীত ভুলত্রুটির জন্য ওর ভবিষ্যৎ জীবন কি রকম হবে কে জানে? এই নিয়ে এতদিন তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এখন পালানির কথা শুনে একটা বিরাট ভার যেন বুক থেকে নেমে গেল। স্বামীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছে ওকে পয়সা রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে হবে না, ওর খাওয়া-পরার ভার ওর স্বামীর ওপর। এর বেশি আর কি ও আশা করতে পারে, চাইতে পারে?

অনেক দিন পরে এক অপূর্ব আনন্দানুভূতিতে কারুতাম্মার সমস্ত মন ভরে উঠল। আজকের দিনটা ওর জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অবিশ্বাস আর সন্দেহের যে কালো মেঘে দিনগুলোকে ঢেকে রেখেছিল তা যেন দমকা বাতাসে কোথায় উড়ে গেল। মিষ্টি সোনালী আলোয় ওর হৃদয়াকাশ রাঙা হয়ে উঠল। আজ এই সর্বপ্রথম ও যেন স্ত্রীর মর্যাদা পেল। এখন আর তার কিসের অভাব। ওর মনে হল এই সমুদ্রের উপকূলে ওর বর-এর মতো শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষ আর একটিও নেই। আর সেই জোয়ান পুরুষের সে-ই বউ। শুধু একটু বাকি আছে। একটুখানি মাত্র।

পালানি যেন তারই উল্লেখ করে বলল :

'কারুতাম্মা, তোকে শুধু আমার একটা কথা বলার আছে। তুই তোর রীতভীত্ বাঁচিয়ে এই সমুদ্দুরের একটা খাঁটি জেলেনীর মতোই থাকবি। এইটুকুই আমি চাই। ব্যাস্, বাদবাকি সব আমি দেখব।'

এতদিন পরে পালানি স্পষ্ট ভাষায় বলল সে কি চায়। এর আগে কতদিন কারুতাম্মা তার হাতে পায়ে ধরে, আদর জানিয়ে সোহাগ কেড়ে জানতে চেয়েছে পালানি কি চায় কিন্তু পালানি কিছুই বলেনি। আজকে এমনিভাবে ওর মুখ থেকে স্পষ্ট কথা শুনতে পেয়ে কারুতাম্মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানা স্ত্রীর দায়িত্ব। দাম্পত্য জীবনে এটা খুবই দরকারী নইলে দুজনের মিলিত জীবন সুখের হয় না, শান্তি থাকে না। স্ত্রীর কাছে স্বামীর এই দাবী, এই প্রতিশ্রুতি স্ত্রীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে বাড়িয়েই তোলে। ভালবাসার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে। এতদিন পরে কারুতাম্মা আবার পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পালানির বিশাল বুকে মাথা রাখল। ওর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ও ওর সমস্ত হৃদয় ঢেলে আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এমন করে বলছ কেন গো? আমি তো জানি কি ভুলই আমি একবার করেছি। আবার কি আমি সেই একই ভুল করব? আমি খাঁটি হয়েই থাকব গো, খাঁটি হয়েই থাকব।'

পালানি ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। 'কাঁদিস না, কাঁদিস না।'

ওদের নিভে-যাওয়া প্রেম আবার জ্বলে উঠল। পালানি তার বলিষ্ঠ হাত দুটি দিয়ে নিবিড়ভাবে কারুতাম্মাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। অনেক···অনেকদিন পরে আবার সেই অপূর্ব সুখানুভূতির স্পর্শ তারা পেল।

পালানির মনে হল তার মা-বাপ আত্মীয়স্বজন নেই বটে কিন্তু আছে একজন। সেই একজনই তার সকলের অভাব পূর্ণ করেছে। আর কারুতাম্মারও আজ বাপ থাকতে বাপ নেই, বোন থাকতে বোন নেই। কিন্তু একটিমাত্র লোক ওর এ সব অভাব পূর্ণ করেছে—সে হচ্ছে তার স্বামী। আজ ওদের দুজনের দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। পরস্পরের হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তারা এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করে এগিয়ে যাবে, কোন কিছুই তাদের হারিয়ে দিতে পারবে না। এই নতুন বিশ্বাস, তাদের মধ্যে এক নতুন শক্তি জাগিয়ে তুলল।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ল। নৌকোগুলো মাছ ধরা শেষ করে তীরে ফিরল। পালানি বাড়ি বসে বসে মাছ কেনা-বেচার আওয়াজ শুনতে পেল। পালানি ভাবতে লাগল ওর বন্ধুবান্ধবেরা পাইকিরী ব্যবসাদারেরা সব নিশ্চয় পালানিকে নিয়ে বলাবলি করছে। ভাবছে যে ওর চলবে কি করে—ভাবছে যে ওকে ওরা পথে বসিয়েছে। হাতে না মেরে ভাতে মেরেছে। কিন্তু হুঁহুঁ বাবা, সে গুড়ে বালি। পালানি অত সহজে হারবার ছেলে নয়। তার কাজ সে খুব ভালভাবেই জানে।

কিছুক্ষণ পরে কারুতাম্মা একটা প্রশ্ন করল:

'আচ্ছা, ওরা যে আমাদের কথা নিয়ে এত হৈ হৈ করছে ওদের জেলেনীদের সবার চরিত্তির কী একেবারে গঙ্গাজলে ধোওয়া? রীতভীত কি সব্বার খাঁটি?'

'ওঃ আমার খাঁটিরে। যত সব হারামজাদার দল। নিজেদের কেচ্ছা লুকিয়ে রেখে আমাদের পেছনে লেগেছে। আচ্ছা আমিও সোজা লোক নই। দেখে নেব হারামজাদাদের।'

কারুতাম্মাও মনে মনে ঠিক করলে যে সেও অন্য জেলেনীদের চরিত্রের খোঁজ নেবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর ওদেরও কেচ্ছা রটাবে। ও পালানিকে বলল, 'দাঁড়াও না আমিও খোঁজ নিচ্ছি ওদের কার কি কেচ্ছা, তারপর দেখি আমার জিভকে আটকায় কে?'

এতো গেল একটা বদলাবদলি নেওয়ার কথা কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে ওদের চলবে কি করে ? এখন অবশ্য ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আগেকার আর সেই ভুল বোঝাবুঝি নেই। ওদের মনোমালিন্য দূর হয়েছে কিন্তু সংসার চলবে কি করে ?. কারুতাম্মা তাই একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো, কিছু বলছ না যে, আমাদের সংসার চলবে কি করে ?'

পালানিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছে। সত্যিই তো সংসার চলবে কি করে ? কারুতাম্মা আবার বলল, 'আমার কাছে বারোটা টাকা আছে।'

'বারোটা টাকায় কি হবে ? একটা ছোটখাট জাল কিনতে গেলেই লাগবে তিরিশটা টাকা।'

কারুতাম্মা তখন একটা বুদ্ধি দিল, 'আচ্ছা দড়ি বঁড়শি কিনলে কেমন হয় ?'

'হ্যাঁ তা ভালোই হয়। কিন্তু দড়ি-বঁড়শি কিনলে একটা ছোট্ট নৌকোও কিনতে হয়।'

'নৌকো কিনলে আর একজন লোকেরও তো দরকার কে আসবে তোমার নৌকোয় কাজ করতে ?'

পালানি কিন্তু সে কথায় কান দিল না। বলল, 'কারুরই দরকার নেই। একটা ছোট নৌকো পেলে রোজকার খরচ আমি পুষিয়ে নিতে পারব।'

ওদের ওই সমুদ্রের ধারে পাঁচ-ছয়টা ছিপ-বঁড়শি ফেলার নৌকো আছে। কারুতাম্মা বলল, 'এদের একটা ভাড়ায় পাওয়া যাবে না ?'

'আরে দূর—কেউ দেবে না। আমি ওদের নৌকোয় উঠলেই ওদের নৌকো যে সব ডুবে যাবে।'

'তাহলে এখন উপায় ?'

পালানি একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, 'আচ্ছা ঐ বারোটা টাকা এখন দেতো দেখি। দড়ি-বঁড়শি তো আগে কিনি।'

কারুতাম্মা টাকাটা বার করে গুণে দিল। পালানি টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কারুতাম্মা বসে বসে ভাবতে লাগল, সে সত্যিই ভাগ্যবতী। ওর জেলে যে করেই হোক আবার নতুন জীবন গড়ে তুলবে। স্বামীর সাহস আর আত্মবিশ্বাস দেখে ওর মনে হতে লাগল যে একটা বাড়ি আর সেই বাড়ির দরকারী যাবতীয় জিনিসপত্র, নৌকো জাল যেন সমস্তই এখন একটার পর একটা হতে পারে। এবার তার নিশানা দেখা যাচ্ছে। হবে, সবই হবে। তার মানুষটার রক্তের তেজ আছে, সে সবই আস্তে আস্তে গড়ে তুলবে।

কারুতাম্মা বসে বসে প্রার্থনা করতে লাগল যেন ওর গর্ভের সন্তান মেয়ে না হয়। মেয়ে হয়ে জন্মানোর যে কি জ্বালা সে তা খুব ভালোভাবেই জানে। যেমন যেমন তার জীবনে ঘটেছে তেমন তেমন তার মেয়ের জীবনেও ঘটতে পারে। নাঃ এরকম আর হবে না, ও হতেও দেবে না। ওর মেয়েকে বাচ্চা বয়স থেকেই কোন ছেলের সঙ্গে খেলা করতে দেবে না। মিশতে দেবে না। ওর মেয়ে যেন কোন ছেলের প্রেমে না পড়ে। আর যদি ছেলে হয়? তাহলে সেই ছেলে যেন অন্য কোন মেয়ের জীবন নষ্ট না করে। সেই চেষ্টাই ও প্রাণপণে করবে।

মনে মনে এমনি ঠিক করে কারুতাম্মা উঠে পড়ল। ভাত আর তরকারী রাঁধল। আজ ওর বড় ইচ্ছে করছে ঠিক সেই আগেকার দিনটির মতো পালানির সঙ্গে বসে একথালা থেকে দুজনে ভাত খাবে। ও ভাতের বড় বড় গ্রাস একটার পর একটা পালানির মুখে পুরে দেবে আর পালানি তাকে খাইয়ে দেবে ছোট ছোট গ্রাস।

কারুতাম্মা যেন বসে বসে স্বপ্ন দেখতে লাগল। আজ যদি ওর কিছু না জোটে তাহলেও সে ভয় পায় না। ও আধপেটা খেলেও উপোস করে থাকলেও ওর মনে দুঃখ নেই। ও এখন সব কিছু সহ্য করতে পারে কেননা ও ওর মানুষটার ভালবাসা পেয়েছে। সে ওকে মাফ করেছে। ওর সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে ওকে বুকে টেনে নিয়েছে। আর কি চাই? ওর ঈশ্বর ওর জীবন-দেবতা ওকে ক্ষমা করেছে। ওর এখন আর দুঃখ কিসের ভয়টাই বা কি?

সন্ধ্যা হয়ে গেলে পর পালানি দড়ি-বঁড়শি কিনে বাড়ি ফিরল। ছোট বড় দুরকমেরই বঁড়শি। বঁড়শিগুলো সব দেখে ঠিকঠাক করে রাখল।

তারপর রাত যখন খুব গভীর হল, গাঁয়ের লোকেরা সব ঘুমিয়ে পড়ল আর সমুদ্রের ধার হয়ে এল নীরব নিস্তব্ধ তখন পালানি দড়ি-বঁড়শি নিয়ে বেরোল। বেরোনর আগে কারুতাম্মা ওর হাত দুটো ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এই মাঝরাতে তুমি কোথায় বেরোচ্ছ?'

পালানি বলল, 'কারুর একটা ছোট নৌকো নিয়ে সমুদ্দুরে নেমে পড়ব। তারপর লোকজন জেগে আসার আগেই মাছ ধরে ফিরে আসব। এ ছাড়া আর উপায় কি?'

কারুতাম্মা পালানির কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। রাত্রিবেলায় একা একা সমুদ্রে যাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক তা সে খুব ভালভাবেই জানে। কত না বিপদ ঘটতে পারে! ও ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'ও মা গো তুমি এই মাঝরাতে…'

'মাঝরাতে তো কি ?'

'একা একা কি করে যাবে গো ?'

'আরে যা, বেশি বকর বকর করিসনি। আমি সাগর-মার ছেলে—আমার ভয়টা কি—?' বলে পালানি বেরিয়ে গেল।

কারুতাম্মা ওর পেছন পেছন আসতে আসতে বলল, 'মাছের পেছনে ধাওয়া করতে করতে যেন মাঝ সমুদ্দুরে চলে যেয়ো না।'

পালানি ওর কথার কোন উত্তর দিল না।

পালানি চলে যাওয়ার পর ভয়ে আর চিন্তায় কারুতাম্মার চোখে ঘুম এল না। ও বাইরে এসে পশ্চিম দিকে একটা নারকোল গাছের তলায় বসল। দেখতে পেল একটা নৌকো একটু কাত হয়ে সমুদ্রে নামল। কারুতাম্মা মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হেই গো সাগর-মা! মানুষটা যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।'

সকলের জাগার আগেই ভোর রাতে পালানি ফিরে এল, অল্প কিছু মাছ পেয়েছে। ভোর বেলাতেই কার্তিকাপল্লী নামে একটা শহরে গিয়ে পৌছোল। মাছ বিক্রী করে পেল আট টাকা।

একটা ছোট্ট নৌকো না কিনলে চলবে না। কতদিন আর এমনি ভাবে অপরের নৌকো নিয়ে নামবে। মাছ বিক্রী করার টাকা দিয়ে কিনতে হলে এখন বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। একটা পুরোনো নৌকো কিনতেই শ দেড়েক টাকা লাগবে।

কারুতাম্মা বলল, 'অত ভাবছ কেন ? আমার তো কিছু সোনাদানা আছে তাই বিক্রী করে কি আর দেড়শোটি টাকা পাওয়া যাবে না ?'

পালানি বলল, 'না, ও তোর কিপটে বাপে দিয়েছে ওতে আমি হাত দোবনা। দিতে আমার প্রবিত্তিও নেই।'

কারুতাম্মা বলল, 'না না এগুলো সব আমার—আমার মা আমাকে গড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাহলেও মাগের গয়না বেচে—'

'আমি কি তোমার পর ?'

কারুতাম্মা তার একান্ত আপনার হলেও বউ-এর গয়না বেচে নৌকো কেনাটা পালানির কাছে খুব কিছু সম্মানের কাজ নয়। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি ? শেষ পর্যন্ত পালানিকে তাইই করতে হল। কারুতাম্মার গয়না বিক্রী করে ও একটা ছোট্ট নৌকো কিনল। নৌকোটা খুব ছোট। কিন্তু ঐ পয়সায়

ঐ নৌকোর চেয়ে ভালো তো আর কিছু পাওয়া যায় না।

পালানির নৌকো কেনার কথা ওর পাড়া-প্রতিবেশীরা সব জানতে পারল। নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। পালানির মতো চালচুলোহীন লোক একটা নৌকো কিনতে পারে এ যেন কেউ বিশ্বাসই করতে পারল না। হোক্ না সে ছোট নৌকো। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগল যে সেই মুসলমান ছোঁড়াটাই বোধহয় নৌকো কেনার টাকা দিয়েছে।

পালানির রোজগার মন্দ হতে লাগল না। কখনও কখনও দিনে পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত আয় হয়। কোন কোন দিন আবার কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু এমনি ভাবে পালানির তৃপ্তি নেই। ওর দেহের সমস্ত সাহস আর শক্তি এইটুকু নৌকোর পেছনে ব্যয় করে যেন তৃপ্তি নেই। এত ছোট নৌকোতে কাজ করে সুখ নেই। দাঁড় টানতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ হয় না। তার দেহের শক্তির তুলনায় নৌকো দাঁড় সবই ছোট। একটা বড় নৌকো না হলে যেন এত পরিশ্রম সব বৃথাই যাচ্ছে। বড় মতো একটা নৌকো কিনে তার মাথার ধারে প্রকাণ্ড একটা দাঁড় নিয়ে না দাঁড়ালে যেন আনন্দ নেই সুখ নেই। এখানকার সমুদ্রে মাছের মরসুম ফুরিয়ে গেলে সেই নৌকো নিয়ে অন্য উপকূলে চলে যাবে মাছ ধরতে। বড় একটা নৌকো না হলে কিছুই হবে না।

কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'তা বড় নৌকো কিনলে কি তুমি একা একা যাবে নাকি ? তোমার সঙ্গে তো কেউ কাজ করতে যাবেনা।'

'আরে থাম্। নৌকো হলেই দেখবি সব কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে আসবে। আমি কি আর এদের চিনি না ? আর দেখ আমি ঠিক করে ফেলেছি যে আর কোনওদিন অন্যের নৌকোয় কাজ করব না।'

আজকাল কারুতাম্মার সবকিছুতে ক্লান্তি লাগে। ওর পেটের বাচ্চা দিনদিন বেড়ে চলেছে। পালানিও কারুতাম্মার জন্যে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। সমুদ্রে গিয়েও সে কারুতাম্মার কথা ভুলতে পারে না। সমুদ্রের বুকে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। মন পড়ে থাকে বাড়িতে। যে কোনও মুহূর্তে কারুতাম্মার প্রসব বেদনা উঠতে পারে।

একদিন পালানি কাজ থেকে ফিরে এসে দেখে চার পাঁচ জন জেলেনী ওর বাড়িতে জমা হয়েছে। ওরা মুচকি হেসে পালানিকে বলল, 'মেয়ে হয়েছে গো মেয়ে।'

একটা সদ্যজাত শিশুকে সুপুরীর খোলায় চান করানো হচ্ছে—বাচ্চাটা উ-অঁা করে কাঁদছে। চান করিয়ে মুছে তারা বাচ্চাটাকে পালানির হাতে দিল।

সকলে চলে গেলে পর ওরা দুজনে যখন একলা হল পালানি তখন কারুতাম্মাকে জিজ্ঞেস করল 'কি রে তোকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন?'

সত্যিই কারুতাম্মার মন খুব মুষড়ে গিয়েছিল। পালানি আবার জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ে হয়েছে বলে?'

কারুতাম্মা বলল, 'একটা ছেলে হলে . . .' তারপর বলল, 'তুমিও কি তাই ভাবছ না?'

পালানি বলল, 'দূর্।'

'ও তুমি এমনি বলছ।'

'আবে না না সত্যিই বলছি ছেলে হলেই বা কি মেয়ে হলেই বা কি?'

তখন কারুতাম্মা তার মনের কথাটি বলল, 'আর যাই হোক বাচ্চাটাকে আমি কারুতাম্মার মত বেড়ে উঠতে দেব না।'

পালানি তখন হাসতে হাসতে বলল, 'আর পালানিও একজন চেম্পনকুঞ্জ হবে না।'

বাচ্চাটার জন্মের পর ওদের দুজনের জীবনের অর্থই যেন বদলে গেল। এখন ওরা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পাবে না। একটা শিশু ওদের আশ্রয় কবে বাঁচতে চায় তাই ওদের জীবনের ধারাই বদলে গেল। পালানি একেবারে মেয়ে-অন্ত প্রাণ হয়ে উঠল। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বঁড়শিতে মাছ তোলার সময় ওর বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে। বাচ্চাটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তখনই বাড়ি ফেরার জন্যে মনটা ছটফট করে। বাড়ি ফিরে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তবে শান্তি। আগে বাচ্চাটাকে ও ঠিকমতো নিতে পারত না এখন কারুতাম্মা শিখিয়ে দিয়েছে। পালানি যখনই বাড়ী থাকে তখনই মেয়েটাকে কোলে করে নিয়ে বসে থাকে। কারুতাম্মা ওকে এই নিয়ে ধমক্ দেয়। বলে, 'দেখ সব সময় অমনি ভাবে কোলে নিয়ে বসে থাকলে বাচ্চাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।'

পালানি ওর কথা শুনেই তাড়াতাড়ি মেয়েকে নীচেয় শুইয়ে দেয়।

বাচ্চাটা হওয়ার পব থেকে কারুতাম্মার প্রায়ই মার আর পঞ্চমীর কথা মনে পড়ে। মা ওর বাচ্চাটাকে দেখতে পেল না—আর বাচ্চাটা যখন শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করতে থাকে তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কারুতাম্মার কেবল পঞ্চমীর কথা মনে পড়ে। এমনিভাবে হাত-পা ছুঁড়ে পঞ্চমীও খেলা করত। পঞ্চমীকে কারুতাম্মা তখন কত ভালবাসত। পঞ্চমী যেন তার জীবন ছিল। সেই পঞ্চমীর সঙ্গে ওর কতদিন দেখা হয়নি। বাবার জন্যে পঞ্চমীর সঙ্গে ওর

ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মাও নেই—মাকে হারিয়ে দিদিকে হারিয়ে বেচারী পঞ্চমী কি ভাবে যে তার দিন কাটাচ্ছে, কে জানে!

পঞ্চমীর কথা ভেবে কারুতাম্মার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। কতদিন··· কতদিন সে ছোট্ট বোনটাকে দেখতে পায়নি। বোনটাও হয়তো দিদির কথা ভেবে কাঁদছে। কত কষ্ট পাচ্ছে।

এর মধ্যে পালানি একদিন কারুতাম্মাকে একটা নতুন খবর দিল। চেম্পন-কুঞ্জ চেরতলা থেকে একটা জেলেনীকে নিয়ে এসে ঘর করছে। এখানকার এক ছেলে নীরকুন্নাথের কার কাছ থেকে যেন এ খবর শুনেছে।

কথাটা শুনেই কারুতাম্মার মন পঞ্চমীর জন্যে আরও ছটফট করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওর বাপের বাড়ির যত স্মৃতি মনে ভীড় করে দাঁড়াল। যে বাড়িতে সে জন্মেছে, যে ঘর তার মা কত যত্ন করে সাজিয়েছে, গুছিয়েছে, যে ঘরের প্রতিটি জিনিস মার ছোঁয়ায় পবিত্র হয়ে আছে সেই বাড়িতে আর একজন এসে গিন্নী হয়ে বসেছে। তার মায়ের নিজের হাতে গড়া বাড়িতে আর একজন এসে গিন্নীপনা করছে। বেচারী পঞ্চমীই বা এখন কি করছে কে জানে? হয়তো মার কথা ভেবে কাঁদছে কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার, দুটো মিষ্টি কথা বলার কেউ নেই।

বাবার কথা আজকাল কারুতাম্মার বেশি করে মনে পড়ছে বোধ হয় বাবার আবার বিয়ে করার কথা শুনে। পালানি যখন মেয়েটাকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরে তখন কারুতাম্মার মনে হয় তার বাবাও তাকে বুকে করে ঠিক এমনি-ভাবেই ঘুরত। আজ ওর বাবা ওকে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করলেও একদিন যে ওকে কত ভালবাসতো তাতো ওর অজানা নেই।

আজকাল কারুতাম্মার একটু সাহস হয়েছে। পালানিকে দুচারটে কথা ও অনায়াসে বলতে পারে। একদিন তাই ও মেয়েকে কোলে করে পালানির কাছে বসে বাড়ির কথা পাড়ল,

'আমার বিয়ের পর বাবার ইচ্ছে ছিল তোমাকে ঘর-জামাই করে রেখে দেয়।'

পালানি বলল, 'আমার নিজের যখন ক্ষ্যামতা আছে তখন শ্বশুরের ভাত খেতে যাব কেন?'

আর একদিন বাচ্চাটাকে চান করাতে করাতে কারুতাম্মা বলল, 'মেয়েটার মুখ দেখলেই আমার পঞ্চমীর কথা মনে পড়ে। আমি পঞ্চমীকে ছোট্টবেলায় সব সময় কোলে করে ঘুরে বেড়াতাম, এক মিনিটের জন্যেও মাটিতে রাখতাম না।' বলতে বলতে কারুতাম্মার চোখ জলে ভরে গেল:

'আহা বেচারী পঞ্চমী, এখন সৎমার লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে।'

পালানি বলল, 'লাথি ঝাঁটা খাবে কেন?'

'তাছাড়া আবার কি? সৎমা কি কখনও ভালো হয়?' তারপর পালানির মুখের দিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে বলল:

'আমার একটিবার পঞ্চমীকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।'

পালানি একথার কোনও উত্তর দিল না।

আর একদিন যখন পালানি বেশ খোশমেজাজে ছিল তখন কারুতাম্মা বলল, 'আমি একবার নীরকুন্নাথে গিয়ে পঞ্চমীকে আর বাবাকে দেখে আসি?'

পালানির কথাটা ভালো লাগল না। ওর বিরক্তি ভাব লক্ষ্য করে কারুতাম্মা হাসতে হাসতে বলল, 'দেখ আমাদেরও তো একটা মেয়ে আছে। বড় হয়ে বিয়ের পর সে মেয়ে একবারও বাপকে দেখতে এল না—কেমন দেখায় বল দেখি?'

পালানির সমস্ত মুখ কঠোর হয়ে গেল। কর্কশ গলায় ও বলল, 'তোর মতলবটা কি? পঞ্চমীকে দেখতে যাওয়ার ছল করে ঐ মুসলমান ছোঁড়াটার সঙ্গে দেখা করার সাধ—না?'

কারুতাম্মা পালানির কথা শুনে চমকে উঠল। ও যা ভেবেছিল তাহলে সব ভুল। ওর স্বামীর মন তো একটুও বদলায়নি? সন্দেহের কালো ছায়া এখনও ওর মন থেকে তো মুছে যায় নি? পালানি কি কোনদিনই পারীকুট্টির কথা ভুলতে পারবে না?

কারুতাম্মা বুঝতে পারল যে বাপের বাড়ি যাওয়ার কথাটা বলাই ভুল হয়েছে। ও কাতর স্বরে বলে উঠল, 'ওগো না গো না আমি নীরকুন্নাথে যেতে চাই না। আর কোন দিনও যাওয়ার কথা মুখেও আনব না।'

বুঝি এই অবিশ্বাস এই সন্দেহের অবসান হবে না, এ সমস্যার সমাধান নেই। ভবিষ্যতে ওদের দাম্পত্যজীবন আবার সংশয় আর সন্দেহে কালো হয়ে উঠবে বলে ওর মনে বড় ভয় হল। ও কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমাকে এখনও বিশ্বাস কর না?'

সারা জীবনই কি তাহলে এই অবিশ্বাস, এই সন্দেহের কালো ছায়ায় ঘেরা থাকবে? এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কি আর কোন উপায়ই নেই? কোনও কিছু দিয়েই বুঝি এই কালো ছায়া মুছে ফেলা সম্ভব হবে না। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন এই কালো ছায়াও তাদের জীবনকে ঢেকে থাকবে। সহজ সুস্থ বিশ্বাসপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে হলে আরও কত কাঠখড় পুড়োতে হবে কে জানে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চাকী মারা গেলেও তার আত্মা চেম্পনকুঞ্জকে ছেড়ে যেতে পারেনি। চেম্পনকুঞ্জের মনে হয় রাত্রে শোওয়ার সময় চাকীর আত্মাও তার সঙ্গে শুতে আসে। যে বাতাসে চেম্পনকুঞ্জ নিঃশ্বাস নেই সেই বাতাসে পর্যন্ত যেন চাকীর অস্তিত্ব মিশে আছে। চাকীকে চেম্পনকুঞ্জ একেবারেই ভুলতে পারছে না। ভুলতে পারছে না চাকীর সেই শেষ কথাগুলো, 'আমার মরার পর আবার বিয়ে কর'।

চাকী বুঝতে পেরেছিল যে তার মরার পর সংসারটার কি হাল হবে। তাই বুঝি ওকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল যাতে নতুন বউ এসে আবার তার ভাঙা সংসারটাকে জোড়া দেয়। চাকীর হয়তো এও মনে হয়েছিল যে তার স্বামীর সাধ-আহ্লাদ এখনও মেটেনি। একটা ডাগর দেখে মেয়ে ঘরে আনলে চেম্পন-কুঞ্জ আরও কিছুদিন সুখভোগ করতে পারবে। তাই যাওয়ার আগে সে স্বামীকে বলে গেল—'আবার বিয়ে করে তুমি তোমার সাধ—আহ্লাদ মেটাও।'

যতক্ষণ না চাকীর চোখদুটি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণ চেম্পনকুঞ্জ কতবার ওর কানে কানে জিজ্ঞেস করেছিল—

'চাকী এখন আমি কি করব?'

ওর কথার কোন উত্তর না পেয়ে চাকীর বোজা চোখদুটি খুলে চেম্পনকুঞ্জ জিজ্ঞেস করেছিল, 'চাকী তুই এত তাড়াতাড়ি চলে গেলি। আমরা যে কত কি করব ভেবেছিলাম রে। আমার কত সাধ ছিল যে আমরা দুজনে একটু আরাম করে থাকি সে সব কিছুই হল না যে।' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল।

চাকীর মৃত্যুর পর পাড়াপ্রতিবেশীরা সবাই বলতে লাগল যে চেম্পনকুঞ্জের ডান হাত চলে গেছে। কথাটা মিথ্যে নয়। চাকীই ছিল চেম্পনকুঞ্জের ঘরের লক্ষ্মী। চাকীর মত খাটিয়ে জেলেনী ওদের সমুদ্রের ধারে আর একটিও ছিল না।

চাকী মারা যাওয়ার পর চেম্পনকুঞ্জ যেন অতল জলে পড়ল। কি যে এখন করবে তা ও ভেবে পেল না। একটা বাচ্চা মেয়ে পঞ্চমীকে নিয়ে কি করে ও সংসার চালাবে? কারুতাম্মাও আসবে না—তাকে ও ডাকবেও না। আর

তাছাড়া কারুতাম্মার নিজের ঘরসংসার আছে। সে ওর এখানে এসে থাকবেও না। ভাবতে ভাবতে আবার চেম্পনকুঞ্জের কানে চাকীর শেষ কথাগুলো বাজতে লাগল—'আর একটা বিয়ে কর।'

চেম্পনকুঞ্জ তাই অনেক ভেবেচিন্তে একদিন আচ্চকুঞ্জকে ডেকে পাঠাল।

'তুই কি বলিস আচ্চকুঞ্জ। একটা মেয়ে ঘরে আনলে কেমন হয়?'

'হ্যাঁ আমারও তাই মত—নইলে তোমার সংসার চলবেই বা কি করে? আর ছোট মেয়েটার জন্যেও তো একজনকে ঘরে আনা দরকার।'

'কিন্তু যাই বল ভাই চাকীর মত কোনও জেলেনী আর পাব না।'

'তা ঠিক—ওর মত অমন জেলেনী আর একটাও আছে কিনা সন্দেহ।'

আচ্চকুঞ্জের সঙ্গে এইভাবে কথাবার্তার পর একদিন পঞ্চমীকে নাল্লপেন্নর কাছে রেখে চেম্পনকুঞ্জ আর আচ্চকুঞ্জ মেয়ের খোঁজে বেরোল। বেরোনর আগে আচ্চকুঞ্জ চেম্পনকুঞ্জকে কয়েকটা কথা বলল।

'দেখ ভাই চেম্পনকুঞ্জ তুমি আর সেই আগেকার চেম্পন নও। তোমার অবস্থা এখন অনেক ফিরেছে, তোমার দরও বেড়েছে। তোমার উচিত এখন বড়ঘরের বড়লোকের মেয়েকে ঘরে আনা যাতে তোমার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়।'

কথাটা চেম্পনকুঞ্জের ভালো লাগল। ও খুশি মনে আচ্চকুঞ্জের কথায় সায় দিল। শুধু তাই নয় তার শরীরটা এখন ভেঙে পড়েছে। আগের মতো কাজ করার শক্তিও নেই। এখন একটু বিশ্রাম করার সময়।

চেম্পনকুঞ্জের মনে আবার সেই আগেকার সাধটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কদিন একটু সাধ-আহ্লাদ মেটাবে—চাকীর কাছে এই নিয়ে কতদিন সে কতকথা বলেছে। চাকীর কথা মনে পড়তেই ওর বড় কষ্ট হল। বেচারী চাকী। কত কষ্ট করেছে জীবনে কিন্তু একটুও আরাম পায়নি। খেটে খেটেই তার সারাটা জীবন গেছে।

মেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে ওরা বেশ ভালো মেয়েরই সন্ধান পেল। পাল্লীকুন্নাথের কাণ্ডানকোরানের জেলের বৌ পাপিকুঞ্জ। কাণ্ডানকোরান মারা গিয়েছে, ওর জেলেনী বিধবা হয়ে কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। চেম্পনকুঞ্জ পাপি-কুঞ্জের খবর পেয়ে খুব খুশি হল। ও বিশেষ কিছু ভাবনা-চিন্তা না করেই রাজী হয়ে গেল। পাপিকুঞ্জের বাড়িতেই সর্বপ্রথম সে সুখের স্বাদ পেয়েছিল। কেমন-ভাবে সুখে থাকতে হয়, জীবনে সাধ-আহ্লাদ মেটাতে হয় তা ও প্রথম পাপি-কুঞ্জের বাড়িতেই দেখে তা ছাড়া পাপিকুঞ্জের সুন্দর চেহারাটার কথাও সে ভোলেনি। তাই এই মেয়ের খোঁজ পেতেই সে রাজী হয়ে গেল।

পাপিকুঞ্জেরও চেম্পনকুঞ্জকে বিয়ে করতে আপত্তি ছিল না। চেম্পনকুঞ্জের অবস্থা ভালো, খাওয়া পরার ভাবনা নেই। তাই আপত্তির কারণ আর কি থাকতে পারে? দুজনেই কিন্তু চাইছিল যে বিয়েটা যাতে নির্বিঘ্নে চুপি চুপি হয়ে যায়। পাপিকুঞ্জ তাই চেম্পনকুঞ্জকে জানালো যে এ বিয়ের সম্বন্ধে মোড়লকে জানানোর কোন দরকারই নেই। চেম্পনকুঞ্জ তাই মোড়লকে না জানিয়ে পাল্লী-কুন্নাথেই বিয়েটা সেরে পাপিকুঞ্জকে ওর বাড়িতে নিয়ে এল, সঙ্গে এল পাপিকুঞ্জের ছেলে গঙ্গাদত্তন্।

কাণ্ডানকোরানের মৃত্যুর পর পাপিকুঞ্জকে কয়েক দিন বেশ কষ্টে কাটাতে হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। আজও সে রীতিমত সুন্দরী। তার চেহারার মধ্যে এমন একটা লাবণ্য আছে যা সকলকে আকৃষ্ট না করে পারে না। তাই চেম্পনকুঞ্জ যখন পাপিকুঞ্জকে নিয়ে এল তখন ওর রূপের প্রশংসা সকলেই করছিল। সকলেরই পাপিকুঞ্জকে বেশ পছন্দ হল—হলনা শুধু পঞ্চমীর। ও ছুটে গিয়ে নাল্লপেন্নর কাছে গিয়ে নতুন মার নামে অনেক কিছু বলতে লাগল। নাল্লপেন্ন তখন ওকে বোঝাল, 'ছি মা, এমন সব কথা বলতে নেই।'

'কেন বললে কি হয়?'

'তোর বাবা চটে যাবে।'

পঞ্চমী নাল্লপেন্নর কথা শুনে কেঁদে ফেলল। কেন যে ও কাঁদল তা কে জানে?

এদিকে পাপিকুঞ্জকে ওর ছোট বাড়িতে এনে চেম্পনকুঞ্জের একটু লজ্জা লাগছিল। পাপিকুঞ্জ এতদিন বড় বাড়িতে থেকে এসেছে, ওর কুঁড়ে ঘরে যেন পাপিকুঞ্জকে মানায় না। ওর এই ছোট্ট ঘরটায় যেন কোন শ্রী নেই। পাপিকুঞ্জকে এই ঘরে এনে যেন ও ভুল করেছে। ও একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসতে হাসতে বলল, 'যখন নৌকো আর জাল করতে পারিনি তখন এই বাড়িটা করেছিলাম। হাতে পয়সা ছিল না, তাই দালান তুলতে পারিনি। পরে হাতে পয়সা হলে কারুরই আর এদিকে নজর ছিল না। চাকীও এ নিয়ে কিছু বলেনি। নইলে দুটো নৌকো আর জাল কিনলাম আর ভালোমত একটা ঘর তুলতে কি আর পারতাম না?'

পাপিকুঞ্জের দালান বাড়ির কথা মনে করেই চেম্পনকুঞ্জ এতগুলো কথা বলল। তারপর একটু চুপ করে বলল, 'ভাবছি কিছু জমিজায়গা কিনে এবার একটা বাড়ি তুলব।'

পাপিকুঞ্জ কিছু না বলে মৃদু হাসল।

নতুন বউকে ঘরে এনে অবধি চেম্পনকুঞ্জের মনটা ছটফট করছে। তার চাকীর আত্মার কি নতুন বউকে পছন্দ হয়েছে? না হওয়ারই বা কি কারণ থাকতে পারে? পাপিকুঞ্জ শুধু দেখতেই যে ভাল তা নয় তার স্বভাবটাও মিষ্টি। চাকী মরার আগে ওকে বারবার বলেছিল আর একটা বিয়ে করতে। সেই চাকীর আত্মা কি নতুন বউকে দেখার জন্যে এই ঘরেরই চারপাশে ঘোরাফেরা করছে না। নিশ্চয়ই করছে। চেম্পনকুঞ্জ যেন অনুভব করল যে চাকীর আত্মা এই মুহূর্তে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ওর কানে এল নাল্লপেন্নর ঘর থেকে পঞ্চমীর কান্নার শব্দ। চেম্পনকুঞ্জ মেয়ের কান্না শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওকে ডাকল। নতুন মার সঙ্গে মেয়ের বনিবনা না হলে সমস্ত ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে। নাল্লপেন্ন চেম্পনকুঞ্জের ডাক শুনতে পেয়ে বলল:

'যা মা, বাবা ডাকছে।'

পঞ্চমী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি যাবনা কাকী।'

'আচ্ছা চল আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি। নতুন মা কিছু বলবে না, দেখবি কত ভালো।'

নাল্লপেন্ন পঞ্চমীর চোখমুখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'নতুন মার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করিসনি।' তারপর ওর হাত ধরে চেম্পনকুঞ্জের বাড়ি নিয়ে এলো।

পাপিকুঞ্জ পঞ্চমীকে একবার ভালো করে দেখে বলল, 'কিরে খুকী কাঁদছিস কেন?'

চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'বাচ্চা মেয়েতো হয়তো মার কথা মনে পড়ে কাঁদছে।'

তারপর মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'কাঁদিসনা খুকী। তোর নতুন মা খুব ভাল। দেখনা তোকে কত ভালোবাসবে। কাঁদিস না সোনা।'

এর বেশি চেম্পনকুঞ্জ আর কিছু বলল না। যদিও ওর আরও অনেক কিছু বলার ছিল। বলার ইচ্ছে ছিল, 'তোর মা বলেছিল বলেই নতুন মাকে নিয়ে এসেছি। নতুন মাকে তাই নিজের মায়ের মতো দেখবি—কিন্তু সেই মুহূর্তে এর বেশি কিছু সে বলতে পারল না।

পাপিকুঞ্জের ছেলে গঙ্গাদত্তন্ চেম্পনকুঞ্জের সংসারে যেন একটা ফালতু লোক। সে তার নতুন বাবা আর পঞ্চমীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। গঙ্গাদত্তন্ ছোট ছেলে নয়—জোয়ান ছোকরা। দেখলে পাপিকুঞ্জের ভাই বলে মনে হয়।

অতবড় ধাড়ি ছেলে ওর মার সঙ্গে নতুন বাবার বাড়িতে কি করে থাকতে

এসেছে তাই ভেবে পঞ্চমীর মতো ছোট্ট মেয়েরও যেন কেমন লাগছিল। গঙ্গা-দত্তনেরও ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল সে কেন তার মার সঙ্গে এই নতুন পরিবারে এল। তার মা কেন এই লোকটার খপ্পরে পড়ল তা ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। ওর মাঝে মাঝে মনে হয় মা যেন তাকে জব্দ করার জন্তে এই পথ বেছে নিয়েছে। শুধু তুবেলা তুমুঠো দানার জন্তে যে তার মা এই কাজ করেছে তা যেন তার মনে হয় না। ভেতর ভেতর তাই রাগে সে ফুলতে লাগল।

সেই প্রথম যেদিন নৌকো কেনার জন্য চেম্পনকুঞ্জ পাল্লীকুন্নাথে যায় তখন কাণ্ডানকোরানের বাড়ি যে সব রকমারি খাবার খেয়েছিল সে খাবারের স্বাদ সে আজও ভুলতে পারেনি। সে সব খাবার পাপিকুঞ্জ নিজের হাতে তৈরী করেছিল। সেই খাবার খেয়ে, সেই বাড়ি দেখেই প্রথমে জীবনে আমোদ আহ্লাদ মেটানোর শখ হয় চেম্পনকুঞ্জের। এখন সেই পাপিকুঞ্জ তার ঘরে। এখন তিনবার চার-বার যতবার খুশি সে সেই রান্না পেতে পারে, কিন্তু কি আশ্চর্য এখন পাপিকুঞ্জের রান্নায় সে স্বাদ আর নেই। রান্না বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে নয়। যেমন তেমন করে যেন রান্না করা হয়েছে। চেম্পনকুঞ্জের মনে হতে লাগল ওর ভাগ্যটাই খারাপ নইলে পাপিকুঞ্জের হাতের রান্নার স্বাদ বদলে যায় কি করে?

চাকী বেঁচে থাকতে দামী যে খাটটা চেম্পনকুঞ্জ কিনেছিল সেটা চাকী একদিনও ব্যবহার করেনি। খাটের জন্য ভাল দেখে একটা তোশক তখনও পর্যন্ত করা হয়নি কারণ তোশক করার সময় তাদের ছিল না। সমস্ত সময়টা টাকা রোজগারের ধান্ধায় চলে গিয়েছিল। দরকারী কাজ সব সেরে তোশক করা যাবে এই তারা ভেবেছিল। চেম্পনকুঞ্জের বড় ইচ্ছে ছিল চাকীকে একটু ভাল খাইয়ে দাইয়ে মোটা করবে কিন্তু কিছুই হলনা তার আগেই চাকী চলে গেল।

পাপিকুঞ্জকে ঘরে আনার পর তাই চেম্পনকুঞ্জ তোশক কিনল ঠিক পাল্লী-কুন্নাথে যেমনটি দেখেছিল তেমনটি কিন্তু সেই তোশকে শুয়ে পাপিকুঞ্জের যেন আরাম নেই। এখানে আসার পর পাপিকুঞ্জ যেন কেমন দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। চেম্পনকুঞ্জ ভাবে ওদের সমুদ্রের হাওয়া কি এতই খারাপ যে পাপি-কুঞ্জের অমন সোনার মতো রঙও কালো হয়ে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি মানুষের স্বাস্থ্য কি ভাঙে, রঙ কি বদলায়? দেহের লাবণ্য কি এমনিভাবে কেউ শুষে নেয়? ঠিক কোথায় যে গণ্ডগোল ভেবে কোন কুলকিনারা পায় না চেম্পনকুঞ্জ।

অনেকদিন আগে কাণ্ডানকোরান আর পাপিকুঞ্জের সেই পরস্পরকে জড়িয়ে

ধরে চুমু খাওয়ার গল্প ও যখন চাকীকে করেছিল চাকী তখন কি রকম লজ্জা পেয়েছিল, চেম্পনকুঞ্জের এখন সেই কথা মনে পড়ল। ওদের দুজনের সেই আলিঙ্গনের দৃশ্য চেম্পনকুঞ্জের দেহে ও মনে এক উন্মাদনা জাগিয়ে তুলে তার নিজের জীবনকেও অমনিভাবে উপভোগ করার একটা তীব্র কামনা জাগিয়েছিল। আজ পাপিকুঞ্জকে তাই কাছে পেয়ে তেমনি ভাবে আলিঙ্গন করার, চুম্বন করার এক অদম্য স্পৃহা ওর মনে জেগে উঠল। পাপিকুঞ্জ ঘরের মধ্যে ঢুকলে চেম্পনকুঞ্জও ওর সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

কিন্তু সেই চুম্বনে এখন আর উত্তাপ পাওয়া গেল না। পাপিকুঞ্জকে নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার শক্তি যেন চেম্পনকুঞ্জের নেই। হাত যেন অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ চেম্পনকুঞ্জের মুখ দিয়ে 'চাকী' বলে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। পাপিকুঞ্জের মুখ দিয়েও একটা নাম বেরিয়ে এল তা হলো কাণ্ডান-কোরানের। একি হল? কেন এমন হল? কত আশা করে চেম্পনকুঞ্জ পাপিকুঞ্জকে ঘরে এনেছিল কিন্তু সুর কেমন যেন ঠিকমতে বাজছে না, অনবরত যেন তাল কেটে যাচ্ছে। এমনি জানলে কি তারা পরস্পরের কাছে এমনভাবে ধরা দিত?

ওদের দুজনের আর দুজনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়ে এক হয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। ওদের দুজনের মাঝে আর দুটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা জীবিত না থাকলেও তাদের অশরীরী আত্মা চেম্পনকুঞ্জ আর পাপিকুঞ্জের মধ্যে এক সুদৃঢ় দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দুজন হচ্ছে চাকী আর কাণ্ডান-কোরান। চাকী আর কাণ্ডানকোরানের জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত—একজন জীবনটাকে কাটিয়েছে কঠোর পরিশ্রমে আর একজন মধুর আলস্যে। পাপিকুঞ্জ হচ্ছে সেই কাণ্ডানকোরাণের বউ তাই কোথায় যেন কিসের একটা অসম্পূর্ণতা চেম্পনকুঞ্জ অনুভব করছে। তার মনে হল ও যদি কাণ্ডানকোরানের আগে পাপিকুঞ্জকে বিয়ে করতে পারত তাহলে এই অভাব এই অস্বস্তি অনুভব করত না।

ওদের দুজনের জীবন যেন ঠিক মিল খাচ্ছে না। দুজন দুজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেও পারছে না। ওদের দুজনের মধ্যে যেন প্রেমের অভিনয় চলছে। দুজনে হাসছে গল্প করছে হাসিঠাট্টা করছে কিন্তু তাতে যেন প্রাণ নেই। যেন দম দেওয়া নির্জীব পুতুলের মত যে যার অভিনয় করে যাচ্ছে। এই নতুন জীবনে যে একটা নতুনত্ব একটা মাধুর্য একেবারেই নেই তা নয় কিন্তু তার সঙ্গে যেন একটা কালো ছায়াও জড়িয়ে রয়েছে।

চেম্পনকুঞ্জ সব সময় আজকাল মনের মধ্যে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা আর উদ্বিগ্নতা বোধ করে। সেই অজ্ঞাত উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি যেন তার ভেতরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। চেম্পনকুঞ্জ কাজকর্ম না করে থাকতে পারে না, কোনদিন সে থাকেও নি। কিন্তু কাণ্ডানকোরান ছিল একেবারেই নিষ্কর্মা। ভালো মলমলের ধুতি পরে গায়ে দামী চাদর ঝুলিয়ে নৌকোগুলো তীরে ভিড়লে তার তদারকী করতে আসত। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের জীবনের একটা দিনও এমনি ভাবে কাটেনি। আর চাকী মারা যাওয়ার পর থেকে তো বড়লোক হওয়ার কামনা ও একেবারেই বিসর্জন দিয়েছে। তাই এমনিভাবে কাজকর্ম না করে অলস নিস্তেজ জীবন কাটাতে সে মনে মনে লজ্জা বোধ করে। আবার সেই আগেকার মতো নৌকো নিয়ে রোজ ছুটোছুটিও করতে ও পারে না। সে শক্তি আর উৎসাহ যেন ফুরিয়ে গেছে।

চেম্পনকুঞ্জের সংসারে এখন অভাব নেই তবু যেন ওর স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে না। রঙটা অবশ্য একটু পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু তাতে যেন ফ্যাকাশেই দেখায়। মনে ঠিক মত শান্তি না থাকায় শরীরের সেই ঔজ্জ্বল্যও ফিরে আসছে না।

একদিন চেম্পনকুঞ্জ পাপিকুঞ্জকে বলল, 'এ বছর মাছ উঠছে কম, ভালো ভাগ পাওয়া যাচ্ছে না।'

পাপিকুঞ্জ চুপ করে শুনল—কোন উত্তর দিল না যেন এ ব্যাপারে ওর বলার কিছু নেই। হয়তো এমনি ভাবে আগেও সে এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাত না তাই এটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

চেম্পনকুঞ্জ আবার বলল, 'রোজগারে এমন ভাঁটা আমার আগে আর কোনদিনও পড়েনি। আমার নৌকোয় অন্য নৌকোগুলোর ডবল মাছ উঠত তাই ভাগও বেশি পেতাম।'

এই কটি সত্যি কথা বলতে গিয়ে চেম্পনকুঞ্জের যেন কেমন লজ্জা করছিল। ও আবার বলল, 'আর তাছাড়া চাকীও আমাকে খুব মদৎ দিত। ও যে কাজেই দিত হাত তাতে যেন সোনা ফলত।'

চাকী কেমন ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পয়সা জমিয়েছিল তার গল্পও চেম্পনকুঞ্জ করল। চাকী পুব দিকে মাছ ফিরি করতে যেত, জাল টানতে যেত, মাছ শুকিয়ে বিক্রী করে দুপয়সা জমাত। চেম্পনকুঞ্জ চাকীর কথা বলছিল আর পাপিকুঞ্জের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ওর কথা শুনে পাপিকুঞ্জের মুখ ম্লান হয়ে গেল চেম্পনকুঞ্জ তা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল :

'না না, তা বলে আমি তোমাকে অবশ্য এই সমস্ত কাজ করতে বলছি না।

চাকী ছোটবেলা থেকেই খাটতে অভ্যস্ত ছিল—খাটুনী তার গায়ে লাগত না। কিন্তু তোমার কথা তো আলাদা। তুমি তো কোনদিন এসব কাজ করনি তাই তুমি জানবেই বা কি করে ? তোমার জীবন তো আর চাকীর মত কাটেনি।'

পাপিকুঞ্জের জীবন চাকীর মতো অমনভাবে না কাটলেও কথাগুলো যে তার পছন্দ হল না তা চেম্পনকুঞ্জ বুঝতে পারল। ওর বাড়ির সবকিছু এমনকি শোবার খাটটা পর্যন্ত চাকীর চেষ্টায় হয়েছে একথা চেম্পনকুঞ্জ বার কয়েক পাপিকুঞ্জকে বলেছে। পাপিকুঞ্জের কিন্তু সব সময় চাকীর প্রশংসা ভালো লাগত না। কিন্তু ও তবু কিছু না বলে চুপ করে থাকে। পাপিকুঞ্জ বেচারা বড় মুশকিলে পড়ে। একদিকে চেম্পনকুঞ্জের এই রকম কথা আর অন্য দিকে ছেলে গঙ্গা-দত্তন মাকে ভীষণ জ্বালাতে লাগল। এখানে আসার আগে মা তাকে কথা দিয়েছিল যে ছেলের একটা উপায় করে দেবে কিন্তু আজ পর্যন্ত মা কিছুই করতে পারেনি। এখন যত শীঘ্রি হোক মা যেন তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

গঙ্গাদত্তন মাকে বলল, 'ঐ মেয়েটার চাউনী দেখলে আমার খারাপ লাগে। আমার সব সময় ভয় যে মেয়েটা এই বুঝি আমাকে কিছু বলল। আমি বাবা তার আগেই এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে চাই।'

যে করেই হোক্ কিছু টাকা জোগাড় করে গঙ্গাদত্তনকে ওখান থেকে পাঠিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকা পাপিকুঞ্জ কোথা থেকে পাবে ! নিজের হাতে টাকা নেই আর চেম্পনকুঞ্জের কাছে টাকা চাইতে ওর লজ্জা করে। আর তাছাড়া চেম্পন-কুঞ্জের হাতে টাকা আছে কিনা তাই বা কে জানে। তবু অনেক ভেবে চিন্তে ও ঠিক করল চেম্পনকুঞ্জের কাছে টাকার কথাটা একটু নির্জনে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু চেম্পনকুঞ্জকে একলা পাওয়ার সুযোগ ও আর কিছুতেই পাচ্ছে না। পঞ্চমীটা কি কম পাজী। সব সময় ও বাবার কোল ঘেঁষে বসে থাকে। পঞ্চমীর উপস্থিতিতে পাপিকুঞ্জের কিছু বলতেও ইচ্ছে করে না। পাপিকুঞ্জ কিন্তু ভালো-মানুষ। ও পঞ্চমীকে ওর বাবার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কোন চেষ্টাও করে না।

পাপিকুঞ্জের অবস্থা ঠিক কাউকে বুঝিয়ে বলার নয়। চিরটা কাল তার সুখে কেটেছে কিন্তু আজ তার সব ওলট্ পালট হয়ে গেছে। কাণ্ডানকোরানের মৃত্যুর পর ও খুবই অসহায় হয়ে পড়েছিল। চোখে অন্ধকার দেখেছিল ঠিক সেই সময় চেম্পনকুঞ্জ তার পাণিপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হল। ওকে দেখে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবার আগ্রহ পাপিকুঞ্জের জেগে উঠল। তাই

চেম্পনকুঞ্জের হাত ধরে সে এই বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এমন নয় যে জীবনে সুখ পাওয়ার জন্য বা পুরুষ মানুষের স্পর্শের লোভে সে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে এসেছে। বাকি জীবনটা কাটানোর যদি কোন উপায় থাকত তাহলে সে এই পথে পা বাড়াত না। এখন ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই। সারাটা জীবন অভিনয় করেই কাটাতে হবে। কিন্তু তা বলে চেম্পনকুঞ্জের ওপর পাপিকুঞ্জের শ্রদ্ধাভক্তি কিছু কম নেই। কাজেও চেম্পনকুঞ্জের হুকুম মেনে চলতে চায় কিন্তু মুখ ফুটে তার কাছে কিছু চাইবার সাহস ওর হয় না। চেম্পনকুঞ্জকে কিছু অনুরোধও জানাতে পারে না। চাকী কত কষ্ট করে টাকা জমিয়েছিল তার সব গল্প পাপিকুঞ্জ চেম্পনকুঞ্জের কাছে শুনেছে। স্বামীকেও এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারে না বলে নিজের কাছেই তার লজ্জা করে। চেম্পনকুঞ্জ অবশ্য তাকে পয়সা কামাবার কথা সোজাসুজি কিছু বলেনি কিন্তু তার মনেও তো ইচ্ছে জাগে যে সেও দুপয়সা রোজগার করে স্বামীকে সাহায্য করে। ইচ্ছে আছে কিন্তু কি করে যে কি করবে তা ভেবে পায় না। পাপিকুঞ্জ তাই মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে।

চাকী মরার আগে চেম্পনকুঞ্জকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল, পাপিকুঞ্জের কিন্তু মনে হয় চাকী নিশ্চয়ই তার মতো বউকে আনার কথা চেম্পনকুঞ্জকে বলেনি। চাকী চেয়েছিল যে চেম্পনকুঞ্জ তারই মতো একজন খাটিয়ে মেয়েকে যেন বিয়ে করে, যে সংসারের শ্রী আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, সব দিক দিয়ে তার স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। যে সংসারের জন্য চাকী প্রাণপাত করে গিয়েছিল সেই সংসারকে আরও ভালোভাবে গড়ে তুলতে, স্বামীর সেবাযত্ন করতে, তার মেয়ে পঞ্চমীকে দেখতে, খাটিয়ে একজন জেলেনী ঘরে আনার কথা ভেবেই চাকী চম্পনকুঞ্জকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল। কিন্তু সে যে চাকীর প্রত্যাশার কোন মর্যাদা দিতে পারছে না সেটা সে যতটা বুঝেছে চেম্পনকুঞ্জ বোধহয় তার চেয়ে আরও বেশি করেই বুঝছে।

পঞ্চমীও খুব বদমাইশি শুরু করেছে। নতুন মা ঘরে আসা অবধি ও ভয়ানক জেদী হয়ে উঠেছে। নতুন মাকে ওর একটুও পছন্দ নয়। গঙ্গাদত্তনকেও ও দুচক্ষে দেখতে পারে না। আড়ালে মুখ ভেঙায়, বুড়ো আঙুল দেখায়। নতুন মা ও তার ছেলে যেন তাদের বাড়ি অনধিকার প্রবেশ করেছে পঞ্চমীর এমনি ধারণা।

একদিন পাপিকুঞ্জ কোথায় যেন যাচ্ছিল তা দেখে পঞ্চমী ওর হাঁটার অনুকরণ করে ওকে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে হাঁটছিল। পাপিকুঞ্জ হঠাৎ পেছন

ফিরে পঞ্চমীর হাঁটা দেখতে পেল আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল যে নাল্লপেন্ন ওর ঘরে বসে এই রঙ্গ দেখছে আর হাসছে। পাপিকুঞ্জ তাই দেখে প্রায় কেঁদে ফেলল। চেম্পনকুঞ্জ বাড়ি এলে পর ও বলল, 'তোমার ছোট মেয়েটার দিকে একটু নজর দিও!'

চেম্পনকুঁঞ্জ জিজ্ঞেস করলে পাপিকুঞ্জ কিন্তু কিছুই ভেঙে বলল না। শুধু বলল, 'মেয়েটাকে তুমি বড্ড বেশি আদর দিচ্ছ। এত আদর দিলে মেয়েটা একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। দুদিন বাদে যখন পরের ঘর করতে যাবে তখন ঠ্যালা বুঝবে।'

চেম্পনকুঞ্জ বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

পঞ্চমীর বিরুদ্ধে লাগালে চেম্পনকুঞ্জের পছন্দ নাও হতে পারে সেই ভয় পাপিকুঞ্জের ছিল, তবু আমতা আমতা করে ও দু একটা কথা বলল। মা-হারা মেয়ের ওপর বাবার টান একটু বেশিই হয় তাই খুব বেশি কিছু না বলে দুচার কথায় ও বলল, 'মেয়েটা আমাকে একেবারে দেখতে পারে না। সব দোষ যে ওর তা আমি বলছি না। তোমার পাড়ার লোকগুলোও সুবিধের নয়। তারাই সব যা তা আমার নামে বলে মেয়েটাকে খারাপ করে দিচ্ছে।'

চেম্পনকুঞ্জ তখন চীৎকার করে পঞ্চমীকে ডাকল। পঞ্চমী নাল্লপেন্নর বাড়িতে দাঁড়িয়েছিল। বাপের ডাক শুনে ওর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল—ও কিছু সাড়া না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পাঁচ-ছবার ডাকার পর পঞ্চমী এল, ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। পাপিকুঞ্জ বুঝতে পারল এইবার মারধোর শুরু হবে ও তাই চেম্পনকুঞ্জকে মারধোর করতে বারণ করল। চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু রাগের চোটে মেয়েকে দু ঘা কসিয়ে দিল। রাগটা অবশ্য ঠিক পঞ্চমীর ওপর নয়। পাড়াপড়শীদের ওপর রাগের চোটেই সে মেয়েকে ধরে দুচার ঘা লাগিয়ে দিল।

মার খেয়ে পঞ্চমী মার নাম ধরে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। ওর সেই কান্না শুনে নাল্লপেন্ন ছুটে এসে পঞ্চমীকে জড়িয়ে ধরল, তারপর পাপিকুঞ্জকে বলল, 'কেমনধারা মেয়েমানুষ গা তুমি। এই মা-হারা কচি মেয়েটাকে ওর বাপের মার খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি?

পাপিকুঞ্জ বলল, 'তা মেয়েটা যাতে জাহান্নমে না যায় তা দেখতে হবে বৈকি।'

নাল্লপেন্ন বলল, 'মেয়ে কোনখানটায় জাহান্নমে যাচ্ছে শুনি?'

তারপর চেম্পনকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ভালোর জন্তেই বলছি চেম্পনকুঞ্জদাদা, তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজকের নয়। তোমার নতুন জেলেনীর কথা শুনে তোমার দুধের মেয়েটাকে যেন মেরে ফেল না।'

পাপিকুঞ্জ এই কথা শুনে একটু রেগে গিয়ে বলল, 'বলি তোমার নাক গলিয়ে এতো কথা বলবার দরকারটা কি শুনি ?'

'তা দরকার আছে বৈকি। তুমি যে আজ এখানে বসে বসে কাঁড়ি কাঁড়ি গিলছ তা সে সব তোমার সতীন চাকী উপায় করে রেখে গিয়েছিল বলে। সেই চাকী মরার আগে মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। আমি কথা বলবনা তো কে বলবে শুনি ?'

পাপিকুঞ্জ ভালমানুষ হলেও সে জেলেনী। জেলেনীর জিভের ধার তারও আছে। ও বলল, 'দেখ মাগী বেশী কথা বলিসনি। আমার নাম পাপিকুঞ্জ আমি একদিন পাল্লীকুন্নাথের কাণ্ডানকোরানের ঘরে কাটিয়েছি।'

'আরে রাখ ওসব কথা। তুই আর বেশি বাজে বকিসনি। যখন কাণ্ডানকোরানের জেলেনী ছিলি তখন ছিলি। এখন তুই চেম্পনকুঞ্জের জেলেনী আর খাচ্ছিস চাকীর রোজগারের টাকায়। বেশি মুখ না নেড়ে চুপ করে বসে থাক।'

ওদের দুজনের এই ঝগড়ার মধ্যে চেম্পনকুঞ্জ একটাও কথা বলেনি। ও চুপ করে ওদের ঝগড়া দেখছিল। একে তো নাল্লাপেন্নর চিমটিকাটা কথা পাপি-কুঞ্জের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল তার ওপর চেম্পনকুঞ্জকে অমনিভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে পাপিকুঞ্জ ভীষণ রেগে গেল। রাগের চোটে ও বলল, 'বলি তোরই বা এত মাথা ব্যথা কিসের ? চেম্পনকুঞ্জ তোর কিছু হয় নাকি ?'

নাল্লপেন্ন পাপিকুঞ্জকে এক ধমক দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এই মুখ সামলে কথা বলবি বজ্জাত মাগী। আমার কথা বলার হক আছে। তুই মাগী আজকে এসেছিস তুই এসব বুঝবি না। চেম্পনকুঞ্জদাদার সঙ্গে আমার কোন লুকোনো পিরীত নেই। চেম্পনকুঞ্জদাদা আমার জেলের ছোটবেলাকার বন্ধু। আর আমার মাথা গলানোর কথা যে বলছিস তার জোর আমার আছে। চাকীর সঙ্গে আমার চেনাশোনা আজকের নয়। আমাদের দুজনের মতো ভাব আর কারুর ছিল না। তবে মিথ্যে বলব না ঝগড়াঝাঁটি কি একেবারেই হয়নি, তা হয়েছে কিন্তু তা বলে আমাদের ভাবও কিছু কম ছিল না। আমার হক্ সেই জোরে, বুঝলি ? আর চাকী মারা যাবার সময় পঞ্চমীকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল 'বোন্ তোকে ছাড়া আর কাউকেই বিশ্বেস হয় না।'

কারুতাম্মা আর পঞ্চমী আমার পেটে হয়নি বটে কিন্তু ওরা আমার নিজের মেয়ের মতো। সেই হকে কথা বলতে আসি বুঝলি ? তুই মাগী আর কদ্দিনের—তুই এত কথা জানবিই বা কি করে ?'

তারপর ও চেম্পনকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চেম্পনকুঞ্জদাদা, তোমার এই জেলেনীটি কম নয়। ভালো চাওতো এই মাগীটাকে দূর করে দাও। পঞ্চমীর জন্যে ভেবো না, ওকে আমি দেখবোখন।'

তারপর এক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বলল :

'নাহলে তোমার ঘরে সব সময় এই খেচামেচি লেগেই থাকবে। মেয়েটার মাকে তো খাটিয়ে খাটিয়ে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললে। যাই বল আর তাই বল তোমার লোভটা একটু বেশি। টাকা বাঁচানোর দিকেই তোমার নজর। টাকা বাঁচাতে গিয়ে বড় মেয়েটার যেমন তেমন করে বিয়ে দিলে। একবার আনার নামটাও করলে না। এখন বাকি আছে এই মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত···যাক্ আমি আর কি বলব।'

এত বলেও নাল্লপেন্নর শান্তি হল না। সে আবার পাপিকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের এই গাঁয়ের জেলেনীরা তাদের সোয়ামী মরে গেলে আর একজনের সঙ্গে ঘর করতে আসেনা।'

নাল্লপেন্নর জিভের ধারে পাপিকুঞ্জ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও একটা কথাও সে বা চেম্পনকুঞ্জ বলতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ জিভ আলগা করার পর নাল্লপেন্ন শান্ত হল। কিন্তু পঞ্চমীর ওপর ওর অধিকার ও ছাড়তে রাজী হলনা। তাই ও পঞ্চমীকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরে ছুঁড়ী তুই আমার সঙ্গে যাবি নাকি ?'

চেম্পনকুঞ্জ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। নাল্লপেন্ন তার মেয়েকে ডাকছে আর পঞ্চমী সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তার পেছন পেছন চলল।

পাপিকুঞ্জ জীবনে এতখানি অপমান কোনদিনও সহ্য করেনি। আজ তাকে এতখানি অপমানের কথা শুনতে হল ? বাকি আর কিছু রইল না। রাগে দুঃখে ফেটে পড়ে সে চেম্পনকুঞ্জকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কি আমার মান সম্মান খোয়াতে এখানে নিয়ে এসেছ ?'

চেম্পনকুঞ্জ একটাও কথা বলল না। পাপিকুঞ্জ বলল :

'আজ পর্যন্ত কোন জেলেনী আমার সামনে এমনিভাবে কথা বলতে সাহস করেনি। আমি পোন্নানির মোড়লের ঘরের মেয়ে—আমাকে এই সব কথা শুনতে হল ?'

চেম্পনকুঞ্জ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আরে তুমি মন খারাপ কোরো না।

বাজে কথায় কান দিয়ে লাভ কি? এখানকার জেলেনীরা সব এই রকমের ছোটলোক।'

'তুমি একটাও কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিলে কেন?'

'আমি কি করব?'

পাপিকুঞ্জ দাঁতে দাঁত চেপে বলল: 'আমি কি করব? ওঃ আচ্ছা মানুষের ঘর করতে এসেছি। এখন কি যে আমার কপালে আছে তা ভগবানই জানেন।'

নাল্লপেন্ন পাপিকুঞ্জকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছিল। পাপিকুঞ্জ তার বদলে একটা কথাও বলতে পারেনি। তাই সব রাগটা এখন গিয়ে পড়ল চেম্পনকুঞ্জের আর পঞ্চমীর ওপর। ও বলল, 'কোথাকার কোন্ জেলেনী তোমার মেয়েকে ডাকল আর মেয়েও দেখছি সুড়সুড় করে তার পেছনে চলল।'

চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'কারুতাম্মা আর পঞ্চমীকে ছোটবেলা থেকেই নাল্লপেন্ন দেখে শুনে আসছে কিনা।'

পাপিকুঞ্জ মুখ ভেঙিয়ে বলল, "ওঃ দেখে শুনে আসছে—' তারপর রাগ আর না চাপতে পেরে গালাগালি করতে লাগল, 'হ্যাঁ আরও বেশি করে ছেড়ে দাও অপরের হাতে। এটাও ওর দিদির মত গোল্লায় যাক্।'

চেম্পনকুঞ্জ কথাগুলো শুনে চমকে উঠল। একি কথা পাপিকুঞ্জ বলল—একি অভিশাপ দিল! কারুতাম্মাকে সে চিরদিনের মত বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছে, এখন পঞ্চমী শুধু বাকি! সেও কি তাহলে পর হয়ে যাবে?

পাপিকুঞ্জ কিন্তু তার বলা শেষ করেনি। সে এখন কারুর তোয়াক্কা রাখে না ভয়ও করে না। ও বলল, 'এই মেয়েটাও ঠিক ওর দিদির মতোই হবে। দিদির মতই মোছলমান ছোঁড়ার সঙ্গে তার মাগী হয়ে ঘুরে বেড়াবে।'

কথাগুলো শুনে চেম্পনকুঞ্জের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কানের মধ্যে যেন কে গরম সীসে ঢেলে দিল। ওকি কথা শুনছে সে—'মুছলমানের মাগী হয়ে'!

চেম্পনকুঞ্জ এবার যেন সব স্পষ্ট বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে কেন পারীকুট্টি অত এগিয়ে এসে তাদের টাকা দিয়েছিল। একমুহূর্তে সমস্ত জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহ'লে চাকী···চাকীও কি সব জানত—চাকীও কি এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাহলে ছিল? শুধু এইটুকুই ও জানতে চায়।

চেম্পনকুঞ্জ হঠাৎ কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে গেল। ও ছুটে নাল্লপেন্নর বাড়ি গেল। ওর চোখ-মুখ দিয়ে তখন আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে! পঞ্চমীকে

নাল্লপেন্নর কোল থেকে টেনে নিয়ে হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে খুব জোরে, মারতে লাগল আর বলতে লাগল,

'যাবি, যাবি আর কোনও মুসলমান ছেলের সঙ্গে—অ্যাঁ আর যাবি ?'

নাল্লপেন্ন সমস্ত ব্যাপার দেখে শুনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি যে করবে ঠিক বুঝতে পারল না। পঞ্চমী মার খেয়ে মার নাম ধরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। চেম্পনকুঞ্জ ওর কান্নাতে কান না দিয়ে সমানে ওকে মারতে লাগল আর বলতে লাগল:

'বল তুই কোন মুসলমানের সঙ্গে ভাব করবি না। বল শীগ্‌গির হারামজাদী নইলে তোকে আজ আমি মারতে মারতে মেরেই ফেলব। বল শিগ্‌গির।'

মার খেতে খেতে পঞ্চমী কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ও বাবাগো, আর মেরো না গো। আমি কোনও মোছলমান ছেলের সঙ্গে ভাব করব না গো। আমাকে ছেড়ে দাও গো।'

চেম্পনকুঞ্জ তখন পঞ্চমীর হাত ধরে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে বাড়িতে টেনে নিয়ে এল।

সেদিন রাতে চেম্পনকুঞ্জকে দেখা গেল, কবরখানায় চাকীর কবর খুঁড়ছে। কবর খুঁড়ে ও চাকীকে জিজ্ঞেস করবে—'সত্যিই কি কারুতাম্মা নষ্ট মেয়ে? চাকী তুই কি সব জেনে শুনেই কারুতাম্মাকে মুসলমানের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে দিয়েছিলি।' চাকীর কাছ থেকে এর উত্তর না পেলে ওর আর শান্তি নেই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চেম্পনকুঞ্জের এই পাগলামি ভাবটা কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেল বটে কিন্তু মাথাটা ওর আগের মতো আর পরিষ্কার হল না। বুদ্ধিও যেন ওর কমে এসেছে। আজকাল কথাবার্তা বেশি বলে না। সব সময় চুপচাপ জবুথবু হয়ে একজায়গায় বসে থাকে। ওর ঐ ভাবে বসে থাকা, আস্তে আস্তে চলাফেরা দেখলে মনে হয় ওর যেন সব শেষ হয়ে গেছে, ও একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। ওর চোখের চাউনিটার মধ্যেও দেউলেপনার স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

চেম্পনকুঞ্জ যে সব হারিয়ে ফেলেছে ওর যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তা ঠিকই। হাতে টাকাকড়ি এখন কিছু নেই। জমানো টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন রোজগারের চেষ্টা করার মত মানসিক অবস্থাও নেই। এখন টাকার জন্যে অন্যের কাছে হাত পাতেই বা কি করে? ওর দু-দুটো নৌকোই অকেজো হয়ে পড়ে আছে, দুটোর একটাকেও জলে নামানোর মতো অবস্থা নেই। জালের অবস্থাও তথৈবচ। ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার। একবার একটা হাঙ্গর মাছ ঢুকে জালটা একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছে। সব ঠিকঠাক করতে এখন এককাঁড়ি টাকার দরকার। ঘরে একটাও পয়সা নেই। সংসারের খরচও অনেক বেশী বেড়ে গেছে কিন্তু রোজগারের লোক বাড়েনি। ও নিজে সমুদ্রে ঠিকমতো যেতে পারছে না তাই বেচাকেনা কিছুই হচ্ছে না।

চেম্পনকুঞ্জ মাছও ধরতে যায় না। সংসারের কোনও কিছুর দায়িত্বও নেয় না। পাপিকুঞ্জই সব টুকটাক্ দেখাশোনা করে। নৌকো আর জাল না সারালে চলছে না। পাপিকুঞ্জ তাই একদিন চেম্পনকুঞ্জকে বলল যদি ধার করে সারাতে হয় তাও করতে হবে। পাপিকুঞ্জের কথা শুনে চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'তাইই করতে হবে দেখছি। কিন্তু ধার করব কার কাছ থেকে? এ গাঁয়ে আউসেপ ছাড়া আর কেউ নেই যে টাকা ধার দিতে পারে।'

পঞ্চমী বসে বসে বাবার কথাগুলো শুনছিল। ও উঠে গিয়ে কোত্থেকে যেন কুড়িটা টাকা নিয়ে এসে বাবার হাতে দিল। মা বেঁচে থাকতে কুঁচো মাছ কুড়িয়ে কিছু টাকা পঞ্চমী জমিয়েছিল। সেই টাকাটা এখন সে বাপের হাতে তুলে দিল। চেম্পনকুঞ্জ মেয়ের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে কেঁদে ফেলল। পঞ্চমী

বাপের কান্না দেখে বাপকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বলল, 'খেলাধুলো না করে যদি আরও বেশী করে কুঁচো মাছ কুড়োতাম তাহলে এর চেয়েও বেশী টাকা জমাতে পারতাম বাবা।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মা বেঁচে থাকলে আরও কত টাকা জমতো।'

এদিকে গঙ্গাদত্তনের তার নতুন বাবার বাড়ি একটুও ভাল লাগছে না। সে তাকে ওখান থেকে পাঠিয়ে দেবার জন্য মাকে খুব পেড়াপিড়ি করতে লাগল। কিন্তু আজ পর্যন্ত চেম্পনকুঞ্জের কাছে এ নিয়ে কিছু বলার সাহস পাপিকুঞ্জের হয়নি। গঙ্গাদত্তনকে এখান থেকে পাঠাতে হলে ওর হাতে কিছু টাকা দিয়ে পাঠাতে হবে। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের এই অবস্থায় টাকার কথা ও বলেই বা কি করে। বেচারী তাই মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করতে লাগল। পঞ্চমী ওর নতুন মা আর তার ছেলের ওপর এখনও সদয় হয় নি। যেন তেন প্রকারে ও তাদের সব সময় জব্দ আর অপমান করবার ছুতো খুঁজছে। পঞ্চমী এমন হাবভাব করে মনে হয় যেন গঙ্গাদত্তনের এইভাবে এখানে বসে বসে খাওয়ার কোন অধিকার নেই। বেচারী পাপিকুঞ্জ তাই নিজের দুটি খাওয়া-পরা আর ছেলের হাতে কিছু টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দেবার জন্যে সবরকম কষ্ট আর অপমান সহ্য করে চলেছে। এর ওপর রয়েছে চেম্পনকুঞ্জের উদাসীনতা—কোনও কিছুতেই তার যেন কোন আগ্রহ নেই। সবকিছু মিলিয়ে পাপিকুঞ্জের অসহ্য লাগছে। এমনিভাবে যে সমস্ত ব্যাপারটা গড়াবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাহলে সে এ ভাবে চেম্পনকুঞ্জের হাত ধরে চলে আসত না।

চেম্পনকুঞ্জ যে এমনিভাবে সবদিক দিয়ে দেউলে হয়ে যাবে তা পাপিকুঞ্জ ভাবতে পারেনি কিন্তু তাই বলে পাপিকুঞ্জ চেম্পনকুঞ্জের ওপর কোন রকম খারাপ ব্যবহার দেখায় না, যতটা পারে সে সহানুভূতির সঙ্গেই চেম্পনকুঞ্জের অবস্থা বুঝতে চায়। পারত পক্ষে চেম্পনকুঞ্জের মনে আঘাত দিতে সে চায় না। এখন তার নিজের বলতে চেম্পনকুঞ্জ ছাড়া আর কেউই নেই। তার আশ্রয়েই সে মাথা গুঁজে আছে।

পাপিকুঞ্জের মনে আরও একটা দুঃখ আছে। ও যদি চাকীর মতো রোজগার করতে পারত তাহলে খুবই ভাল হত। চাকীর মতো ও যদি পূব দিকে মাছ ফেরি করতে পারত, জাল টানতে পারত তাহলে ওদের এই ভেঙে-পড়া সংসার বেশ ভালোভাবেই চলত। যদি জীবনের প্রথম থেকেই মাছ বিক্রি করে আর জাল টেনে ওর জীবনটা কাটত তাহলে আজ হয়তো এসব কাজ করতে তার

কষ্ট হত না।

পাপিকুঞ্জ চেম্পনকুঞ্জকে বিয়ে করলেও আগে সে আর একজনের স্ত্রী ছিল। আগে তার মনে যে লোকটির জায়গা ছিল এখন সে জায়গা দখল করেছে চেম্পনকুঞ্জ। ঠিক তেমনিভাবে চেম্পনকুঞ্জের মনে যে স্ত্রীলোকের জায়গা এতদিন ছিল পাপিকুঞ্জ তাকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা বলে পরস্পর পরস্পরের পূর্বের স্বামী বা স্ত্রীর কথা ভোলেনি। চেম্পন-কুঞ্জ যেমন যে কোনও বিপদের সময় চাকীর কথা মনে করে, পাপিকুঞ্জও তেমনি সব সময় কাণ্ডানকোরানের কথা মনে করে। মনে মনে ও সবসময়ই কাণ্ডান-কোরাণের কাছে ক্ষমা চায়।

সবকিছু মিলিয়ে পাপিকুঞ্জের মনে একটুও শান্তি নেই। ওর মনে হয় সমস্ত কিছু যেন গণ্ডগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আর যত গণ্ডগোল যত অশান্তির মূলে ওইই। যখন চাকী বেঁচে ছিল তখন সবদিক দিয়ে চেম্পনকুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে আর যখন ও চেম্পনকুঞ্জের সংসারে এসেছে তখন চেম্পনকুঞ্জ যেন দেউলে হয়ে গেছে। এর কারণ চাকী তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুপয়সা রোজগার করত আর ও এক বড়লোক জেলের বউ কোনদিন তাকে কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে হয়নি। কোন দিন কোন কাজ করেনি যে মেয়ে সে এখন মাথায় ঝুড়ি বয়ে মাছ বিক্রী করতে যায়ই বা কি করে ?

নৌকো আর জাল সারানোর ব্যাপারে চেম্পনকুঞ্জের একেবারে গা নেই। চেম্পনকুঞ্জের এই রকম উদাসীন ভাব দেখে পাপিকুঞ্জ মনে মনে বড় ভয় পেলো। নৌকোগুলো তীরে কতদিন পড়ে আছে, জলে নামেনি কতদিন! নৌকো জলে না নামলে সংসার কি ভাবে চলবে ভেবে পাপিকুঞ্জর রীতিমতো ভাবনা হল। এ নিয়ে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে একদিন কথাও ও বলেছিল কিন্তু কোন ফল হয়নি। অনেক ভেবেচিন্তে ও ঠিক করল যে লোক দিয়ে আউসেপকে ডাকাবে।

সেদিন রাতে ভাত খাওয়ার পর চেম্পনকুঞ্জ চুপচাপ বসে ভাবছিল তখন পাপিকুঞ্জ ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল :

'বলি এমনিভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে ? নৌকোগুলো ঠিক করতে হবে না ?'

চেম্পনকুঞ্জ শুধু একবার মুখ তুলে চাইল। কিছুই বলল না। পাপিকুঞ্জ আবার জিজ্ঞেস করাতে ও বলল, 'হ্যাঁ, তা কিছু একটা তো করতেই হবে।'

'তাহলে আউসেপকে ডেকে পাঠাই ?'

'পাঠাও।'

চেম্পনকুঞ্জ কিছু না ভেবে না চিন্তে আউসেপকে ডাকবার কথা বলল। আউসেপের কাছে টাকা ধার নেওয়ার অর্থ যে কি তা চেম্পনকুঞ্জ ছাড়া আর কে-ই বা ভালো করে জানে। অথচ সব জেনে শুনে কেমন নির্বিকার ভাবে আউসেপের কাছে টাকা ধার করতে ও রাজী হয়ে গেল। যদি ঠিকমত চিন্তা করত তাহলে নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি রাজী হত না। তা সে নৌকোগুলো তীরে পড়ে নষ্ট হোক্ আর যাই হোক্।

চাকী যখন বেঁচে ছিল তখন রোজ রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা ওদের সংসারের উন্নতির কথা আলোচনা করত। কেমনভাবে দুটো পয়সা আনা যায় কেমন ভাবে দুটো জমানো যায় এই নিয়েও কথাবার্তা বলত। পাপিকুঞ্জের আজ এইভাবে জিজ্ঞেস করাতে আবার সেই আগেকার দিনগুলো যেন ফিরে এল বলে চেম্পনকুঞ্জের মনে হল। চাকী বেঁচে থাকার সময় তারা যখন তাদের সংসার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত তখন সাক্ষী থাকত একটা ভাঙা কেরোসিনের ডিবে। কেরোসিনের সেই ক্ষীণ আলোতে সেদিন চেম্পনকুঞ্জের বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় পাওয়া যেত। স্বামী-স্ত্রীতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কতরাত অবধি কত কথা বলত। পাশে তাদের দুটি মেয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাত। কিন্তু আজকের অবস্থা অন্য। পঞ্চমী আজ এই মুহূর্তে দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠছে।

পাপিকুঞ্জ কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এখন কি করতে বল তুমি?'

চেম্পনকুঞ্জ কিছুই বলল না। পাপিকুঞ্জ তখন একটু দুঃখ করে বলল, 'আমি যেন তোমার একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাকে দিয়ে তোমার কোন উপকারই হবে না। কিন্তু আমার অপরাধটা কোথায় বল। সারাজীবন পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেয়েছি। কাজকর্ম কিছু শিখতে পারি নি।'

এতেও চেম্পনকুঞ্জ কিছু বলল না দেখে পাপিকুঞ্জ মনের কষ্টে কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি কতলোকের ক্ষেতি করলাম। এ বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই খারাপ হতে শুরু করেছে।'

এতক্ষণে চেম্পনকুঞ্জ মুখ খুলল, বলল, 'কি খারাপটা হয়েছে শুনি? কিছু হয়নি।'

'এখন আমায় কি করতে বল তুমি?'

'যা হয় একটা কিছু কর।'

এদিকে এই অশান্তি আর ওদিকে গঙ্গাদত্তন টাকার জন্য মাকে ভীষণ বিরক্ত

করছে। ওর পাঁচশ টাকা এক্ষুনি দরকার। টাকাটা পেলেই ও এই বাড়ি ছেড়ে এই মুহূর্তেই চলে যেতে চায়। পাপিকুঞ্জ যেন ওকে জন্ম দিয়ে অপরাধ করেছে। ও যা চাইবে তাইই দিতে হবে। মা যদি বলে কোত্থেকে দেব ছেলে বলে সে সব আমি জানি না। গঙ্গাদত্তন ঠিক যা বলতে চায় তা বলতে পারে না। তার মতে চেম্পনকুঞ্জ টাকাটা দিতে বাধ্য। ওর মা নিজেকে চেম্পনকুঞ্জের কাছে বিক্রী করেছে। চেম্পনকুঞ্জ দাম দিয়ে পাপিকুঞ্জকে কিনেছে। গঙ্গাদত্তনের মধ্যে কাণ্ডানকোরানের রক্ত আছে। এক এক সময় পাপিকুঞ্জের মনে হয় যেন কাণ্ডানকোরানই তার সামনে দাঁড়িয়ে টাকার দাবী করছে।

দু একদিনের মধ্যেই আউসেপ চেম্পনকুঞ্জকে ডেকে পাঠাল। আউসেপ সব শুনে টাকা দিতে রাজী হল তবে এক শর্তে। চেম্পনকুঞ্জের নৌকো দুটো আর জালটা বন্ধক রাখতে হবে। আর যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদে-আসলে টাকাটা মিটিয়ে দিতে না পারে তাহলে নৌকো আর জাল ফি পাবে না।

চেম্পনকুঞ্জ আউসেপের কথাগুলো চুপ করে শুনল, কিছুই বলল না।

আউসেপ জিজ্ঞেস করল, 'কি হে চেম্পন, তুমি যে কিছু বলছ না?'

'কি আর বলব। টাকার যখন দরকার তখন যে কোনও শর্তেই টাকা ধার করব।'

পরের দিনই আউসেপ একটা বন্ধকনামা লিখে আনল। চেম্পনকুঞ্জ সেটা না পড়েই সই করে দিল। আউসেপ বন্ধকনামা হাতে নিয়ে সাতশ পঁচানব্বই টাকা গুণে চেম্পনকুঞ্জের হাতে দিল। চেম্পনকুঞ্জ টাকাটা নি... আর একবার গুণে বাক্সে তালা বন্ধ করে রেখে দিল।

টাকাটা হাতে পেয়ে চেম্পনকুঞ্জের ঝিমুনী ধরা চুপচাপ ভাব কিছুটা কাটল। নৌকো আর জাল মেরামত নিয়ে ও দু-একটা দরকারী কথা পাপিকুঞ্জের সঙ্গে বলল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আউসেপের টাকাটা ফিরিয়ে দেবে একথাও সে পাপিকুঞ্জকে জানাল।

'ঠিক সময়ে টাকাটা না দিতে পারলে সবকিছুই ভেস্তে যাবে। আউসেপ লোকটা একেবারে চামার।' পাপিকুঞ্জও কথা দিল সেও তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যাতে টাকাটা ঠিক সময়ের মধ্যেই ফেরত দেওয়া যায়।

আউসেপের কাছ থেকে টাকা ধার করার পর থেকে গঙ্গাদত্তন টাকার জন্যে আগের চেয়েও মাকে বেশি চাপ দিতে লাগল। সে এখানে একমুহূর্ত আর থাকতে রাজী নয়। মা যেন তাকে টাকা দিয়ে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেয়। পাপিকুঞ্জ

ছেলেকে অনেক অনুনয় বিনয় করল।

'নৌকো দুটো সারিয়ে জলে নামাতে দে বাবা। তারপর তোর যত টাকা লাগে দেব।'

গঙ্গাদত্তন কিন্তু মার অনুরোধে কান দিল না। ও পষ্টাপষ্টিই বলল :

'আমি আর এক মিনিটও দেরী করতে পারব না।'

পাপিকুঞ্জ ছেলের কথা শুনে খুব চটে গেল। বলল, 'না পারলে না পারবি। টাকা না থাকলে আমি কি করব ?'

'তাহলে একথাটাও জেনে রাখো যে আমি তোমার ছেলে নই !'

ছেলের এই কথার ঠিকমত উত্তর পাপিকুঞ্জের মুখে যোগাল না। হাজার হলেও সে মা—তাকে জন্ম দিয়েছে। আর সেই ছেলের বাপের কথা একরকম ভুলে গিয়ে সে চেম্পনকুঞ্জের কাছে এসেছে।

ছেলের কথা শুনে বেচারী একান্ত অসহায় ভাবে বলল, 'আমি কি করে ঐ মানুষটার কাছে টাকা চাই বল তো ?'

'সে সব আমি কিছু জানি না। আমার টাকা চাই। টাকা পেলেই আমি এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

মার কোনকথাই গঙ্গাদত্তন শুনতে রাজী নয়। ওর মনোভাব হচ্ছে যে ওকে এখান থেকে পাঠিয়ে দিয়ে ওর মা একলা চেম্পনকুঞ্জের আশ্রয়ে থাকুক।

পাপিকুঞ্জ তখন বলল, 'আমি যে এখানে এসেছি সে তোর জন্যেও তো বটে।'

'সে সব আমি কিছু জানি না। আমার পথ আমি নিজেই দেখে নিতে পারব। তুমি আমাকে কিছু টাকা দাও।'

চেম্পনকুঞ্জের কাছে ছেলের জন্যে টাকা চাওয়ার মত সাহস পাপিকুঞ্জের নেই। ওর মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। চেম্পনকুঞ্জকে কিছু বলতে পারছে না, চেপেচুপে রাখতেও পারছে না। গিলতেও পারছে না, উগরাতেও পারছে না। ভীষণ এক অস্বস্তির মধ্যে পড়ে বেচারীর দিন কাটছে। একদিকে চেম্পনকুঞ্জের ধারণা তার সব শেষ হয়ে গেছে অপরদিকে গঙ্গাদত্তনের এই তাগাদা। দুয়ে মিলে ওর যেন পাগল হয়ে যাবার অবস্থা।

পাপিকুঞ্জের এখন সবসময়ই মনে হয় ওর জেলে মরার পর এমনিভাবে আর একজনের সঙ্গে ঘর করতে আসা তার উচিত হয়নি, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল। কেমন করে দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় হবে সেই ভাবনাই তাকে শেষ করত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেন এই অবস্থার চেয়ে সেইই ভাল ছিল। এখন কি গণ্ডগোলেরই না সৃষ্টি হয়েছে। এখানে না এলে গঙ্গাদত্তনের

উৎপাত থেকে রেহাই পেত আর চেম্পনকুঞ্জের দুরবস্থাও দেখতে হত না। জীবনটা আগে কেটেছে খুব সুখে, সেইটাই যেন একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই ও যদি গরীব এক জেলের হাতে পড়ত আর মাছের ঝুড়ি মাথায় করে মাছ ফিরি করতে যেত তাহলে আজ আর এই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হত না। কিন্তু আগাগোড়াই ভুল হয়ে গেছে। দুটো নৌকোর মালিককে বিয়ে করে ভেবেছিল সুখেই থাকবে কিন্তু একেই কি বলে সুখে থাকা ?

গঙ্গাদত্তনকে নিয়ে পাপিকুঞ্জের মনের মধ্যে মা আর স্ত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্ব অহর্নিশ চলছিল আর সেই দ্বন্দ্বে ওর মাতৃত্বই জয়ী হল। ছেলেকে শুধু কটা টাকা দেওয়া নয় ছেলের জন্য মা উপোস করতে, ভিক্ষে করতেও রাজী আছে। তাছাড়া এ বাড়ির সঙ্গে ওর বন্ধন কতটুকু ? আজ যদি চেম্পনকুঞ্জ দেউলে হয়ে যায় ওর তাহলে দুমুঠো ভাতও জুটবে না কিন্তু গঙ্গাদত্তনের হাতে যদি কিছু টাকা দিয়ে ও পাঠিয়ে দেয় তাহলে মার দুরবস্থায় কি ও মাকে ফেলতে পারবে ?

একদিন তাই চেম্পনকুঞ্জের অনুপস্থিতিতে সুযোগ বুঝে পাপিকুঞ্জ চেম্পনকুঞ্জের বাক্সটা খুলল। পঞ্চমীও ধারে কাছে ছিল না। আউসেপের কাছে নেওয়া টাকাটা থেকে একশ টাকার দুখানা নোট নিয়ে পাপিকুঞ্জ আবার বাক্সটা আগের মত তালা বন্ধ করে রেখে দিল।

সেইদিন রাতে পঞ্চমী দেখল যে ওর নতুন মা আর তার ছেলে ঘরের বাইরে পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে কি যেন গুজ্‌গুজ্‌ ফুসফুস করছে। পঞ্চমী একটা নারকোল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথা আড়িপেতে শোনার চেষ্টা করল। ও শুনতে পেল নতুন মা তার ছেলেকে অনুনয় করে বলছে :

'এখনকার মতো এই দুশ' টাকা নে বাবা। পরে আবার জোগাড় করে দেব।'

গঙ্গাদত্তন একটিও কথা না বলে টাকাটা আর মার আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেল। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের যাওয়া দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে পাপিকুঞ্জের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুখ মুছে পাপিকুঞ্জ ঘরে ফিরে এল।

পঞ্চমী এবার নতুন মাকে জব্দ আর অপদস্থ করার খুব বড় একটা অস্ত্র হাতে পেল। নতুন মা তার ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিয়েছে। টাকাটা যে ওর বাবার সযত্নে তুলে রাখা টাকা থেকে দেওয়া হয়েছে তা অবশ্য ও বুঝতে পারেনি কিন্তু টাকাটা যে ওদের বাড়ি থেকেই নতুন মা দিয়েছে সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ও বাবাকে বলবে সব কথা। বাবার হাতে টাকা না থাকায় বাবা

নৌকো আর জাল বন্ধক দিয়ে আউসেপের কাছে টাকা ধার করেছে আর এদিকে নতুন মার হাতে টাকা ছিল সেকথা বাবাকে একবারও বলেনি। আজ সেই টাকাটা নিজের ছেলেকে দিয়েছে। সেদিন আর পঞ্চমী কিছু বলল না। পরের দিন সকালে চেম্পনকুঞ্জ সমুদ্রতীরে গেলে পর পঞ্চমীও বাবার সঙ্গে গেল। একটু পরেই চেম্পনকুঞ্জ পাগলের মত ছুটতে ছুটতে ঘরে এল। এসেই বাক্স খুলল। দেখল দুশ টাকা কম। চেম্পনকুঞ্জ ভয়ানক ভাবে চীৎকার করে উঠল, 'এর থেকে দুশ টাকা তুই সরিয়েছিস হারামজাদী?'

পাপিকুঞ্জ সমস্তই স্বীকার করল। একটাও কথা না লুকিয়ে ও সব খুলে বলল। চেম্পনকুঞ্জ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার করে বলে উঠল, 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা হারামজাদী আমার বাড়ি থেকে।'

পাপিকুঞ্জ একটাও কথা না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। পঞ্চমী সমস্ত ব্যাপারটা খুব উপভোগ করতে লাগল। পাপিকুঞ্জ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও চেম্পনকুঞ্জ চীৎকার করতে লাগল, 'দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা, এ বাড়িতে তোর আর জায়গা নেই।'

পাপিকুঞ্জ বাড়ির বাইরে বেরোতেই চেম্পনকুঞ্জ ওর পেছনে দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'এ বাড়িতে আর কোনদিনও ঢোকার চেষ্টা করিস নি হারামজাদী। চেষ্টা করলে তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

পাপিকুঞ্জ কিছু বলল না। আস্তে আস্তে হেঁটে উপকূলের দিকে চলল। কিছুক্ষণ পরে সেই সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলে আশ্রয়হীনা একটি স্ত্রীলোককে দেখা গেল—কাণ্ডানকোরানের আগেকার বউ চেম্পনকুঞ্জের এখনকার জেলেনী পাপিকুঞ্জ।

পাপিকুঞ্জ চলে যাওয়ার পর কোথা থেকে যেন চেম্পনকুঞ্জের আবার সেই হারানো শক্তি আর উৎসাহ জেগে উঠল। বেশ কিছুদিন ওর এই শক্তি যেন চাপা পড়ে ছিল। ও মনে মনে ভেবেছিল যে ওর সমস্ত শক্তি, সমস্ত উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে গেছে কিন্তু তা নয় শক্তি সব চাপা পড়েছিল! আবার অনেকদিন পরে জেগে উঠল।

এদিকে পাপিকুঞ্জকে অমনিভাবে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার খবর সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। জেলেদের ঘরে ঘরে এই নিয়ে গল্পগুজবের আর শেষ রইল না। পাপিকুঞ্জ কারুর বাড়ি যায়নি। সমুদ্রের ধারেই একটা নারকোল গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। কোথায়ই বা যাবে? এ দুনিয়ায় কোথাও

যাবার জায়গা ওর নেই। চেম্পনকুঞ্জের যে মন শীগ্রি গলবে তার কোনও লক্ষণও নেই। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জ কিছু না ভাবলেও গাঁয়ের লোকেরা তো এমন সহজ-ভাবে সমস্ত জিনিসটাকে নিতে পারে না। পাপিকুঞ্জ একজন স্ত্রীলোক। অনাথিনী এক স্ত্রীলোক অসহায় ভাবে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা সকলেরই যেন কেমন কেমন ঠেকে।

বুড়ো জেলেরা সব তখন একজোট হয়ে মোড়লের কাছে গেল। পোন্নানি গাঁয়ের এক নামকরা পরিবারের মেয়ে এই পাপিকুঞ্জ। তাদের আত্মীয়তা গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে পর্যন্ত। পল্লীকুন্নাথ্ গ্রামের বড়লোক কাণ্ডানকোরানের বউ-এর চেম্পনকুঞ্জের পেছনে পেছনে চলে আসাটা মোড়লের প্রথম থেকেই ভালো লাগেনি। মনে মনে মোড়লের পাপিকুঞ্জের ওপর রাগই ছিল। পাপি-কুঞ্জ এমনিভাবে চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে ঘর করতে এসে তাদের মোড়ল পরিবারের সকলেরই মুখ পুড়িয়েছে। লাজলজ্জা সব বিসর্জন দিয়ে সমাজের নিয়ম-কানুন তাচ্ছিল্য করেছে যে মেয়ে, তার কথা শোনার ইচ্ছে তার একেবারেই নেই। মোড়ল বুড়োদের সোজাসুজি জানিয়ে দিল একথা। মোড়ল যে খুব রেগে গেছে তা এরা বুঝতে পারল কিন্তু বুড়োরা ছাড়ল না। ওরা মোড়লকে বলল :

'তাহলে আপনি কি বলতে চান যে একটা মেয়ে কোথাও জায়গা না পেয়ে এই সমুদ্দুরের ধারে দিনের পর দিন পড়ে থাকবে? সেটা কি ঠিক হবে? কখন কি কেলেঙ্কারি হয় তা কে বলতে পারে?'

মোড়ল তখন বলল, 'তাহলে বাপু তোমাদের যা খুশি তা কর। পারলে মাগীটার বা মিনসেটার মাথা কাটিয়ে সমুদ্দুরে ফেলে দাও।'

আয়ানকুঞ্জ তখন মাথা চুলকে সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে সেটা কি ঠিক হবে?'

'না হলে আমি কি করতে পারি?'

'আপনি চেম্পনকুঞ্জকে ডেকে বেশ করে ধমকে দিন।'

'আমার দ্বারা ওসব হবে না বাপু। তাছাড়া আমি চেম্পনকুঞ্জকে বলবই বা কি?'

'কিন্তু কিছু একটা না করলে চলবে না যে কর্তা। মেয়েটা এমনিভাবে একা গাছতলায় পড়ে রয়েছে, আমাদের কিছু না করলে সেটা যে অধর্ম হবে। আর আপনি ছাড়া এ সব কাজ করবেই বা কে?'

মোড়ল গাঁয়ের বুড়োদের এতগুলো কথার সামনে একটু বিচলিত হল। হাজার হোক গাঁয়ের ভালমন্দের ভার তার ওপরই নির্ভর করছে। হ্যাঁ, যাহোক্

একটা কিছু করতে হবে। মেয়েটা এক মোড়ল পরিবারের মেয়ে সেদিক দিয়েও দেখবার আছে। কিন্তু মুখে মোড়ল বলল :

'সমাজের আচার-বিচার না মেনে চললে এমনটিই হয়। একটা ভাল-লোকের হাতে পড়লে কি এমন অবস্থা হত? সোয়ামী মরে যেতেই ফট্ করে আবার বিয়ে করে বসল।'

'তা ঠিক'—বলে সকলেই ঘাড় নাড়ল।

পঞ্চমী খুব খুশি। মার জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছিল যে মেয়েমানুষটা সে এখন বিদায় হয়েছে। নতুন ম'কে সে ঝি ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবত না। সেই ঝিটা চলে গেছে, ও বেঁচেছে। একটা নোংরা জিনিস চলে যাওয়াতে বাড়িটাও যেন ঝরঝরে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন পঞ্চমী সবসময় বাবার কাছে বসে থাকতে পারবে। কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। ওর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, শুধু একটা কথা এখন বাবাকে ওর বলার আছে। সেই কথাটা বলার সুযোগ ও খুঁজতে লাগল।

কথাটা অবশ্য খুবই সামান্য। বাড়িতে এখন কেউ নেই। দিদিকে তাই শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? দিদি বাড়িতে এলে ওদের এই বাড়ি ঠিক আবার আগেকার মত হয়ে উঠবে। শুধু মা নেই—এইটুকু যা তফাৎ, তা দিদি থাকলে মার অভাবও সহ্য হবে। কিন্তু এই কথাটা বলার সুযোগই সে পাচ্ছে না। বাবা এক জায়গায় চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকে না। আর তাছাড়া বাবার মুখটা সব সময় গম্ভীর থমথমে।

আউসেপের কাছ থেকে টাকাটা পাওয়ার পর যে নতুন শক্তি আর উৎসাহ সে ফিরে পেয়েছে তাতে চেম্পনকুঞ্জ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চেম্পনকুঞ্জ আবার আগেকার দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেই অদম্য উৎসাহ নিয়ে খাটা আর নানাভাবে মাথা খাটিয়ে পয়সা উপার্জন করার চেষ্টা করার ইচ্ছেটা যেন আবার চাগিয়ে উঠেছে। আর একটা পরিবর্তন ওর স্বভাবে দেখা দিয়েছে, আজকাল সকলকে ও দোষ দিয়ে বেড়ায় আর পাপিকুঞ্জকে তো শাপশাপান্ত করে শেষ করছে। পাপিকুঞ্জ সর্বনাশী, তার ছায়া মাড়ালেও সর্বনাশ। যে সময়ে পাপিকুঞ্জকে বিয়ে করার জন্যে সে পাগল হয়ে উঠেছিল সেই সময়টাকেও এখন শাপমন্যি করতে লাগল।

'কি করে যে আমার অমন মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তা কে জানে। হারামজাদীর গায়ের রঙ, চুল আর চেহারা দেখে আমার বুদ্ধিবিবেচনা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

শুধু পাপিকুঞ্জ কেন কাক্সতাম্মাকেও সে গালাগালি করে! মুসলমান ছেলের সঙ্গে বিয়ের আগে পীরিত করল তারপর বিয়ের দিনই মা-বাপের কথা না ভেবে সুড়সুড় করে মদ্দের পেছনে ছুটল। হারামজাদী ওর মেয়ে নয়! কোনদিনও যে সে তার মেয়ে ছিল একথা সে ভুলেও মনে করবে না।

মাঝে মাঝে পঞ্চমীকে ও জিজ্ঞেস করে, 'হারামজাদী, তোর মতলবটাই বা কি?' পঞ্চমীকেও ওর বিশ্বাস নেই।

পাপিকুঞ্জকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করার প্রচেষ্টা করে চেম্পনকুঞ্জ। মাঝে কতকগুলো বোকামি করেছিল। সে সব ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন জীবন আরম্ভ করার কথা ভাবে সে।

নাল্লপেন্ন মানুষটা ভাল। আগে সে পাপিকুঞ্জের সঙ্গে কত ঝগড়া করেছে। পঞ্চমীকে লেলিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখন পাপিকুঞ্জের দুরবস্থা দেখে নাল্লপেন্ন তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নাল্লপেন্ন পাপিকুঞ্জকে ওর বাড়িতে জায়গা দিল দেখে পঞ্চমীর খুব দুঃখ হল। ধূমকেতুর মত ওর নতুন মা ওদের সংসারে পা দিতে না দিতে সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। যে মাকে ওর বাবা তাড়িয়ে দিল আর নাল্লপেন্ন খুড়ী নিজের বাড়িতে তাকেই ডেকে জায়গা দিল। আর কেউ দিলে হয়তো এতটা কষ্ট পঞ্চমীর হত না কিন্তু ওর মা মারা যাওয়ার সময় ওকে নাল্লপেন্ন খুড়ীর হাতে দিয়ে গেছে। সেই খুড়ী এমন কাজ করল? চেম্পনকুঞ্জেরও নাল্লপেন্নের এই কাজটা একটুও ভাল লাগল না। তবে আচ্চাকুঞ্জের নাকি তার ওপর বরাবরই হিংসে তাই তার তাড়িয়ে-দেওয়া বউকে তারা ইচ্ছে করেই ডেকে ঘরে জায়গা দিয়েছে।

পঞ্চমী সুযোগ খুঁজছিল বাবাকে দিদির কথাটা বলতে হবে। একদিন তাই সুযোগ পেয়ে ও বলল:

'বাবা, দিদিকে একবার নিয়ে এলে কেমন হয়? দিদি বেচারী সত্যিই ভাল মানুষ। পাজী লোকেরা ইচ্ছে করে দিদির নামে যাতা বলে বেড়ায়।'

চেম্পনকুঞ্জ মেয়ের কথা শুনে রাগে ফেটে পড়ল:

'কাকে নিয়ে আসার কথা বললি হারামজাদী! কাকে? কাকে শুনি?'

বাবার চোখমুখের ভাব দেখে পঞ্চমী ভয় পেয়ে গেল। চেম্পনকুঞ্জের রাগ তখনও পড়েনি। ও সমানে চেঁচিয়ে চলল, 'ঐ মুসলমান ছোঁড়াটা দেউলে হয়ে গেছে তবু এই সমুদ্দুর ছেড়ে এক পা নড়ে না। সারাক্ষণ এখানেই ঘুর ঘুর করছে। আমার বাড়িতে ঐ নষ্ট মেয়েকে আমি ঢুকতে দেব না। আর

বিচারকর্তা মোড়ল কথা না বলতে পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। চেম্পনকুঞ্জও এইরকম একটা উত্তর পাপিকুঞ্জের কাছ থেকে আশা করেনি। পাপিকুঞ্জ যেন নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে। একে তো আগেই বংশের মুখে কালি ঢেলেছে। মোড়ল ওর দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হেনে বলল, 'তোর বরাতে ঠিকই জুটেছে। তুই কার বউ ছিলি, কত বড় বংশের মেয়ে ছিলি, সেই তুই…'

মোড়ল কথাটা আর শেষ করল না। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের ঐ উদ্ধতভাব মোড়লের একটুও সহ্য হচ্ছিল না। একটুও ভয় না পেয়ে নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চেম্পনকুঞ্জ জিতে যাবে তা মোড়লের সহ্য হল না। মোড়ল তাই চেম্পনকুঞ্জকে বলল, 'ঝি হোক্ আর যাই হোক্ মেয়েমানুষতো—তাকে এমনি ভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, 'ও চোর।'

আবার মোড়লের বিস্ময়ের পালা।

কিন্তু এসব কথা যুক্তিপূর্ণ হলেও সত্যি কিছুই নয়। সকলেই জানে যে চেম্পনকুঞ্জ পাপিকুঞ্জকে বিয়ে করে এনেছে। মোড়ল তাই আর একটা রাস্তা ধরল। সে চেম্পনকুঞ্জকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'তোমার দেখি যে সাহস আজকাল একটু বেশিই হয়েছে। তুমি আজ এই যে ধাষ্টামোটা করলে তার ফলটা কি হবে জান?'

তার উত্তর ঠোট বেঁকিয়ে হেসে চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'জানবার আর আছেটা কি আর আপনিই বা কি আমাকে জানাবেন। এই চেম্পনকুঞ্জের সামনে সমুদ্দুর আর ওপরে আকাশ।' তারপর এক মিনিট থেমে বলল, 'আর কিছু জানার আর কিছু দেখার নেই, সমস্তই শেষ হয়ে গেছে। আমি আর এখন কারুরই তোয়াক্কা করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না এই আপনাকেই আমি স্পষ্ট বলছি আমি আর কারুর হুকুমই মানতে চাই না, কারুর কথা শুনতে চাই না। কিসের জন্যে কেন পরের তাঁবেদারি করব। ট্যাঁকে টাকা থাকলেই না রাস্তায় ভয়?'

মোড়ল গর্জন করে উঠল, 'গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ইয়ার্কি মের না চেম্পনকুঞ্জ।'

মোড়লের কথা শেষ হবার আগেই চেম্পনকুঞ্জ মোড়লকে তেড়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'যদি মান সম্মান বাঁচাতে চাও তো মুখ সামলে কথা বল!'

আজ পর্যন্ত মোড়লের মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ এমনিভাবে কথা বলেনি তাও আবার সকলের সামনে এমনি অপমান করে! এ অপমান শুধু মোড়লকে নয় গাঁয়ের সব লোকের করা। চেম্পনকুঞ্জ ভেবেছেটা কি! ওর কি মাথা সত্যিই

খারাপ হয়ে গেল ? কাল ওর কি অবস্থা হবে সে কথাও ভাবছে না। উপস্থিত জেলেরা সব থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

চেম্পনকুঞ্জ এরপর আর একটাও কথা না বলে ওখান থেকে চলে গেল।

মোড়লকে এমনিভাবে অপমান করে চেম্পনকুঞ্জ গটগটিয়ে চলে গেল। কেউ একটা কথাও বলতে পারল না। গাঁয়ের লোকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। পাপিকুঞ্জ এত কাণ্ডের পর চুপচাপ চেম্পনকুঞ্জের পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

পঞ্চমী একদিকে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখছিল, এখন নতুন মাকে বাবার পেছন পেছন যেতে দেখে ও হাঁ হয়ে গেল। ও তাহলে এতক্ষণ ধরে যা প্রার্থনা করছিল তা ফলল না আর আশ্চর্য ওর বাবাও তো নতুন মাকে তার পেছন পেছন আসতে বারণ করছে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরের দিন পঞ্চমীকে দেখতে পাওয়া গেল না। মেয়েটা যে কোথায় পালাল কেউ তার হদিশ পর্যন্ত পেল না। জেলেনীরা সব বলাবলি করতে লাগল যে মা-হারা মেয়েটা বাপের আর সৎমার খিঁচুনি সহ্য করতে না পেরে কোথাও নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার বলল মা-বাপেই ইচ্ছে করে মেয়েটাকে তাড়িয়েছে। আহা মা-মরা মেয়েটার দুর্গতির আর শেষ নেই।

কিন্তু এসব বললেও পাপিকুঞ্জ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ভালই ছিল। পাপিকুঞ্জ এত কিছু হেনস্তার পরও কেমন আবার চেম্পনকুঞ্জের পেছন চলে এল! জেলেনীরা বলল, 'মেয়েটা কিন্তু সত্যিই ভালো গা। এত কিছু কাণ্ডর পরও মেয়েটা চেম্পন-কুঞ্জকে ফেলে চলে যায়নি। মান সম্মান খুইয়েও মেয়েটা মিনসের সঙ্গে ঘর করছে। আর কেউ হলে থাকত না গা। মেয়েটা যে ভাল তাতে আশ্চর্যের আর কি আছে, কত বড় বংশের মেয়ে ও তা ত দেখতে হবে।'

মোড়লকে সেদিন সকলের সামনে অমনিভাবে হেনস্তা করাতে চেম্পনকুঞ্জের অবস্থা যে কি হবে তাই গাঁয়ের লোকেদের গল্পগুজবের অন্ত ছিল না। মোড়ল কি আর তাকে অমনি অমনি ছেড়ে দেবে। মোড়লের রাগ এখন সইতে পারলে হয়। কি ভাবে যে মোড়ল ওর এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে তার আঁচ অবশ্য কেউ পাচ্ছিল না। তাছাড়া শুধু মোড়লের রাগই বা কেন, ওর ভবিষ্যৎ যে কি হবে তা কেউ বুঝতে পারছিল না। জাল আর নৌকো হাতছাড়া হয়ে গিয়ে আউসেপের কবলে পড়েছে এখন কি ভাবে যে তার দুবেলা দুমুঠো জোগাড় হবে তাই বা কে জানে? শরীর আর মন ওর যে ভাবে ভেঙে পড়েছে তাতে মাছ মেরে আর ওকে খেতে হবে না। কি যে হবে চেম্পনকুঞ্জের তা কে জানে। চেম্পনকুঞ্জ তাদের গাঁয়ের লোক তাই হাজার অপরাধ করলেও তার ভালোমন্দে তারা মাথা না ঘামিয়ে থাকেই বা কি করে!

চেম্পনকুঞ্জকে নিয়ে যখন সকলে ব্যস্ত ছিল তখন সকলের অজান্তে আর একটা জীবন কেমন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছিল তা কেউ লক্ষ্য করেনি। সে জীবন আশাহীন উদ্দেশ্যহীন একটি জীবন। নীরকুন্নাথ সমুদ্র উপকূলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর এক জীবন।

সে জীবন পারীকুট্টির। নীরকুন্নাথ সমুদ্রের ধারে নৌকোগুলো ঠিক তেমনি

আগের মত তোলা রয়েছে, জালও শুকোতে দেওয়া হয়েছে। মাছের ছোট ঝাঁপগুলোও আছে। আছে উপকূলের জেলে আর জেলেনীরা। আর আছে পারীকুট্টি। পারীকুট্টিও সেই গাঁয়ের, সেই সমুদ্রতীরের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে মিশে আছে। মাঝে মাঝে ওই সমুদ্রের ধারে বাঁধা নৌকো-গুলোর ওপর বসে সে গান গায়। জেলেদের বিশেষ একটা গান। গান গেয়ে গেয়ে ও যেন সেই গানে একটা বিশেষ সুর বিশেষ ভঙ্গী এনেছে—সেটা ওর একান্ত নিজের। আর কেউ অমনভাবে সে গান গাইতে পারে না। সেই গান যে একদিন রচনা করেছিল সে কি কোনদিনও ভেবেছিল যে এমনি এক বিশেষ ভঙ্গীতে বিশেষ সুরে তার এই গান কেউ গাইবে? পারীকুট্টি ছাড়া এ গান এমনিভাবে আর কেউ হয়তো গাইতেও পারত না।

পারীকুট্টির মাছের ঝাঁপ ভেঙে মাটিতে ধসে পড়ে বালিতে মিশে গেছে, বিন্দুমাত্রও তার অবশিষ্ট নেই। নীরকুন্নাথের সেই সমুদ্রের ধারে এর আগেও অনেক মাছের ঝাঁপ উঠেছিল আর তা মাটিতে ধসেও পড়েছিল কিন্তু মাছের ঝাঁপ ধসে পড়ার পর মাছের কারবারীদের আর সেখানে দেখা যায় নি। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তারা অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু পারীকুট্টির ব্যবসা ডুবে গেলেও সে সেই সমুদ্রের ধার ছেড়ে আর অন্য কোথাও যায় নি। সেই সমুদ্রের তীরেই তার দিন কাটছে। এই বিশাল বিশ্বে কোথাও যাবার জায়গা হয়তো তার নেই তাই এমনিভাবে এই সমুদ্রের মাটি আঁকড়ে সে পড়ে আছে। কিন্তু সত্যিই কি তার যাবার জায়গা নেই?

সন্ধেবেলায় প্রায়ই পারীকুট্টি মুখ নীচু করে সমুদ্রের ধারে ধারে আনমনা হয়ে হাঁটতে থাকে। ওর হাঁটা দেখে মনে হয় ও যেন সমুদ্রের বালিতে কি হারিয়ে ফেলেছে আর সেই হারানো জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। সত্যিই হয়তো ও কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওর জীবনই যে ভেঙেচুরে বালির সঙ্গে মিশে গেছে। সেই হারানো জীবনের কণাই সে এখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আগে আগে পারীকুট্টিকে নিয়ে সেই সমুদ্রের ধারে কথার আর অন্ত ছিল না। ও নাকি কারুতাম্মাকে রেখেছিল কিন্তু বেশিদিন লোকে এ নিয়ে গল্পগুজব করেনি। এ নিয়ে আর বেশি কথা বলার কি আছে? সমুদ্রের ধারে এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কত মাছের কারবারীরা এমনিভাবে কত মেয়েমানুষকে রাখে আর এখনও রাখছে। তখন অবশ্য তা নিয়ে লোকে বলাবলি করে কিন্তু তা মাত্র কদিনের জন্য। তারপর তারা এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। পারীকুট্টির ব্যাপারটাও এমনি একটা। তাদের কারুরই কাছে পারীকুট্টি আর কারুতাম্মার ভালবাসার

বন্ধন চোখে পড়েনি। তারা ভাবতেই পারেনি যে এক মুসলমান মাছের কারবারী এক জেলের মেয়েকে ভালবাসতে পারে। ভালবাসাটা যে অসম্ভব তা নয় কিন্তু আজ পর্যন্ত এমনটি হয়নি বলে তারা এদিক দিয়ে কিছু ভাবতে পারেনি। তাদের ধারণা ছিল যে যৌবনের ক্ষিধে মেটানোর জন্যে পারীকুট্টি আর কারুতাম্মা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছিল। কিন্তু ওরা যে পরস্পরকে ভালবেসেছিল আর তাদের সেই ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তা কেউ জানতেও পারেনি। তাই কেমনভাবে যে পারীকুট্টির দিন কাটছে সে খবর নেওয়ার কেউ চেষ্টা করেনি। আজও নৌকোগুলো মাছ ধরে যখন তীরে ফিরে আসে পারীকুট্টি সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, কেনাবেচা করে। কখনও মাছের দালালি করে দুবেলা দুটো খাওয়ার পয়সাও জোগাড় করে। সকলে ওকে দুবেলাই সমুদ্রের ধারে দেখতে পায়; কিন্তু ওর অন্তরের খবর রাখার জন্যে কেউই মাথা ঘামায় নি।

কখনও কখনও পারীকুট্টি তীরে বাঁধা চেম্পনকুঞ্জের নৌকোগুলোর কাছে গিয়ে বোবা দৃষ্টি মেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে। হয়তো পুরোনো স্মৃতিগুলো একের পর এক চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছোটছোট কত স্মৃতি মনের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করে আর সেই সঙ্গে নৌকো কেনার ইতিহাসের কথাও মনে পড়ে কেমনভাবে চেম্পনকুঞ্জে ঐ নৌকো কিনল।

একদিন এমনিভাবে যখন পারীকুট্টি নৌকোর সামনে দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ চেম্পনকুঞ্জের গলা শুনে ও চমকে মুখ তুলে তাকাল। নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকায় চেম্পনকুঞ্জের আসাটা ও দেখতে পায়নি।

অনেকদিন হল পারীকুট্টি চেম্পনকুঞ্জের সামনাসামনি হয়নি। দূর থেকে চেম্পনকুঞ্জকে দেখলেই পারীকুট্টি ওর পাশ কাটিয়ে যেত যেন ও চেম্পনকুঞ্জের কাছে এক মহা অপরাধ করে ফেলেছে, তাই তার মুখোমুখি হতে চায় না। পারীকুট্টি যখন নিজেকে বিশ্লেষণ করে তখন ওর মনে হয় সত্যিই কি ও চেম্পনকুঞ্জের কাছে কিছু অপরাধ করেনি? তার মেয়েকে ভালবাসাই যে একটা মস্ত বড় অপরাধ।

চেম্পনকুঞ্জকে আজ তাই হঠাৎ ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পারীকুট্টি একটু ঘাবড়ে গেল। কিন্তু চেম্পনকুঞ্জের চেহারা দেখে ও অবাক হয়ে গেল। ওর সামনে যে চেম্পনকুঞ্জ দাঁড়িয়ে আছে সে সেই আগের চেম্পনকুঞ্জ নয়। চেম্পনের সেই বিরাট স্বাস্থ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, অবশিষ্ট আছে ছায়া মাত্র। আর চেম্পনকুঞ্জের চোখের দিকে তাকিয়ে এক নিমিষে পারীকুট্টি বুঝতে পারল যে চেম্পনকুঞ্জের মাথার ঠিক নেই। চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্তের

মতো। ঠিক তেমনিভাবে চেম্পনকুঞ্জও দেখল যে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পারীকুট্টি নয় তার কঙ্কাল। কয়েক মুহূর্ত তারা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হঠাৎ চেম্পনকুঞ্জ পারীকুট্টির দিকে একটা প্রশ্ন যেন ছুঁড়ে মারল, 'আমার কাছে তুমি কত টাকা পাবে ?'

টাকার কথাটা পারীকুট্টির একেবারেই মনে ছিল না, ও জানেনা কতটাকা ও পাবে। কোন হিসেবই তার কাছে নেই। চেম্পনকুঞ্জ আবার জিজ্ঞেস করল, 'কত পাবে ?'

পারীকুট্টি কি যে বলবে ঠিক করে উঠতে পারল না। ওর কিছুই পাওয়ার নেই, চেম্পনকুঞ্জেরও কিছুই দেওয়ার নেই। চেম্পনকুঞ্জের কাছে ওর কতকিছুই বলার আছে কিন্তু বলতে ভয় করে। পারীকুট্টি তাই কিছু না বলে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন ওইই দেনাদার, পাওনাদার এসে ওকে টাকার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে।

পারীকুট্টি মনে মনে ভাবতে লাগল কেন সে টাকা দিয়েছিল। কারুতাম্মা আর সে পরস্পরকে ভালবেসেছিল। তাদের সেই ভালবাসা ছিল পবিত্র শুদ্ধ, তাতে খাদ ছিল না, কলঙ্ক ছিল না। তাদের সেই প্রেম যখন গভীর হয়ে দানা বেঁধেছিল তখন চেম্পনকুঞ্জ আর চাকীকে সে এই টাকা ধার দিয়েছিল। কিন্তু টাকা দেওয়ার সময় তো সে এই মনে করে দেয়নি যে সে টাকা ও আবার ফেরত পাবে। তাহলে কি তার অবচেতন মন চেয়েছিল যে এই টাকা দিয়ে সে কারুতাম্মার মা আর বাবার মন নরম করে দিয়ে তাদের প্রেমবন্ধন আরও দৃঢ় করে তুলবে ? টাকা দিয়ে কি তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল সে ? তাদের মেয়েকে পাওয়ার জন্যে সে ঘুষ দিতে চেয়েছিল ? না, এসব সত্যি নয়। পারীকুট্টি একমুহূর্তের জন্যেও টাকা দিয়ে কারুতাম্মাকে বশ করতে চায়নি। এমনিভাবে বশ করার দরকারও হয়নি। ওরা আপনা থেকেই দুজন দুজনকে মন দিয়ে ফেলেছিল। যখন কারুতাম্মাকে আর একজন তার নিজের করে নিয়ে চলে গেল তখন তো সে টাকাটা চাইতে পারত। আর যদি তাও না হয় তাহলে ওদের কাজ হয়ে যাওয়ার পর তো টাকাটা ফিরে চাইতে পারত। কারুতাম্মা চেয়েছে বলে টাকাটা দিয়েছে এই কথা ওঠে যদি তাহলেও তো লুকিয়ে চুরিয়ে ও কিছু দেয়নি।

টাকাটা দেওয়ার ফলে পারীকুট্টি আজ দেউলে হয়ে গেছে। দেউলে মানে সত্যিই দেউলে। এখন তার নিজের বলতে আছে পরবার এই ধুতিটি মাত্র। ওর জমিজায়গা সব অন্যের হাতে। শুধু যে আর্থিক ক্ষতিই তার হয়েছে তা নয়

মনের দিক দিয়েও তার যা ক্ষতি হয়েছে তার কোন তুলনা নেই। জীবনটা যেন ওর এখন এক ধূসর উষর মরুভূমি। বর্তমান সম্বন্ধে চিন্তা নেই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা নেই, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন।

এখনও কি আবার ছোট্ট করে মাছের ব্যবসা শুরু করে জীবনটাকে নতুন ভাবে গড়া যায় না? যতদিন না মরণ এসে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেয় ততদিন জীবনটাকে টেনেটুনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছু করা। কারুতাম্মা তো আর কোনদিন তার হবে না। জীবনের সেই অধ্যায়গুলোকে ভুলে যাওয়াই ভাল। জীবনে যখন বড় একটা দুঃখকষ্ট আসে তখন সমস্ত জীবনের গতিই বদলে যায়, মানুষই বদলে যায়। কিন্তু পারীকুট্টি এতটুকুও বদলায়নি, সে কারুতাম্মাকে ভুলতে পারছে না। ও আজও কারুতাম্মাকে ভালবাসে। জীবনটা আগাগোড়া বদলে গেলেও কারুতাম্মার ওপর তার ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি।

পারীকুট্টিকে কোনও উত্তর না দিতে দেখে চেম্পনকুঞ্জ ওর ট্যাঁক থেকে একটা গেঁজে বার করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা পাবে?'

পারীকুট্টি কোনও উত্তর দিতে পারল না। অপরাধীর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চেম্পনকুঞ্জ ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল:

'তোমাকে আমি ভালো লোক বলেই জানতাম। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি আসলে তুমি তা মোটেই নও।'

পারীকুট্টি ভালো লোক নয়? কিন্তু পারীকুট্টির অপরাধটা কি? ও কি কারুতাম্মাকে প্রবঞ্চনা করেছে? ওর বিয়েতে ঝগড়া বাধিয়েছে? বিয়ের পর যখন সে তার স্বামীর ঘর করতে গেছে তখন কি তার জীবন অশান্তিতে ভরে তুলেছে? কি করেছে সে? এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন ওর মনে ঠেলে উঠলেও একটা প্রশ্নও সে চেম্পনকুঞ্জকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

ওর অপরাধ ও সত্যসত্যি কারুতাম্মাকে ভালবেসেছে, ভালবাসার অভিনয় করেনি। ছেলে হয়ে একটি মেয়েকে ভালবেসেছে। ভালবাসার পর সেই মেয়েকে যখন নিজের করে পায়নি তখন তার জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ভালবাসার জন্যে এত ত্যাগ স্বীকার করেও এত কষ্ট সহ্য করেও সে আজ অপরাধীর মতো চেম্পনকুঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেম্পনকুঞ্জ তখনও ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করল:

'তুমি সেদিন আমার মেয়ের জন্যেই আমাকে টাকাগুলো দিয়েছিলে, তাই না?'

'না'—এই শব্দটা গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েও আসতে পারল না।

একবার না বললেই চেম্পনকুঞ্জের ওকে এমনি ভাবে দোষী প্রতিপন্ন করার ভুল ভেঙে যায় কিন্তু পারীকুট্টি না বলল না। চেম্পনকুঞ্জ আবার বলল :

'চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার যা কিছু ছিল সব উজাড় করে দিয়েছিলে—কোনও প্রশ্ন করনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি ভালো লোক, পরের উপকার করতে চাও তাই দিয়েছিলে। কিন্তু তা তো নয়—তোমার মতলব ছিল আলাদা।'

তারপর গেঁজেটা খুলে টাকা গুণতে গুণতে বলল, 'তুমি আমার কতবড় ক্ষেতি করেছ তা বোধ হয় তুমি ধারণায় আনতে পারবে না।'

পারীকুট্টি ওর এতবড় অভিযোগের কোনও উত্তর না দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, নির্বিকার, নিশ্চল। চেম্পনকুঞ্জের চোখের পাতা তখন ভিজে এসেছে। 'তুমি বুঝতে পারবেনা, তুমি বুঝতে পারবেনা, তুমি মানুষ নও পিচেশ্—কি করেই বা বুঝবে তুমি ?'

পারীকুট্টি এত বড় গাল খেয়েও কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চেম্পনকুঞ্জ এবার চীৎকার করে উঠল :

'তুমি আমাদের একটা পরিবারকে ধ্বংস করেছ। আমার সর্বনাশ করেছ। শুধু আমার কেন আমার পরিবারের সকলের সর্বনাশ করেছ।'

চেম্পনকুঞ্জের এই দোষারোপের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে। ওদের ঐ পরিবারের ইতিহাস দেখলে এ কথার সত্যতা বোঝা যায়। একটা নৌকো আর জাল কেনার জন্যে চাকীর সেই অকথ্য পরিশ্রম, তারপর মেয়ের সেই ভালবাসার কাহিনী জানাজানি হওয়ার পর তার ধকল সহ্য করা, আস্তে আস্তে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া—এ সব কিছু দেখলে চেম্পনকুঞ্জের কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

চেম্পনকুঞ্জ নিজেকে সামলাতে না পেরে ভাঙা গলায় বলে উঠল :

'এই সমুদ্দুরের ধারে চাকী একদিন ছুটে ছুটে খেলে বেড়াত। চাকীর মতোই কারুতাম্মাও এখানে খেলা করে বেড়াত। আমার সেই মেয়েকে তুমি নষ্ট করেছ। সেই ছোট্ট বেলায় যেদিন থেকে তুমি তার সঙ্গে খেলতে এলে সেদিন থেকে তার সর্বনাশ করেছ।'

কথাটা ঠিক—পারীকুট্টি যদি কারুতাম্মাকে ভাল না বাসত তাহলে এসব কিছুই ঘটত না। ওদের অভাবহীন গুছোনো পরিবারের অন্যান্য আর পাঁচটা পরিবারের মতোই কাটত। চেম্পনকুঞ্জের মতো শক্তসমর্থ এক জেলের জীবন এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেত না।

চেম্পনকুঞ্জের আজ নিজের বলতে কি আছে, কিছুই নেই। ছেলেমেয়ে

নেই, গোটা জীবনটা খেটেখুটে যে জাল আর নৌকো করল তাও আজ পরের হাতে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আজ কেউই নেই তার। থাকার মধ্যে আছে নৌকো আর জাল বন্ধক রাখার পাঁচশ পঁচানব্বইটা টাকা। আর আছে পুরোনো একটা দেনা।

একটা উই পোকার মতো তাদের পরিবারে ঢুকে পারীকুট্টি তাদের কুরে কুরে খেয়েছে। ওদের সাধের কুসুম ফুটতে না ফুটতে অকালে ঝরে গেছে। চেম্পনকুঞ্জ যা বলছে তা সত্যি। অতি কুক্ষণে পারীকুট্টি তার বাবার হাত ধরে প্রথম সেই সমুদ্রের ধারে এসেছিল। সেই দিন থেকেই চেম্পনকুঞ্জের সংসারে শনির দশা এসে উপস্থিত হয়েছে। সে এক অভিশপ্ত দিন। চেম্পনকুঞ্জের বেশ মনে আছে নৌকোগুলোর কাছে কুঁচো মাছ কুড়োতে কুড়োতে কারুতাম্মা তার ছোট্ট দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে পারীকুট্টির দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিন কারুতাম্মা একটা লালচে রঙের শাঁখও কুড়িয়ে পেয়েছিল। পারীকুট্টি কারুতাম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'শাঁখটা আমায় দেবে ?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে কারুতাম্মা শাঁখটা দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এতে পারীকুট্টির কি দোষ। ওতো ওদের সর্বনাশ করবে বলে ওদের পরিবারে ঢোকেনি। ওর অজান্তে কে যেন ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন ওকে চেম্পনকুঞ্জ যা খুশি বলে দোষারোপ করতে পারে। দোষ স্বীকার করবার জন্যেই যেন ও অবনতমুখে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওর সত্যিকারের অবস্থা কে জানবে ? কি করে জানাবে। জানে শুধু একজন—সে কারুতাম্মা। কিন্তু সেও কি আজ পূর্ণ সত্য স্বীকার করবে ? আজ যদি হঠাৎ ওর কারুতাম্মার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে কি ওর সঙ্গে কথা বলতে কারুতাম্মা ভয় পাবে না ? হ্যাঁ, কারুতাম্মা এখন ওকে দেখলেই ভয় পাবে। কারুতাম্মা এখন ওর সংস্রব পরিহার করতেই চায়। কোনদিন যে ওর সঙ্গে কারুতাম্মার কোনও সম্পর্ক ছিল তা বোধহয় সে আজ স্বীকার করবে না।

চেম্পনকুঞ্জ বলল, 'আমার শুধু একটা কাজ বাকি আছে—তোমার দেনাটা শোধ করা। তোমার যে টাকা দিয়ে তুমি আমার সর্বনাশ করেছ, আমার মেয়েকে নষ্ট করেছ সেই টাকাটা আজ আমি ফেরত দিতে চাই। এই নাও।'

চেম্পনকুঞ্জ টাকাটা এগিয়ে দিল। পারীকুট্টি ঠিক সেই আগের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেম্পনকুঞ্জ আবার বলল, 'নাও, তোমার টাকাটা ধর, —বলে এমন একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল যে পারীকুট্টি ভয় পেয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। চেম্পনকুঞ্জ টাকাটা ওর হাতে গুঁজে দিল। তারপর বলল, 'এখন

আমার হাতে এই টাকাটাই আছে। তুমি কত টাকা দিয়েছিলে আমি তার হিসেব রাখিনি। তার হিসেব চাকী জানে। যদি এতে তোমার পাওনা টাকার কম থাকে তাহলেও আমার কিছু করার নেই'—বলে চেম্পনকুঞ্জ হাঁটতে শুরু করল।

পারীকুট্টি টাকাটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ও যেন কিছুই বুঝতে পারছে না; কিছুই ওর নজরে আসছে না। হাতে যে টাকাটা রয়েছে তাও যেন ওর খেয়াল নেই।

টাকা দিয়ে ওর কি হবে? কি করবে ও টাকা দিয়ে? কোন পথই তো তার সামনে খোলা নেই। সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ানো আর দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করা, তার জন্যে এত টাকা কেন? টাকা? কত টাকা ও নষ্ট করেছে। শুধু কি টাকা, সমস্ত জীবনটাই কি ও নষ্ট করেনি?

কিন্তু সেদিন দুমুঠো চাল কেনার পয়সাও তার হাতে ছিল না। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে টাকাটা খুবই দরকারী। এমনিভাবে আরও হয়তো অনেকদিন ওর জীবনে আসতে পারে যখন ওকে দুটো পয়সার জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে হবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে টাকাটার সংখ্যা যে অনেক বড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পারীকুট্টি ওর হাতের দিকে তাকাল। হাতটা টাকাটাকে চেপে ধরে আছে। হাওয়া লেগে নোটগুলো পত্‌পত করছে। এই টাকাগুলোকে সে তো কোনদিন নিজের টাকা বলে ভাবেনি। এ টাকা তো কোনদিন সে ফেরত পাবার কথা ভাবেনি। যে টাকা ও নিজের টাকা বলে ভাবেনি সে টাকা ফেরত পেলেও সে কি করে নিজের টাকা বলে ভাববে। কিন্তু ওরই যদি না হয় ওর হাতের পাতায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে যে নোটগুলো সেগুলো তাহলে কার?

হঠাৎ একটা অট্টহাসি শুনতে পেয়ে পারীকুট্টি চমকে তাকাল। কিছু দূরেই রয়েছে কাণ্ডানকোরানের কাছে কেনা চেম্পনকুঞ্জের নৌকো। আজ কতদিন নৌকোটা তীরে তোলা রয়েছে। অনেক দিন হল নৌকোটা বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—অনেকদিন। নৌকোটার হালের দিকটা উঁচু হয়ে আছে। নৌকোটা যেন তার মাথাটা উঁচু করে সমুদ্রের দূর চক্রবালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সেই দূর চক্রবাল থেকে নৌকোটাকে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঐ দূর চক্রবাল, ঐ মাঝসমুদ্র এ সব যে তার খুবই চেনা। তার জায়গা যে সমুদ্রে। তার জন্মই তো ঐ সমুদ্রের জন্য।

মায়ের বুক ছেড়ে কতদিন সে আর এমনিভাবে তীরে পড়ে থাকবে, কতদিন হয়ে গেল সে এই ভাবে পড়ে আছে। সমুদ্রের কোলে ছুটোছুটি নাচানাচি করার জন্যে নৌকোটা যেন ছট্‌ফট্ করছে। কেউ যদি সামান্য একটু ঠেলা দিয়ে দেয় তাকে তাহলে সে লাফিয়ে সমুদ্রের বুকে গিয়ে পড়বে। তারপর আর দেখতে হবে না। ঢেউএর বুকে নাচতে নাচতে আর খিলখিল করে হাসতে হাসতে দূর সমুদ্রে সে পাখির মতো উড়ে চলে যাবে।

নৌকোটা যেন আপনার মনে বিড়বিড় করে বলছে, 'কতদিন কতদিন আমাকে এমনিভাবে বালির ওপর ফেলে রেখেছে। দেখ না সারা গা আমার খস্‌খস্ করছে। রোদে আমার পাঁজরাগুলো ফেটে যাচ্ছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে। আমাকে কবে যে ঐ নীল সমুদ্রের বুকের ওপর ভাসতে দেবে কে বলবে? কবে যে আমি ঐ ঢেউগুলোর ওপর হাসতে হাসতে নাচানাচি ছোটাছুটি করব তা কে জানে।'

এমনিভাবে আরও কত কি বলার আছে ওর। মাঝে মাছে সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে যায়, সান্ত্বনা দেয় ওকে। নৌকোটা একদিন ছিল কাণ্ডানকোরানের তারপর হল চেম্পনকুঞ্জের। ঐ সমুদ্রের ধারে যে কটি নৌকো ছিল তাদের সবার চেয়ে বেশি মাছ উঠত এই নৌকোটাতে। নৌকোটা ছিল শ্রীমন্ত। সমুদ্রে নামলেই সে পাখির মতো উড়ে চলত, আর আজ তাকে বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে।

নৌকোটার একদিক্ উঁচু হ'য়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল আর একদিক বালিতে মুখ গুঁজে পড়েছিল। নৌকোর সেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার দিক থেকেই অট্টহাসি শোনা যাচ্ছিল। পৈশাচিক অট্টহাসি। চেম্পনকুঞ্জ পাগলের মতো হাহা করে হাসছিল।

দিদি আর ছোট বোন একসঙ্গে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। কতক্ষণ যে তারা পরস্পরকে এমনিভাবে জড়িয়ে ধরে রইল তা তারা নিজেরাই জানতে পারল না। দুজনের চোখেই জল। বাবার গালাগালি খেয়ে কারুতাম্মা চলে এসেছিল। সে যখন পালানির পেছনে পেছনে চলে আসছিল তখন পঞ্চমীর 'দিদি' ডাক অনেকক্ষণ অবধি তাকে অনুসরণ করেছিল। ত্রিকুন্নাপুড়ায় বসে কারুতাম্মা সে ডাক বার বার শুনতে পেয়েছিল। কারুতাম্মা নীরকুন্নাথ ছেড়ে আসার পর কত কি ঘটে গেছে। মা মারা গেলে, নতুন মা এল আর নতুন মা এল বলেই এমনিভাবে পঞ্চমীর সঙ্গে তার দেখা হল।

পঞ্চমী চেয়েছিল বাবার মন বিষিয়ে দিয়ে নতুন মাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে কিন্তু তা সম্ভব হল না দেখে নিজেই বাড়ি ছেড়ে সোজা দিদির কাছে চলে এসেছে। দিদির কাছে ছাড়া আর যাবেই বা কোথায়? পঞ্চমী যে এই ভাবে আসতে পারে কারুতাম্মা তা ভাবতেই পারেনি। এমনি আকস্মিকভাবে পঞ্চমীকে কাছে পেয়ে কারুতাম্মার আনন্দের আর সীমা ছিল না। দুইবোন তাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সুখের কান্না কাঁদছিল আর তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল পালানি। ওর কোলে ওর বাচ্চা মেয়েটাও হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। বাচ্চাটাও যেন দুবোনের এই মিলনদৃশ্য উপভোগ করছিল।

পালানি কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আরে, এযে দেখি পঞ্চমী। তুই কখন এলি?'

পঞ্চমী কিছু বলার আগেই কারুতাম্মা বাচ্চাটাকে স্বামীর কোল থেকে নিল। বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কারুতাম্মা বলল, 'বাবা, মেয়ের যে দেখছি মাসীর ওপর খুব টান।'

পঞ্চমী বাচ্চাটাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। এই বাচ্চাটাকে কতদিন ও স্বপ্নে দেখেছে। এখন কাছে পেয়ে চুমো খেয়ে আর ওর সাধ মিটছে না।

পালানি কিন্তু পঞ্চমীকে শ্বশুরবাড়ির একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না। নীরকুন্নাথের খবর জানার ওর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। ওর যেন ওই গাঁয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক কোন বন্ধন নেই।

কিন্তু কারুতাম্মার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে, জানার আছে। পঞ্চমীরও অনেক কিছু বলার আছে, শোনানোর আছে। কিন্তু কারুতাম্মা যা জানতে চায়, যা শুনতে চায় পালানির তা মোটেই ভাল লাগে না। শুধু ভালো লাগা কেন ওর একরকম ঘৃণাই হয়। নীরকুন্নাথ নামটা পর্যন্ত যেন ও সহ্য করতে পারে না। শুধু হয়তো পঞ্চমীর ওপর ওর কোন রাগ নেই। বেচারী পঞ্চমীর কি দোষ। ওকে ঘৃণা করে কি লাভ, ও নিরপরাধ। কিন্তু ও আসছে কোথা থেকে? ও এনেছে কার খবর? পালানি তাই এক অনাথা অসহায়া মেয়ে পঞ্চমীকে দেখল না। ও দেখল পঞ্চমী এমন জায়গা থেকে এসেছে যে জায়গার লোকগুলোকে সে ঘৃণা করে। পালানি নিশ্চয়ই জানে যে পঞ্চমী এমন জায়গা থেকে এসেছে এমন কতকগুলো খবর এনেছে যা শোনার জন্যে কারুতাম্মা অধীর হয়ে আছে। আর ঠিক এই জন্যেই পালানি পঞ্চমীকে সহ্য করতে পারছে না। ওর মনে হচ্ছে পঞ্চমী ওর বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো ছায়াও যেন ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। পঞ্চমীকে দেখে কারুতাম্মার কত স্মৃতি মনে পড়বে, কত কি জিজ্ঞেস করবে, বিশেষ কারুর

কথা জানতে চাইবে।

পঞ্চমীর আগমন তাই পালানির এতটুকুও ভাল লাগল না। এতদিন ওদের পরিবারে যে শান্তি ছিল তা যেন অবসান হবার দিন এল। কেমন যেন একটা গুমোট আবহাওয়ায় সবকিছু থমথম্ করতে লাগল। হঠাৎ বাচ্চাটার আধোআধো বুলি ঐ ঘন কালো মেয়ের বুকে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক্ খেলিয়ে দিল। কিন্তু সে একমুহূর্তের জন্যে, পরমুহূর্তে বাচ্চাটি কেঁদে উঠল। বাচ্চাটা কখনও কাঁদে না, তাকে কাঁদানোও হয় না কিন্তু এখন সে কাঁদতে লাগল। পঞ্চমী তখন বলল, 'দিদি, বাচ্চাটাকে কাঁদাস না।' বলে ও দিদির কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে ভুলোতে লাগল। বাচ্চাটা মাসীকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই চিনে ফেলেছে, পঞ্চমীর কোলে গিয়ে সে কান্না থামল।

পালানির সামনে কারুতাম্মা পঞ্চমীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। অনেক কিছুই তার পঞ্চমীকে জিজ্ঞেস করার আছে। প্রশ্নের ঠেলায় তার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলোচ্ছে না। পালানির অজান্তে সব কিছু জানতে হবে, শুনতে হবে। কিন্তু এখন অবধি সে সুযোগটুকু ও পেল না। পালানিও ওখান থেকে নড়ছেনা। হয়তো কারুতাম্মা কি জিজ্ঞেস করে পালানি তাই জানতে চায়। যদি জানতেই চায় তাহলেও পালানিকে দোষ দেওয়া যায়না কেননা পালানি তার স্বামী, তার সন্তানের পিতা। কারুতাম্মা অবশ্য স্বামীকে তার কথা সব বলেছে আর তারপর কথা দিয়েছে যে আর কোনদিন সে ভুল করবে না, অন্যায় করবে না। কিন্তু তবু একদিন সে তার মন অন্য আর একজনকে দিয়েছিল। সেখানে এখনও যে সেই মুসলমানটা তার আসন পেতে নেই তা কি নিশ্চয় করে কিছু বলা যায়। আর যদি নাও থাকে তবু কারুতাম্মার জীবনে যে ঘটনা একদিন ঘটে গেছে তাই নিয়ে যে কোন স্বামীরই তার স্ত্রীর চরিত্রের ওপর সন্দেহ থাকবে। পালানি তাই ভাবল যে কারুতাম্মা নিশ্চয়ই পঞ্চমীর কাছে পারীকুট্টির কথা জিজ্ঞেস করবে। কি কথা ও জিজ্ঞেস করতে পারে—তাই ভাবতে ভাবতে কারুতাম্মার ওপর ওর রাগটা আরও বেড়ে গেল।

আগে ওদের ঝগড়া হত না কিন্তু আজকাল কারণে অকারণে ওদের ঝগড়া বাধে। অতি অল্পেই পালানি রেগে যায়। জেলে-জেলেনীদের মধ্যে যেমন খিটিমিটির আর অন্ত নেই কারুতাম্মা আর পালানিও অন্য জেলে-জেলেনীর মতো পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়।

এরই মধ্যে একবার সুযোগ বুঝে পঞ্চমী আস্তে আস্তে বলল, 'দিদি, তোর কি

কঠিন প্রাণ রে ?'

'কেন রে ?'

'কই বাবার কথা তো একটা কিছুই জিজ্ঞেস করলি না।'

কারুতাম্মা ফিসফিস্ করে উঠল, 'চুপ্ চুপ্ ও শুনতে পাবে।'

সেদিনই পালানি কারুতাম্মাকে জানাল, সন্ধের দিকে ও একটু তাড়াতাড়ি বেরোবে বঁড়শি ফেলতে। বলে বঁড়শির টোপ সব ঠিক করতে লাগল। কারুতাম্মা তাড়াতাড়ি রান্না করতে বসল। মনে একটা আশ্বাস যে পালানির অনুপস্থিতিতে পঞ্চমীকে ও দুচার কথা জিজ্ঞেস করতে পারবে। সন্ধেবেলায় পালানি দড়ি আর ছিপ নিয়ে নৌকো ভাসাল, মা আর মেয়ে তীরে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল। বাচ্চাটা বাবার দিকে তার ছোট ছোট হাতদুটো নাড়তে লাগল। রোজ এমনিভাবে ও বাবাকে বিদায় দেয় আর নৌকোয় বসে বাবাও রোজ তার কাছে হাত নেড়ে বিদায় নেয়। কিন্তু আজ আর বাবা হাত নাড়ল না। নৌকো সমুদ্রে নেমেই পশ্চিম দিকে চলল। মনে হল পালানি যেন নৌকোটাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। বাবা আজ আর তার দিকে তাকাল না দেখে বাচ্চাটা কাঁদতে লাগল।

পালানি চলে যাবার পর দিদি আর বোন একসঙ্গে হল। পঞ্চমী বেশ রসিয়ে ফলিয়ে নানা রকম গল্প করছে। ওদের মায়ের মৃত্যু, নাল্লপেন্নে খুড়ীর হাতে মার ওকে তুলে দেওয়া। মার মরার সময় বাবাকে আবার বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া সব এক এক করে বলল। তারপর বলল, 'জানিস দিদি, ছোটমিয়া, পারীকুট্টি, একদিন মাকে দেখতে এসেছিল।'

শুনেই কারুতাম্মার বুক ধক্ করে উঠল। ও যেন শোনেই নি এমনি ভান করে পঞ্চমীকে আর একটা কি যেন জিজ্ঞেস করল। পঞ্চমী একটু অবাক্ হয়ে বলল, 'সে কিরে দিদি, তুই ছোটমিয়ার কথা শুনতে চাস না ?'

কারুতাম্মা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'মা মরে যাওয়ার পর আমাকে তোরা একটা খবর দিলি না কেন রে ?'

'বারে সকলে যে বারণ করল !'

'সকলে ?'

'হ্যাঁ, সকলে তোর নামে নিন্দে করছিল। তা যাই বল্ দিদি তোর খুব কঠিন প্রাণ। মাকে ঐ অবস্থায় দেখে চলে এলি। তোর দয়ামায়া একটুও নেই।'

তারপর পঞ্চমী নতুন মা পাপিকুঞ্জকে নিয়ে অনেক কথা বলল। তার মধ্যে

একটা গুরুতর কথাও—'জানিস দিদি, আমাদের সেই নৌকো আর জাল নেই। বাবা আউসেপের কাছে নৌকো আর জাল বাঁধা রেখে টাকা নিয়েছে আর সেই টাকা নতুন মা ওর ছেলেকে দিয়েছে।' তারপর কেমন ভাবে দিল, তারপর কি হল সব একে একে বলল।

কারুতাম্মার চোখে ভেসে উঠল পাখির মতো উড়ে-যাওয়া সেই নৌকোটার ছবি। বাবা হালে বসে আছে আর সেই সমুদ্রের বিরাট ঢেউগুলোকে কেটে কেটে তার ওপর নাচতে নাচতে চলেছে নৌকোটা। মা আর বাবা সারা জীবন খেটে নৌকোটা কিনেছিল। নৌকোটাকে সেও খুব ভালবাসত। পালানির ছোট্ট নৌকোটার চেয়েও সে তার বাবার নৌকোটাকেই বেশি ভালবেসেছিল। নৌকোটাকে আমাদের নৌকো বলতে তার ভাল লাগত। সেই নৌকো আজ আর একজনের হয়ে গেছে তাদের আর কোন অধিকার নেই তাতে। কারুতাম্মা একথা ভাবতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, 'বাবার এখন তাহলে কি করে চলবে রে?'

'কি জানি।'

অন্য সব খবরের চেয়ে বাবার নৌকো আর জাল হারানোর খবরটাই কারুতাম্মাকে বেশি পীড়া দিল। আর পঞ্চমী যে রকম নির্বিকারভাবে ওর কথার জবাব দিল তাতে ও আরও আঘাত পেল। বাবার কি ভাবে চলবে না চলবে তা যেন দেখা পঞ্চমীর কর্তব্য নয়। কারুতাম্মা পঞ্চমীর এই ব্যবহারে খুব কষ্ট পেয়ে বলে উঠল, 'তুই কিরে—তোর একটুও দয়ামায়া নেই?'

পঞ্চমী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'কেন? কেন শুনি?'

'বাবাকে এমনিভাবে ফেলে রেখে আসাটা কি তোর উচিত হয়েছে? বাবাকে বলেও আসিসনি। বাবাকে এখন দেখার কে আছে?'

'তুমি আর বেশি লম্বা কথা বোল না। তুমি কি করেছিলে শুনি?'

পঞ্চমী যা বলছে তা ঠিকই। বাবাকে এমনিভাবে ফেলে আসার জন্যে পঞ্চমীকে শুধু দোষ দিলে কি হবে। ও নিজে কি করেছে? বাবার কথা না শুনে চলে আসেনি? কিন্তু তবু পঞ্চমীর সঙ্গে ওর একটু তফাৎ আছে। ও মা আর বাবাকে ফেলে চলে এসেছিল কোনও উপায় ছিল না বলে কিন্তু পঞ্চমীর বেলায় তো সে কথা খাটে না।

পঞ্চমী আবার বলল, 'দিদি, তুই যদি অমনভাবে চলে না আসতিস তাহলে এসব কিছুই ঘটত না। মা মরার পর তুই যদি আমাদের সংসারটার দেখাশোনা করতিস তাহলে সব ঠিক চলত।'

কারুতাম্মা চুপ করে রইল। পঞ্চমীর কথাগুলো একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু যদি সে সত্যিই বাপের বাড়ি থাকত তাহলে কি সব সমস্যার সমাধান হত। বেচারী পঞ্চমী ছেলেমানুষ সাদাসিধে। কতটুকুই বা ও জানে? যদি কারুতাম্মা নীরকুন্নাথে থাকত তাহলে কত কিই না ঘটেতে পারত। হয়তো ওর দিদিকে খুঁকে পাওয়াই যেত না কিন্তু সেকথা পঞ্চমী বেচারী বুঝবে না।

পঞ্চমী বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। একমিনিট পরেই বলল, 'বেশ আছিস দিদি, যেই একটা মানুষ পেলি অমনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তার পেছনে পেছন চলে এলি।'

'আরে তা নয়, তা নয়'—কথাগুলো যেন একটা করুণ আর্তনাদ করে কারুতাম্মার গলা চিরে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু গলা দিয়ে ওর একটা শব্দও বেরোল না। অস্পষ্ট কান্নার মতো দুচারটে কথা বেরিয়ে এল যার অর্থ পঞ্চমী বুঝতে পারল না। স্বামীর প্রতি ওর ভালবাসার জন্য বা স্বামী যা বলবে তাই শোনা কর্তব্য বলে ও স্বামীর পেছন পেছন চলে আসেনি এই কথাটাই ও পঞ্চমীকে বলতে চাইছিল। কিন্তু স্বামীর বাড়িতে বসে তার কষ্ট করে রোজগার করা ভাতে ভাগ বসিয়ে তার বলা উচিত যে স্বামীকে ভালবাসি বা না বাসি তার সঙ্গে চলে আসাই আমার কর্তব্য। কিন্তু এ কথাও সে পঞ্চমীকে বলল না। সত্যি কথা বলতে কি সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই নীরকুন্নাথ থেকে চলে এসেছে। মা বাবার ওপর ভালবাসা বা স্বামীর ওপর তার প্রেম কতটা ছিল তা কে জানে। পঞ্চমী যে বলছে সে তার জেলের পেছন পেছন ছুটে এসেছে তাও ঠিক নয়। কিন্তু কিছুই না বলে কারুতাম্মা চুপচাপ রইল:

পঞ্চমী তারপর বাবার মাথাটা একটু খারাপ হয়ে যাওয়ার কথাও বলল। কারুতাম্মার কথা নতুন মা কি বলেছিল তাও বলল। দাঁত কিড়মিড় করে পঞ্চমী বলল, 'জানিস দিদি, ঐ ধুমসী মাগীটা বলেছে তুই নাকি মোছলমানের সঙ্গে থেকে আমাদের গাঁ খারাপ করে ফেলেছিস'—তারপর একটু সহানুভূতির স্বরে বলল, 'আমি আর কি বলব। বাবারও মাথার গোলমাল তাই ওর কথাগুলো হজম করতে হল।'

কারুতাম্মা পঞ্চমীর কথা শুনে কাঠের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ওর কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। পঞ্চমী তার পরেও আরও কত কি বিড়বিড় করে বলল—কিছুই তার কানে গেল না। মনে মনে ও তখন ভাবছিল তাহলে এখনও ওকে নিয়ে এইসব বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। ওর বাবাও তাহলে এই কথা শুনেছে। ওতো জানে ওর বাবা কত অভিমানী, কত

অহঙ্কারী। একথা শুনে তো ওর বাবা ওকে একেবারেই ক্ষমা করবে না। পঞ্চমী ইতিমধ্যে পারীকুট্টির কথা বলতে শুরু করেছে। পারীকুট্টির কষ্টের কথা, কেমনভাবে ও ফ্যা ফ্যা করে সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কথা বলল।

'জানিস দিদি, ছোটমিয়ার হাতে একটা পয়সাও নেই। একেবারে ঠাঠা উপোস দিচ্ছে। তবু আমাদের গাঁ ছেড়ে যাবে না। সমুদ্দুরের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবে। বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে গেছে, পাগলের মতো দেখায়। সত্যি ছোটমিয়াকে দেখলে বড় কষ্ট হয়রে দিদি!'

পারীকুট্টির কথা সোজাসুজি পঞ্চমীকে জিজ্ঞেস না করলেও পারীকুট্টির কথা জানার জন্য কারুতাম্মা তার সব আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। কারুতাম্মা অন্য পরিবেশে থাকলে পঞ্চমীকে পারীকুট্টির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত। কিন্তু এখন অবস্থা আলাদা। ওর মনে পড়ল পারীকুট্টির সেই ছোট্ট বেলাকার চেহারার কথা। সেই হলুদ রঙ জামা গায়ে দিয়ে, পাজামা পরে, মাথায় টুপি দিয়ে গলায় রুমাল জড়িয়ে প্রথম তাদের গাঁয়ে এসেছিল পারীকুট্টি ওর বাবার হাত ধরে। ও যেন স্পষ্ট সে ছবি এখন দেখতে পাচ্ছে। সেদিন ও পারীকুট্টিকে একটা শাঁখ উপহার দিয়েছিল। তারপর থেকে তাদের জীবন-নাট্যে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তা একটার পর একটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

অমন অমূল্য একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কার জন্যে? ও যদি না অমনভাবে পারীকুট্টির হৃদয় দলিত মথিত করে চলে আসত তাহলে একটা জীবন এমনিভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত না। কারুতাম্মা হঠাৎ ওর নিজের অজানতে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে পঞ্চমী, ছোটমিয়া এখনও নৌকোয় বসে গান গায়?'

'হ্যাঁ, কখনও কখনও।'

পঞ্চমী কি সেই গানের অর্থ জানে? জানার কথা নয়। কারুতাম্মা জিজ্ঞেস করল, 'তোর সঙ্গে তার দেখা হয়?'

'মাঝে মাঝে।'

'আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করে?'

কারুতাম্মার গলা কাঁপছিল। পঞ্চমী বলল, 'আমাকে দেখলে শুধু একটু হাসে।'

'না তোমার দিদির কথাও জিজ্ঞেস করে—' কে যেন ভয়ঙ্কর গলায় বলে উঠল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পালানি। কারুতাম্মা আর পঞ্চমী চমকে

লাফিয়ে উঠল।

এতদিনে কারুতাম্মার সমস্ত গোপন কথা পালানি হাতে নাতে ধরে ফেলেছে। মনের মধ্যে যাকে লুকিয়ে রেখেছিল কারুতাম্মা আজ পালানি তার সন্ধান-পেয়েছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

এই সেদিন পর্যন্ত কারুতাম্মার ছিল না কোন সাহস, ছিল না কোন শক্তি কিন্তু পালানি যখন তার গোপন কথা জানতে পারল তখন তার আর ভয়ের কিছু রইল না। জীবন নির্বিবাদে আর শান্তিতে কাটাতে হলে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্যই হচ্ছে যে এই নিয়মগুলো ভালভাবে মেনে চলা, এগুলো মেনে চললে দাম্পত্যজীবন সহজ আর শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্ত্রীর দিক থেকে কারুতাম্মা সেই সব নিয়ম মেনে চলছিল কিন্তু ভয়ে ভয়ে। সব কিছুতেই তার ভয়। মন খুলে কিছু বলার বা করার সাহস তার ছিল না। নিজের ইচ্ছাশক্তি বলেও তার কিছু ছিল না। হয়তো সে শান্তিপূর্ণভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাই স্বামী যা বলতো তাই ভয়ে ভয়ে মেনে চলত।

হঠাৎ এই পরিবর্তন হল, আর এই পরিবর্তন এল পঞ্চমীর কারুতাম্মার কাছে আসার ফলে। এতদিনে কারুতাম্মা প্রাণ খুলে কথা বলার একটি সাথী পেল তারই ফলে তার সব গোপন রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এখন আর রাখা-ঢাকার কিছু নেই এখন তাহলে ভয়ের কি আছে? জীবনকে ভালো পথে চালনা করবার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। এখন বিপদের ঝক্কি মাথায় নিয়ে কারুর আশ্রয়ের ছায়ায় না থেকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সে রাখে। একাই বা কেন? এখন তার সঙ্গে চলার সাথী আছে তার বোন পঞ্চমী। পঞ্চমী ছোট হলেও সে একটা মানুষ—এই বিপুলা পৃথিবীতে কারুতাম্মা তাই একেবারে একলা নয়।

সেদিন আবার আর একবার কারুতাম্মাকে তার সমস্ত কথা পালানিকে বলতে হল কিছু না লুকিয়ে রেখে। পারীকুট্টি কি শুধু তার খেলার সাথী ছিল না আর কিছু—পালানির এই প্রশ্নের উত্তরে কারুতাম্মা জবাব দিল সে খারাপ হয়নি। কিন্তু পালানি তা জানতে চায়নি। পালানি এবার স্পষ্ট জিজ্ঞেস করল:

'তুই কি ওকে ভালবেসেছিলি?'

কথাটার জবাব দিতে কারুতাম্মার একটু সময় লাগল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল পারীকুট্টির মূর্তি—পারীকুট্টির সেই ভবঘুরে ছন্নছাড়া মূর্তি যার কথা পঞ্চমী এক্ষুনি বলল। সব হারিয়ে পাগলের মত সমুদ্রের ধারে ধারে গান গেয়ে

বেড়াচ্ছে যে পারীকুট্টি। পারীকুট্টির সেই কথাগুলো তার মনে পড়ল :

'আমি এখানে বসে রোজ গান গাইব আর ত্রিকুন্নাপুড়ায় বসে তুমি সে গান শুনবে।' আরও মনে পড়ল—'জাল আর নৌকো কেনার পর মাছগুলো আমার কাছে বিক্রী করবে তো?'

পালানি তার প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আবার প্রশ্ন করল। কারুতাম্মার ভেতর থেকে কে যেন ওকে বলতে লাগল, 'সবই তো ধরা পড়েছে। এখন আর লুকিয়ে রেখে কি হবে—তুমি কিছুই দোষ করনি। বিয়ের আগে একজনকে ভালবেসেছিলে তাতে দোষটা কি? বলে দাও স্পষ্ট করে।'

কারুতাম্মা বলল, 'হ্যাঁ ভালবেসেছিলাম।'

নিমেষের মধ্যে একটা ঘন আর গভীর নিস্তব্ধতা ঘরের মধ্যে ছেয়ে গেল যেন কোন কিছুই এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে পারবে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই পালানির এক কঠিন প্রশ্নে নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল :

'তুই কি তাহলে এখানে আসার আগে তার অনুমতি নিয়ে এসেছিলি?'

এসেছে কি না এসেছে—কারুতাম্মা কিছুই বলল না। তখন পালানি আর এক প্রশ্ন করল, 'আবার কবে দেখা হবে কিছু বলে এসেছিস।'

'কিছুই বলিনি।'

এই সময়ে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল, কারুতাম্মা বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে দুধ দিতে লাগল।

সেদিন কিন্তু কারুতাম্মা আগের মত পালানির মন পাওয়ার চেষ্টা করল না। তবে বারবার সে পালানির কাছে শপথ করল যে সে খাঁটি থাকবে। আর কি শপথ ও করতে পারে? পালানির দিকে মৌনদৃষ্টিতে তাকিয়ে ও যেন জিজ্ঞেস করতে চাইল, 'অনেকবার অনেক প্রতিজ্ঞাই তো করেছি, অনেক কথাই তো তোমায় দিয়েছি। এর বেশি আর কি চাও তুমি? এখনও আমাকে তোমার সন্দেহ, তোমার অবিশ্বাস?'

পরের দিন ভোররাতে উঠে পালানি কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেল। পঞ্চমী জিজ্ঞেস করল, 'কি দিদি, বোনাই কি রেগে গেছে নাকি?'

কারুতাম্মা বলল, 'কি জানি ভাই, তবে এটা বুঝেছি যে আমাদের দু'জনেরই এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।'

'তোমার তো তবু একটা ঠাঁই আছে দিদি আমার তাও নেই।

'নারে পঞ্চমী, আমারও কেউ নেই। আমাদের দু'জনেরই এক অবস্থা। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।'

তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের বাবার মতো চালাক লোক কটা আছে বল। সেই বাবার মেয়ে আমরা। যে করেই হোক্ আমরা চালিয়ে নিতে পারব।'

সেদিন দুপুরে পালানি কাজ থেকে ফিরে এলে কারুতাম্মা তাকে ওর একটা অনুরোধ জানাল।—'আমি একবার নীরকুন্নাথে যেতে চাই, যাব?'

পালানি কিছু উত্তর দিল না। কারুতাম্মা তখন ওর বাবার সবকথা পালানিকে বলল, 'বাবার মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে। এখন আমরা ছাড়া বাবার আর কে আছে? বাবার এই দুঃসময়ে অন্ততঃ একবার যাওয়া দরকার—কিগো যাই?'

তাতেও পালানি কিছু বলল না।

সেদিনও পালানি আগের মতো ছিপ, টোপ আর দাঁড় নিয়ে সমুদ্রে চলল। অন্য দিনের মতো সেদিনও কারুতাম্মা এক হাতে ভাতের পুঁটুলি অন্যহাতে বাচ্চাটাকে নিয়ে পালানির পেছন পেছন সমুদ্রতীরে গেল।

সেদিনও বাচ্চাটা অন্য দিনের মতো হাত নেড়ে বাবাকে বিদায় দিল। পালালি সেদিকে নজর না দিয়ে নৌকোটাকে ঠেলে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখে বাচ্চাটা তখনও হাত উঁচু করে নাড়ছে।

পালানি সমুদ্রে নেমে যাওয়ার পরও কারুতাম্মা কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে রইল। তখন সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে। পশ্চিম আকাশ দাউদাউ করে জলছে আর তাল তাল সোনা যেন সমুদ্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। যেন বিরাট একটা সোনার পাতি সমুদ্রকে মুড়ে ফেলছে আস্তে আস্তে। কি বৈচিত্র্যময় দৃশ্য! নীল সমুদ্রের যেখানে এই সোনার পাত এসে মিশেছে সেখানে একটা কালো রেখারও সৃষ্টি হয়েছে। সেই রেখার ওপারে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব রহস্য, সব গোপনীয়তা লুকিয়ে রয়েছে। বিশ্বের সব চেয়ে বড় রহস্য! কারুতাম্মা সব ভুলে মুগ্ধ নয়নে তাই দেখতে লাগল।

পালানির নৌকো সেই অগাধ জলরাশির মধ্যে দিয়ে হেলতে দুলতে দক্ষিণ দিকে চালছে। পালানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৌকো চালাচ্ছে। এক একটা হ্যাঁচকা টানে নৌকো এক দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে আর খানিকটা করে জলও নৌকোয় উঠছে।

এইভাবে জোরে জোরে সে বহুদিন নৌকো চালায়নি। আজ এতদিন পরে তার সমস্ত ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠেছে। সেই জাগ্রতশক্তিকে সংযত করার মত শক্তি তার দেহে নেই। দাঁড়টাও হালকা, নৌকোটাও ছোট্ট। পালানি

সমুদ্রের সেই দূর প্রান্তে কালো রেখাটিকে লক্ষ্য করে নৌকোটাকে চালাতে লাগল। নৌকোয় অনেকবার জল উঠল কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে এক মনে সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই কালো রেখাটার দিকে সে এগিয়ে চলল।

দাঁড়টানার সময় তার নাকের গর্জনের শব্দ সেই বিশাল সমুদ্রের ঢেউ-এর আওয়াজে মিশে যাচ্ছিল। কি একটা আক্রোশের বসে ও নৌকো চালাচ্ছিল। নৌকোটা এত জোরে চলছিল, মনে হচ্ছিল নৌকোটা যেন প্রতি মুহূর্তে আকাশে ওড়ার জন্য ডানা মেলতে চাইছে।

পালানির এই ঘুমন্ত শক্তিকে এমনি ভাবে ঘা দিয়ে জাগিয়েছে কে? কি কারণে তার সমস্ত শক্তি এমন ভাবে জেগে উঠেছে তা কে জানে? কিন্তু এই শক্তিকে চেপে রাখার মত শক্তি আজ কারুর নেই। কি যে অপরিমিত শক্তি আজ তার সারা দেহে আর মনে জেগে উঠেছে তার পরিমাপ করার সাধ্য তারও নেই।

একদল শুশুক ওর নৌকোর চার পাশে লাফ দিয়ে চলে গেল। তাদের মধ্যে একটা নৌকোটাকে ঠোক্কর মেরে ভুস করে ডুব দিয়ে আবার ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা লাফ দিয়ে উঠল। এক মুহূর্তের মধ্যে নৌকোটাও উল্টে যেত। দৃশ্যটা দেখে পালানির চোখদুটো ধক্ ধক্ করে জলে উঠল। ও দাঁত কিড়মিড় করে সজোরে হুঙ্কার দিয়ে শুশুকটার পিঠের ওপর দিয়ে নৌকোটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে জলের মধ্যে ভয়ঙ্কর আলোড়ন শুরু হল। হয়তো পিঠের হাড় ভেঙে গিয়ে জন্তুটা জলের তলায় তলিয়ে গেছে। এত কাণ্ডতেও নৌকোটা কিন্তু উল্টে যায়নি। পালানি আবার খুব তাড়াতাড়ি নৌকোটাকে পশ্চিম দিকে চালাতে লাগল। পশ্চিমে আরও পশ্চিমে যেখানে সীমাহীন সমুদ্র অসীমে গিয়ে মিশেছে, যে পশ্চিমের সীমা নেই, শেষ নেই।

সমুদ্রের তীরে বাচ্চাকোলে করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারুতাম্মা। হঠাৎ ওর কোলের বাচ্চাটি কেঁদে উঠল। হয়তো ওর বাবাকে অমনিভাবে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে তার ফল কি হবে জানতে পেরে ও কেঁদে উঠেছে। হয়তো সে জানতে পেরেছে তার বাবার এই সীমাহীন যাত্রার কথা। পালানি তার মেয়ের কান্না শুনতে পায়নি কেননা হাওয়া বইছিল পূব দিকে। কিন্তু শুশুকটার পিঠের হাড় ভাঙার সময় সমস্ত শক্তি দিয়ে সে যখন হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল সেই হুঙ্কার বাতাসে বাতাসে সমুদ্রের তীরে ভেসে এসেছিল। সে শব্দ কারুতাম্মা শুনতে পায়নি। এখন অনেক শব্দই, অনেক আওয়াজই কারুতাম্মার কানে যাবে না, তার মন এখন অন্য চিন্তায় মগ্ন, সে মন আজ কলুষিত।

পালানি যেন কোন্ এক গভীর রহস্যের সন্ধানে যাত্রা করেছে। সমুদ্রের ভেতর থেকে চাঁদ উঁচু হয়ে উঠছে পালানি দেখতে পেল। ও যেন এক নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে। নীল জলের ওপর রূপোর পাতের মত চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে—অপূর্ব এক দৃশ্য। এ যেন কোন্ মায়ালোকে সে প্রবেশ করেছে। কিন্তু হঠাৎ ওর ভয় লেগে গেল। কতদূরে কতদূরে ও চলে এসেছে। ওর চারপাশে চক্রবাল যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে। পালানির মনে একটা ভীষণ জেদ চাপল। ঐ চক্রবালের দেওয়াল ভেঙে চূরমার করে বেরোবে ও। জোরে আরও জোরে ও নৌকো চালাতে লাগল। সামুদ্রিক সাপগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ওর নৌকোয় উঠতে লাগল। নীল জলের ওপর যেখানে চাঁদের আলো রূপোর পাতের মত ঝল্মল্ করছে সেখানে সাপগুলো হেলছে দুলছে। নৌকোর একপাশে ছোবল দিয়ে হিস্‌হিস্ শব্দ করছে আবার জলে লাফিয়ে পড়ছে। নৌকোয় দুটো সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ ও দেখতে পেল দূর পশ্চিম থেকে চক্রবালকে পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে একটা বিরাট ঢেউ রোলারের মত এগিয়ে আসছে। পালানির মন চাইল সেই ঢেউটাকে অগ্রাহ্য করে তার বুক চিরে ওপারে এগিয়ে যেতে। কিন্তু ঢেউএর বুকচেরা তার আর হল না। তার আগেই বিরাট সফেন ঢেউটা সেই ছোট্ট নৌকোটাকে তার মাথায় তুলে হাসতে হাসতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোন বড় ঢেউ আসছে না পালানি দেখতে পেল। সমুদ্রকে শান্ত দেখাচ্ছে তবে সমুদ্রের জল ঘন কালো হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের তলায় তলায় যেন একটা স্রোত বইছে, নৌকোটাকে যে পথে ও ঘোরাতে চাইছে সে পথে ঘুরছে না। কিসের টানে নৌকোটা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। তাহলে কাছাকাছি কোথাও একটা ঘূর্ণি আছে। সেই ঘূর্ণির টানে সমুদ্রের তলাকার যত ময়লা যত আর্বজনা সব বেরিয়ে আসছে।

পালানির জেদ্ চাপল ঐ ঘূর্ণির টানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। ঐ ঘূর্ণি ওর নৌকো টেনে নিয়ে যাবে এতদূর স্পর্ধা। ও তাই টানের উল্টোদিকে নৌকো বাইতে লাগল। দূরে সমুদ্রের বুকে কিসের যেন একটা অস্তিত্ব ঝক্‌ঝকিয়ে উঠছে, হয়তো সফেন ঢেউ-এর। তারই মধ্যে কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য পালানি যেন তার নৌকোটাকে চালাতে লাগল।

ছোট ছোট ঢেউগুলোর ওপর তালে তালে নাচছে অসংখ্য সিন্ধুশকুন। তাদের যেন কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু তারাও হঠাৎ ভয় পেয়ে আকাশচেরা চীৎকার করে উড়ে পালাল। পালানির নৌকো দেখে নয় সমুদ্রে কোথাও একটা

বিকট শব্দ শুনে।

একটা হাঙর! হাঙরটা একটা সিন্ধুশকুন ধরেছে। পালানি তার ছিপ ফেলল। যে কোনো পোড় খাওয়া জেলে তাইই করে—হাঙর ধরার এমন সুযোগ সে ছাড়ে না।

এদিকে বাড়িতে অনেকক্ষণ দুই বোন বসে কথাবার্তা বলছিল। কথাবার্তা আজকের ঘটনা নিয়ে নয়। মা বা পারীকুট্টিকে নিয়েও কিছু কথা হচ্ছিল না কারণ ওদের সম্বন্ধে কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। বাবার কথাই ওরা বেশি করে বলাবলি করছিল। ওরা দুঃখ করছিল কেমন করে ওদের সেই অমন চালাকচতুর বাবার এই অবস্থা ঘটল। কথা বলতে বলতে এক সময় ছেলেমানুষ পঞ্চমী ঘুমিয়ে পড়ল। কারুত্তাম্মার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। একটা অদ্ভুত হাওয়া বইছিল সে রাতে যা এর আগে কোন দিনও বয়নি। বাতাসের সেই সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যে কিসের যেন একটা সুর বাজছে। কারুত্তাম্মার মনে হল এই সুরের সঙ্গে পারীকুট্টির গানের সেই সুর মিশে আছে। ও কান পেতে রইল কি যেন শোনার জন্যে। আর সেই কানপাতার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত মন পারীকুট্টির চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল।

ওর জেলে এই রাতে একা মাঝ-সমুদ্রে ছিপ ফেলতে গেছে। ওর উচিত ছিল আগেরদিনের সেই খাঁটি জেলেনীর মতো স্বামীর নিরাপদে ফিরে আসার জন্য সমুদ্রতীরে বসে তপস্যা করা, এক মনে সাগর দেবীর কাছে প্রার্থনা করা। কিন্তু তা না করে সে আজ পরপুরুষের কথা, পারীকুট্টির কথা চিন্তা করতে লাগল।

কিন্তু তবু সে পারীকুট্টির চিন্তা সম্পূর্ণ সচেতন মন নিয়ে করছিল না। কি যেন একটা আধোজাগন্ত আধোঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে ওর মন। কেমন যেন একটা ঘোরের ভাব। পারীকুট্টি বেচারা! পারীকুট্টি কি সুন্দর! কত ভালো! তার ভালবাসা কত গভীর।

পারীকুট্টি তাকে ভালবাসে, সেও পারীকুট্টিকে ভালবাসে, এ ভালবাসায় কোন কৃত্রিমতা, কোন ভেজাল নেই। এ জন্মে, এ জীবনে সে পারীকুট্টিকে ভুলতে পারবে না। পারীকুট্টি একান্ত ভাবে তার। সে পারীকুট্টির—দুজনে দুজনার।

একথা ভাবতে আজ তার মনে একটুও দ্বিধা জাগল না। এই নিয়ে মনে সু আর কু এর দ্বন্দ্ব জাগল না। হৃদয়ের মধ্যে এ নিয়ে কোন দুঃখও জাগল না। কি রকম যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে মন, কি এক ঘোরে সে বিভোর হয়ে রয়েছে। আর সেই ঘোরের মধ্যে কি যেন সব বিড়বিড় করে ও বলতে লাগল।

ওর কেমন যেন মনে হল আজ পারীকুট্টি আসবে, তাকে ডাকবে আর সেই ডাক শোনার জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ও সে কান খাড়া করে রইল। পারীকুট্টি আসবে, তাকে ডাকবে। পারীকুট্টির ডাকের প্রতীক্ষায় তাকে সারা রাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে হবে। ঐ তো…ঐ তো কে যেন ডাকছে।

'কারুতাম্মা।'

কারুতাম্মা ধড়ফড়্ করে উঠে বসল। কেউ কি তাকে ডাকল?

'কারুতাম্মা!'

দূর থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। সত্যিই কি কেউ ডাকছে না তার অর্ধসচেতন মন ভাবছে যে কেউ ডাকছে। কিন্তু তাও তো নয়। কে যেন একেবারে দোরগোড়ায় এসে তাকে ডাকছে। ও আবার ডাক শুনতে পেল।

'কারুতাম্মা।'

এত রাতে এই অন্ধকারে শুধু একজনমাত্র লোকই ওর দরজায় ঘা দিয়ে ওকে ডাকে প্রতিদিন। সমুদ্র থেকে মাছ নিয়ে ফিরে এসে পালানি ছাড়া আর কেই-ই বা ওকে ডাকবে? এতক্ষণে পালানির আসার সময়ও হয়েছে।

'কারুতাম্মা।'

হ্যাঁ—এতো পালানিরই ডাক। সে ছাড়া আর কে ওকে এমনভাবে ডাকবে? কারুতাম্মা উত্তর দিল, 'এই যে যাচ্ছি।'

ওর কথার উত্তরে কিন্তু দরজা খুলে দিতে কেউ বলল না। রোজ পালানি ওকে দরজা খুলতে বলার পর ও দরজা খোলে। আজ কিন্তু সাড়া না পেয়েও ও দরজা খুলে বাইরে এল। সেদিন অন্য দিনের চেয়েও বাতাস খুব জোরে জোরে বইছে। সেই হাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা রুক্ষতা, একটা কর্কশ ভাব। ধব্‌ধব্ করছে জ্যোৎস্না। চাঁদ যেন তার সব আলো ঢেলে দিয়ে পৃথিবীকে স্নান করাচ্ছে। দরজা খুলে ও উঠোনে এল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। উঠোনে কাউকে দেখতে না পেয়ে ও পশ্চিম দিকে সমুদ্রের দিকে চলল। সমুদ্রের ধার থেকে ওকে কেউ ডাকল কিনা তাই দেখতে।

একটু এগিয়ে সেই জ্যোৎস্নার ধব্‌ধবে আলোয় ও দেখতে পেল একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে—পালানি নয়—পারীকুট্টি!

পারীকুট্টিকে দেখে কারুতাম্মা ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল না। যেন পারীকুট্টির প্রতীক্ষাই ও করছিল। পারীকুট্টির ডাক শুনতে পেয়েই ও দরজা খুলে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কারুতাম্মাকে দেখতে পেয়ে পারীকুট্টি আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে এল।

কারুতাম্মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে ভালো করে দেখতে লাগল। ওর সেই আগের ছোটমিয়া আর নেই। অনেক, অনেক রোগা হয়ে গেছে পারীকুট্টি।

পারীকুট্টি ওর খুব কাছে এসে দাঁড়ালেও আজ কারুতাম্মার ভয় করছে না কেন? ও তো আজও ওর পীবর বুকের দিকে, ওর দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে পারে। কিন্তু তার জন্যে আজ কারুতাম্মার কোন ভয় নেই। ও আজ ওর উঁচু বুক টানটান করে পারীকুট্টির দিকে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে দাঁড়ায়নি। আজ একটা বাচ্চার কচি ঠোঁট ওর বুক স্পর্শ করেছে। আজ ওর বুকে একটি শিশুকে সতেজ করে তোলার মধুভাণ্ড রয়েছে। তবু পালানি যখন বাড়িতে নেই তখন এই গভীর রাতে অন্য এক পুরুষের কাছে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা উচিত? কিন্তু সে উচিত-অনুচিতের ভাবনা আজ কারুতাম্মার নেই। ওতো এর আগেও পারীকুট্টির সঙ্গে অনেক রাতে অনেক নির্জন জায়গায় দেখা করেছে। আর যদি দেখা নাও করে থাকে তবু জীবনে সব হারিয়ে ব্যর্থ আর বঞ্চিত হয়েছে যে মানুষ তাকে কিছুক্ষণের জন্যও যদি ওর আগমন কোন আশ্বাস দেয়, কোন সান্ত্বনা দেয় তা থেকে কেন ও তাকে বঞ্চিত করবে?

কিছুক্ষণের জন্য দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। কারুতাম্মা যে পুরুষের জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে সে পুরুষ আজ ওর সামনে দাঁড়িয়ে। কারুতাম্মা ওর অন্তরের অন্তঃস্থলে জানে যে পারীকুট্টি ওকে চিরকাল ভালবাসবে। ওর যাই অবস্থা হোক্, ও যে ভাবেই থাকুক, যেখানেই থাকুক কারুতাম্মাকে সে ভালবাসবে, না ভালবেসে তার উপায় নেই। কারুতাম্মা পারীকুট্টির জীবন ব্যর্থ করে দিলেও সে ওকে বারবার ক্ষমা করবে। কারুতাম্মা তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও পারীকুট্টি হাসিমুখে তা সহ্য করবে।

মুহূর্তকালের জন্য কারুতাম্মা তার জীবনের সব গ্লানি সব দুঃখকষ্ট আর ব্যর্থতা ভুলে গেল। জীবনে কিছুই সে হারায়নি। তার একটা অমূল্য সম্পদ রয়েছে যা আর কোন মেয়েরই নেই। সে এক পুরুষের একনিষ্ঠ ভালবাসা পেয়েছে। বিয়ের পর সে তার স্বামীর ওপর নির্ভর করেছিল। তার স্বামী বলিষ্ঠ পুরুষ সে তাকে আগলে রাখবে এমনি একটা নিশ্চিন্ত ভাব তার ছিল। এক জোয়ান শক্ত সমর্থ পুরুষের ওপর তার সংরক্ষণের ভার ছিল। তাকে উপোস করে মরতে হবে না। বিশাল এই পৃথিবীর নানা ধরনের অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হবে না। তার স্বামী সাহসী পুরুষ, দেহে তার অমিতশক্তি, যে কোন বিপদ-আপদ থেকে তার স্বামী তাকে আগলে রাখবে। এই যে এতবড় একটা সম্পদ সে পেয়েছে তা তার বাইরের সম্পদ আর যদি সে তার অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখে

তাহলে দেখতে পায় সেখানেও একটা অমূল্য সম্পদ আছে। তাকে এক পুরুষ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে—চিরকাল বাসবে। এর মত বড় সম্পদ আর কি আছে? আর কোনও মেয়ের আছে এই অমূল্য সম্পদ? তার সেই ভালবাসার পাত্র, তার সেই অমূল্য সম্পদ আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ কারুতাম্মা পারীকুট্টির দুই প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে মুখ লুকোল। ওদের পরস্পরের ঠোঁট মিলল। কারুতাম্মার কানে পারীকুট্টি বারবার বলতে লাগল, 'কারুতাম্মা, আমার কারুতাম্মা!'

'উঃ!'

মুসলমান পারীকুট্টি আজ সমুদ্রের ধারের যে কোনও চরিত্রহীন যুবকের মতই কারুতাম্মাকে জড়িয়ে ধরে তার পেছনে হাত রেখেছে।

পারীকুট্টি আবার ডাকল, 'কারুতাম্মা, আমার কারুতাম্মা!' কারুতাম্মা সেই অর্ধচেতন অবস্থায় ওর ডাক শুনে উত্তর না দিয়ে পারল না—'কি?'

'আমি তোমার কে হই?'

পূর্ণ আবেগে পারীকুট্টির মুখ দুই হাতে চেপে ধরে অর্ধনিমীলিত দুটো চোখে তার দিকে তাকিয়ে কারুতাম্মা বলল, 'তুমি আমার কে? তুমি আমার সোনা, আমার বুকের ধন।'

আবার দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। কি যেন এক আবেগে কারুতাম্মা পারীকুট্টির কানে কানে কত কি বলে গেল।

এই নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার শক্তি আজ কারুতাম্মার নেই।

* * *

এদিকে সমুদ্রের তীর থেকে বহুদূরে পালানির বঁড়শিতে একটা হাঙর গেঁথেছে। বিরাট একটা হাঙর! আজ পর্যন্ত এত বড় একটা হাঙর ওর বঁড়শিতে ধরা পড়া তো দূরের কথা আর কোন জেলের বঁড়শিতেও পড়েনি। ওদের ঐ সমুদ্র উপকূলে আজ অবধি কেউই এতবড় হাঙর ধরতে পারেনি।

বঁড়শিতে গেঁথে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঙরটা তার লেজ দিয়ে একটা খুব বড় ঝাপটা মারল। তার ঝাপটা মারার চোটে সেখানকার জল ছড়িয়ে ঘুরে আকাশ অবধি ছিটকে পড়ল। তারপরে হাঙরটা জলের ওপর মুখ তুলল। জলের ওপর লাফিয়ে উঠতেই পালানি দেখতে পেল হাঙরটার মুখ থেকে বঁড়শির দড়িটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে।

এতবড় হাঙর দেখে পালানি নিজেই অবাক্ হয়ে গেল। ওদের সমুদ্রের

ধারের আর কোন জেলে এতবড় হাঙর আজ পর্যন্ত ধরতে পারেনি। আহ্লাদে নিজেকে ভুলে গিয়ে পালানি বিকট চীৎকার করে উঠল।

খুব তাড়াতাড়ি ওকে এখন ঠিক করতে হবে যে দড়ি টেনে টেনে হাঙরটাকে ধরে রাখবে না দড়ি ছেড়ে দিয়ে কিছু দূর অবধি ওটাকে খেলিয়ে নেবে। ঠিকমত বঁড়শিটা অবশ্য গেঁথে থাকলে একটানেই হাঙরটাকে থামানো যায় কিন্তু তাতে বিপদ আছে। হাঙরটা হয়তো তার লেজের ঝাপটায় পালানির ছোট নৌকেটাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে। আর যদি দড়িটা ছেড়ে দেয় তাহলে ওটা নৌকোটাকে কতদূর নিয়ে যাবে কে জানে ? হয়তো এতদূর টেনে নিয়ে যাবে যেখান থেকে ফিরে আসাই মুশ্‌কিল হবে।

এমনিতেই তীর দেখা যাচ্ছে না। কোন্ দিকটা যে তীর তাই ও ঠিক মত বুঝতে পারছে না। ও তাই এক হাতে বঁড়শির দড়ি আর এক হাতে দাঁড় নিয়ে নৌকোটার ভার ঠিক করে আকাশের দিকে তাকাল তারা দেখে দিক ঠিক করবে বলে, কিন্তু আজ আকাশে ওর সেই পরিচিত তারাটি আর খুঁজে পেল না। আকাশের অনেকখানিই কালো মেঘে ঢাকা। ওর সেই পরিচিত নক্ষত্রটিও ঢাকা পড়েছে।

পালানি আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে নৌকো বাইছিল হঠাৎ নৌকোটা খুব জোরে ছুটতে লাগল—এত জোরে যেন জল কেটে চিরে পাখির মত সোঁ সোঁ করে উড়ে চলেছে। সমুদ্র শান্ত, বড় কোনও ঢেউ নেই কিন্তু সমুদ্র ক্রমশঃ কালো হয়ে এক ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। পালানি জলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ঠিক কোনদিকে স্রোত বইছে তা দেখার জন্য। স্রোতের টান দেখে তীর কোন্ দিকে তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু এত ভাল করে দেখেও স্রোতের টান বুঝতে পারল না।

হাঙরটা বায়ুবেগে নৌকোটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! হাঙরটা ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়! কতদূরে ওকে নিয়ে এসেছে! পালানি দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করে চীৎকার করে উঠল, 'এই হারামজাদা থাম্‌-থাম্ এখানে। তুই শালা আমাকে এমনি ভাবে টানতে টানতে সাগর-মার বাড়ি নিয়ে যাবি নাকি!'

পালানি দড়িটা এবার খুলে জোরে টানল সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা থেমে গেল। তখন পালানি হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, 'হা হা হা·· এই বার পথে এস বাবা। ঠিক এমনিভাবে এখানে দাঁড়াও।'

হাঙরটা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু তখনও প্রাণের দায়ে আকুল হয়ে লেজের ঝাপটা মারছে। পালানি খুশি মনে মজা দেখবার জন্যে আবার

দড়িটাকে টানল। হাঙরটা তাতে ওপর দিকে এক লাফ দিয়ে নীচে পড়ল।

নৌকোটা থেমে গেলেও একটা কিসের টানে পড়ে নৌকো সুবিশাল সমুদ্রের বুকে বিরাট একটা গোল বৃত্ত এঁকে চলেছে বলে পালানির মনে হল। টানটা গোল হয়ে ঘুরছে। কয়েকবার পালানি খুব ভালো করে লক্ষ্য করল। ওকি তাহলে ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে? আবার, আবার জলটা বিশাল বৃত্তের আকারে ঘুরছে ও দেখতে পেল। তখনও কিন্তু ও বঁড়শির দড়িটা চেপে ধরে আছে।

পালানি আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত নক্ষত্র কোথায় হারিয়ে গেছে, কালো মেঘ এসে ওর সব নক্ষত্রকে ঢেকে দিয়েছে।

নৌকোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পালানি চারপাশে তাকাল। এতক্ষণ ও দেখছিল সুবিশাল সমুদ্র, বিস্তীর্ণ জলরাশি কিন্তু এখন অবস্থা অন্য। এখন ওকে যেন জলের পাহাড় চারিদিক দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। ও আর ওর নৌকো ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে। ওর নৌকোর মাথাটা উঁচু হয়ে আছে আর নৌকোটা আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামছে।

মাঝ সমুদ্রে জলের গভীরে সাগর-মার রাজপ্রাসাদ! সাগর-মা সেই প্রাসাদেই থাকেন। সেই প্রাসাদ নিয়ে পালানি নানা গল্প শুনেছে। সেই প্রাসাদে যাওয়ার রাস্তা নাকি একটা ঘূর্ণির মধ্যে দিয়ে। সমুদ্রে গোল হয়ে যে ঘূর্ণিটা ঘুরছে সেটা একেবারে সোজা সাগর-মার প্রাসাদ অবধি গিয়ে পৌঁছেছে।

ওর চারপাশের জলের পাহাড় আরও উঁচু হয়ে আসছে। পালানি দড়িটা আলগা করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা চলতে শুরু করল এক অচিন্ত্যনীয় বেগে।

পালানি কি সেই ঘূর্ণি থেকে বেরুতে পেরেছে? সে কি সেই ঢেউএর পাহাড় টপকে ওপারে যেতে পেরেছে? হ্যাঁ, তা হয়ত পেরেছে।

হঠাৎ সে একটা বিরাট গর্জন শুনতে পেল। অত ভয়ঙ্কর শব্দ আজ অবধি সে জীবনে শোনেনি—ঝড়ের গর্জন। পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ সারে সারে ছুটে আসছে, একটার পিঠে একটা। এত ভয়ঙ্কর ঢেউ পালানি আগে দেখেনি। ঢেউগুলো একদিক থেকে আসছে না। চারিদিক থেকে ঢেউগুলো এসে তাকে কেন্দ্র করে দুই প্রান্তে মোড় খেয়ে বৃত্ত রচনা করে চলেছে।

সমুদ্রের সেই বিচিত্র ক্ষোভ পালানি এক মুহূর্ত দেখেই বুঝতে পারল। খুব বেশী ভয় পালানি তখনও পায়নি। ঢেউ-এর ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে সে জানে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে নৌকো নিয়ে যেতে সে শিখেছে।

নিশ্ছিদ্র ঘন অন্ধকারেও সে নৌকো চালিয়েছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল আর সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ার এক ভয়ঙ্কর শব্দ। পালানি দড়িটায় আর একটু ঢিল দিল। এই সময় দড়িতে টান দিলে নৌকো যদি থেমে যায় তাহলে নৌকো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। হাঙরটা তার নৌকোটাকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যাক।

উঁচু ঢেউএর ওপর নৌকোর একদিক কাত হয়ে পড়লে পর নৌকোর ভারসাম্য রাখার জন্য পালানি দাঁড়টাকে সজোরে চেপে ধরে ওপর দিকে এক লাফ মারল। আর ঢেউএর ওপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার নৌকোতে পড়ে গেল। নৌকোটা তখন একদিকে কাত হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় একটা বিরাট ঢেউ তাকে আর তার নৌকোটাকে গিলে খাওয়ার জন্য হাঁ করে আসছে।

সমুদ্র গর্জন করছে, ভয়ানক চীৎকার করছে। বেচারা জেলেটার ওপর সমুদ্রের রাগ। আর ঝড় যেন সমুদ্রের সেই চীৎকারের সুরে সুর মিলোচ্ছে। বাজের শব্দ যেন সেই সুরে তাল দিচ্ছে। সমস্ত কিছু মিলে যেন এক পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। সামান্য একটা মানুষ। তাকে শেষ করার জন্য সাগর-মাকে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে? যেন যত তাড়াতাড়ি পারে তাকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অভিযান।

হয়ত এই ঢেউগুলো ওদের তীরেতেও এমনিভাবে আছড়ে পড়ে তীরের সমস্ত ঘরবাড়িগুলোকে ধাক্কা মারছে। এখন হয়ত সমুদ্রের ধারে বাড়ির উঠোনে বিষাক্ত সাপেরা সব কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ পালানি দেখতে পেল কি যেন একটা উঁচু হয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে। দেখে মনে হয় যেন একটা অদ্ভুত ঢেউএর চূড়ো নয়তো সামুদ্রিক কোন জীব গুহার মতো হাঁ করে তাকে গিলতে আসছে।

পালানির অটল সাহস আর অদম্য শক্তির আজ শেষ হয়ে আসছে। আবার একটা বিরাট ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে ও ওপর দিকে লাফ দিল কিন্তু বেশী উঁচুতে লাফ দিতে পারল না। ঐ বিরাট হাঁ করা ঢেউটা ওর আর নৌকোর ওপর আছড়ে পড়ল।

প্রচণ্ড বেগে বাজ পড়ল একটা, বিদ্যুৎ চমকাল আর কালো মেঘশুদ্ধ সারা আকাশটা যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। সমুদ্রের জল সব যেন এক জায়গায় এসে জড় হল। আর ঝড় যেন সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবে বলে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ঢেউ এসে নৌকোটাকে উল্টে দিল। ঢেউটা চলে গেলে দেখা গেল উল্টে-পড়া নৌকোটার একদিক আঁকড়ে ধরে

রয়েছে পালানি। যাতে হাত ফস্কে না যায় তার জন্যে সে নৌকোটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে। মুহূর্তের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে পালানি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'কারুতাম্মা!'

'কারুতাম্মা!'

পালানির সেই আর্তনাদ ঝড়ের সেই ভয়ঙ্কর শব্দকেও ছাপিয়ে গেল।

এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে কেন পালানি কারুতাম্মাকে ডাক দিল? তার কারণ যুগ যুগ ধরে জেলেরা যে সংস্কার মেনে আসছে পালানিও তার থেকে বাদ নেই। পালানি জানে যে সমুদ্রে-মাছ-মারতে-যাওয়া জেলেকে রক্ষা করে তার জেলেনী। সেই অনেক অনেক দিন আগে এক সতী জেলেনীর আশ্চর্য তপশ্চর্যার ফলে তার জেলে যেমন সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তেমনি ভাবে সাগর-মার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবে তার জেলেনী কারুতাম্মা। আর তার সেই প্রার্থনার ফলে সে এই সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। ঠিক সেই অনেক দিন আগেকার জেলের মত সেও সব বিপদ কাটিয়ে ঘরে ফিরবে কেন না তার জেলেনী তো এই আগের দিনও তাকে কথা দিয়েছে যে সে খাঁটি জেলেনীর মত তার জন্যে সাগর-মার কাছে প্রার্থনা করবে।

ঝড়ের তীব্রতা বাড়তে লাগল। ঝড় আর ঢেউ বিকট রূপ নিয়ে পালানিকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে দিল। আর একটা ঢেউ ওর দিকে ছুটে আসছে দেখে পালানি কারুতাম্মার নাম ধরে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে 'কারু' এই শব্দটা বেরোতে না বেরোতেই ঢেউটা ওর ওপর আছড়ে পড়ল।

গাঢ় অন্ধকার! কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝড় বিদ্যুৎ বজ্র সব একসঙ্গে মিলেছে। সাগর-মা তাকে শেষ করার জন্য তাঁর সর্বশক্তির প্রয়োগ করে এইবার তাঁর কাজ শেষ করতে চলেছেন। তাঁর সংহার-ক্রিয়া এইবার বুঝি শেষ হতে চলল।

আকাশ ছোঁয়া ঢেউ ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ছে। ওর চারপাশের ঢেউগুলো এত বিরাট যে সমুদ্র যেন একটা গুহায় পরিণত হয়েছে। ঝড়ের অশরীরী দেহ যেন আজ রূপ পেয়েছে।

পালানির নৌকো তখন একটা ঢেউএর চুড়োর ওপর ভাসছে। তার বাইরে পালানি উপুড় হয়ে নৌকোটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। চিরদিনের মত তার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

তারপর এই মর্মান্তিক সংহার লীলার অবসান হল। একটা ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকো গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অতল জলে তলিয়ে গেল।

আকাশে তখন মাত্র একটি তারা দেখা যাচ্ছে সে তারা জেলেদের দিক দেখায় —তাদের অরুন্ধতী। কিন্তু আজ যেন তার প্রকাশ তেমন উজ্জ্বল নয়।

*   *   *

পরের দিন প্রভাতে আগের রাতের মত্ত সমুদ্র ঘুম থেকে উঠল এক মধুর প্রশান্তিতে। কালরাতে যে অত বড় একটা প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলা সমুদ্রের বুক দিয়ে বয়ে গেছে তা তাকে দেখে এখন একটুও বোঝার উপায় নেই।

রাত-জাগা কয়েকজন জেলে বলাবলি করতে লাগল যে কালরাতে মাঝসমুদ্রে খুব ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাত হয়ে গেছে। সমুদ্রের ধারে কয়েকটা বাড়ির উঠোনে সমুদ্রের জল ঢুকেছে, সাদাবালির ওপর সামুদ্রিক সাপও কিলবিল করছে দেখা গেল।

বাবা আর মাকে না দেখতে পেয়ে কারুতাম্মার বাচ্চাটা কাঁদছিল। তাকে কোলে নিয়ে পঞ্চমীও সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। আগের দিন রাতে ছিপ ফেলতে গিয়ে তার বোনাই এখনও ফিরে আসেনি। ঘুমের আগেও যে দিদির সঙ্গে সে এত গল্প করল সকাল বেলায় সে দিদিকেও আর পাওয়া যাচ্ছে না।

পঞ্চমী কাঁদছে আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটাকেও চুপ করানোর চেষ্টা করছে।

দুদিন পরে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ একটি পুরুষ আর একটি নারীর মৃতদেহ ঢেউ-এ ভেসে তীরে এসে পড়েছে দেখা গেল—মৃতদেহ দুটি কারুতাম্মা আর পারীকুট্টির।

আর দূরে চেরিয়াড়ীকাল নামে সমুদ্রের ধারে বঁড়শি গাঁথা একটা বিরাট হাঙরও ভেসে উঠেছে দেখা গেল। এতবড় বিরাট হাঙর আজ পর্যন্ত সেখানকার জেলেরা দেখেনি।

কেরল প্রদেশের সমুদ্রোপকূলে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে জেলেদের গ্রাম। এই জেলেদের জীবন সমুদ্রের সঙ্গে গাঁথা। চিংড়ি [চেম্মীন] এই রকম একটি গ্রামের কাহিনী।

এই বইয়ের নায়িকা কারুত্তাম্মা তরুণ এক মুসলমানের প্রেমে পড়েছে—তার নাম পারীকুট্টি। কিন্তু তাদের প্রেমের পথে সহস্র বাধা। বুকের ব্যথা মুখে চেপে একদিন কারুত্তাম্মাকে পতিত্বে বরণ করে নিতে হল স্বজাতের এক তরুণ জেলেকে। সূচনা থেকেই এই বিবাহ যেন রাহুগ্রস্ত, পারীকুট্টির স্মৃতি প্রতি পদে কারুত্তাম্মাকে যেন অনুসরণ করে চলেছে। ফলে অবশ্যম্ভাবী একটি করুণ ট্রাজিডিতে এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

মালয়ালম সাহিত্যে যাঁরা আধুনিক কালে নূতন শক্তির সঞ্চার করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন তাকাষি শিবশংকর পিল্লাই। পাঠ্যাবস্থায় ও কর্মজীবনের আরম্ভে শিবশংকর ছিলেন আম্বালাপুঝার সমুদ্র উপকূলে - ঠিক জেলেপাড়ার মাঝখানে। পারীকুট্টি ও কারুত্তাম্মার মতো চরিত্র তিনি বাস্তবে দেখেছেন।

১৯৪৮-সালে প্রকাশিত হয় রণ্টিতাঙ্গাষি [দুকুনকে ধান] —এই একটি বইয়ের সূত্রে শিবশংকর সমকালীন মালয়ালম সাহিত্যে সর্বাগ্রগণ্য ঔপন্যাসিকরূপে পরিগণিত হলেন। চেম্মীন [চিংড়ি] প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। পরের বছর এই গ্রন্থ সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার লাভ করে।

অনুবাদ করেছেন বোম্মানা বিশ্বনাথম ও নিলীনা আব্রাহাম

প্রচ্ছদশিল্পী: [illegible]

[illegible]